বাঙলা নাট্যরীতি ঃ বিকাশ ও বৈচিত্র্য

ড বিষ্ণু বসু এম এ., পি-এইচ. ডি

বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা
বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা

ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাএ ৯৮৭
পাণ্ডুলিপি : অনুবাদ বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
এস. খান
শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯৭/২, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা—২

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

শ্রীযুক্তা শৈলবালা বসু রায় চৌধুরী
শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু রায় চৌধুরী
মা ও বাবা
শ্রীচরণেষু

সূচিপত্র

কবেছেন। তাছাড়া সর্বশ্রী পরাগরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, আজহারউদ্দীন খান, ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সনৎকুমার মিত্র ও নীতিকা বসুর সহায়তার কথা স্মরণ করছি। আমাব ভাই শ্রীমান ধ্রুব বসু পাণ্ডুলিপি তৈরী করে দিয়েছেন। এঁদের সকলের সঙ্গে আমার যা ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বাহুল্য মনে হবে। বর্তমানে কাগজ ও মুদ্রণের দুর্মূল্যতার দিনে এ ধরণের বই ছাপানোর জন্য প্রকাশক যে ঝুঁকি নিয়েছেন তাতে শ্রীযুক্ত আশুনাথ দের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রথম অধ্যায়

যুগ পরিবেশ

এক

বাঙলা সাহিত্য, সেইসঙ্গে বাঙলা নাটক, যেহেতু বাঙলার নবজাগৃতির অন্যতম ফসল, সেহেতু বাঙলা নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙলার নবজাগৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বাঙলার নব জাগৃতিকে আমরা সাধারণতঃ ইউরোপীয় রেনেসাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে ভালোবাসি। এবং নবজাগৃতির ফলে ইউরোপে চতুর্দশ পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে যে অভূতপূর্ব জীবন উল্লাসের সমারোহ দেখি, তার হুবহু প্রতিফলন বাঙলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে অনুসন্ধান করে পরিতৃপ্ত হই। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই আমাদের বিশ্লেষণগুলি হয় বাহ্যিক, ইউরোপীয় রেনেসাস ইউরোপে যে সমাজবিন্যাসের কাঠামোটিকে পরিবর্তিত করেছিল, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রকে সরিয়ে নবোদিত বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুদয়কে প্রকাশ করেছিল—এই সহজ সত্যটি আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। সামন্ততন্ত্রের নিষ্পেষণকে অস্বীকার করে, প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বুর্জোয়া জীবনাদর্শ তখনকার ইউরোপীয় সমাজে এনে হল মুক্তির আস্বাদ। কিন্তু বাঙলাদেশ তথা ভারতবর্ষে যে নবজাগৃতির সূচনা ঊনবিংশ শতকে দেখা দিয়েছিল, তাকে কোনক্রমেই সমান্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত বুর্জোয়া শ্রেণীর ভাববিপ্লব বলে গ্রহণ করা চলে না।

বাঙলা এবং ভারতের নবজাগৃতি সম্পর্কে আলোচনার মোটামুটি দুটো পদ্ধতি আছে। প্রথম পদ্ধতি—বিখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার যার প্রবক্তা—মূলতঃ ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের চিন্তাধারার পরিবর্তন ও মানসমুক্তির জয়গানে মুখর। এটাকে আমরা আবেগপ্রধান পদ্ধতি বলতে পারি। এ পদ্ধতিতে সাধারণত আত্মিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের ওপর জোর দেওয়া হয় বেশি। দ্বিতীয় পদ্ধতি—যা অধুনা অধিকাংশ পুস্তকে অবলম্বিত—ইংরেজ আগমনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয়ে বাঙালীর ব্যাপক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে কয়েক দশকের মধ্যেই আমরা কেমন করে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উপনীত হয়েছিলাম তার বিশদ ব্যাখ্যা। এ পদ্ধতিটিকে যুক্তিপ্রধান বা সামাজিক ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে। তবে এ দুটো সিদ্ধান্তের মধ্যেই একটি মিল আছে, সেটি হলো এই যে বাঙলার নবজাগৃতি ইউরোপীয় রেনেসাসের কনিষ্ঠতম ফসল এবং ইংরেজের সঙ্গে মানস মিলনের ফলে এ ফসল অর্জিত হয়েছে।

অবশ্য এ দুটো পদ্ধতির মাধ্যমেই কিছুটা সত্যে উপনীত হওয়া যায়, তবে সবটা নয়। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো—তা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক (সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা প্রভৃতি) নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছিলো। বিশেষতঃ কার্ল মার্কসের বিখ্যাত Structure—Super structure theory যেখানে অর্থনৈতিক কাঠামো নিম্নতম বনিয়াদ এবং শিল্প সাহিত্য, ধ্যান ধারণা উপরিতলের ব্যাপার—নবজাগৃতির প্রাণধর্ম বিশ্লেষণে সুধীজন স্বীকৃত এই তত্ত্বটিকে অস্বীকার করা কঠিন। আগেই বলা হয়েছে, ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মূল কথাই হলো সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা ও নানা গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার উদ্ভব। সমাজে নতুনতর শ্রেণীবিন্যাস হয়েছে। পুরোনো শ্রেণীবিন্যাসকে পরিবর্তিত করে এই নতুন বিন্যাস সহজে হয় নি। কোনো দেশেই অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত করা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। তার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন এবং ক্রমাগত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে। সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয় অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনে রাজনৈতিক আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ইতিহাস এই ত্রিবিধ আন্দোলনের কাহিনীতে পূর্ণ এবং ইউরোপীয় শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতিতে এই আন্দোলনের স্পিরিটটি ব্যক্ত হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইংরেজ ভারতে এসে এদেশের মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক কাঠামোটিকেই গ্রহণ করেছে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে তাকে চিরস্থায়ী করতে চেয়েছে। ফলে, সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের পরিবর্তে একটি নতুন ধরণের সামন্তশ্রেণীর উদ্ভূত হয়েছে। নবোদ্ভূত এই সামন্তশ্রেণী যেহেতু স্বার্থের দিক দিয়ে ইংরেজের সঙ্গে বাঁধা ছিলো তাই ইংরেজের সামান্যতম বিপদে এঁরা অস্থির হয়েছেন এবং এদেশে ইংরেজের রাজ্যরক্ষা ও বিস্তারে সাহায্য করবার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ যতোই প্রচার করুন না কেন, ইংরেজদের এদেশে রাজ্যবিস্তারের প্রধানতম কারণই ছিলো ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন। ব্যবসায়ী ইংরেজের কাছে ভারত ছিলো কাঁচামালের জোগানদার ও ব্রিটিশ পণ্যের বাজার। পরাধীনতার দরুণ কম দরে কাঁচামাল বিজয়ী ইংরেজের কাছে ভারতীয়রা বিক্রয় করতে বাধ্য থাকতো, আবার পণ্যদ্রব্য ইংলণ্ড থেকে এলে তা বেশি দরে তাকে কিনতে হতো। ফলে উভয়ক্ষেত্রেই তাকে ঠকতে হতো। ব্যবসায়ী ইংরেজ নিজের স্বার্থেই ভারতীয়দের ব্যবসা করার বিষয়টি সুনজরে দেখতো না এবং কলকারখানা যাতে ভারতীয় উদ্যোগে গড়ে উঠতে না পারে, সে বিষয়ে তাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিলো না। ইংরেজ কর্তৃক বাঙালী বস্ত্রশিল্পের নিধন কাহিনী তো ঐতিহাসিক কিম্বদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সাম্রাজ্যবাদী

ইংরেজের এই প্রচেষ্টার ফলে বাঙালী বুর্জোয়াশ্রেণী গড়ে উঠতে পারে নি। অবশ্য উনিশ শতকীয় বাঙালী মধ্যবিত্ত ও উচ্চসম্প্রদায়কে অনেক সময় বুর্জোয়া বলে উল্লেখ করা হয় বটে, কিন্তু বুর্জোয়া শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মনে রাখলে তাকে ঐ অভিধায় অভিহিত করা চলে না। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী ছিলেন মূলতঃ চাকুরীজীবী ও জমির উপসত্ত্ব ভোগী। শাসক ইংরেজ ও এঁদের শ্রেণীস্বার্থ ছিলো প্রায় এক। ইংরেজ আগমন এঁদের কাছে তাই আশীর্বাদের মতো। বাঙলার নবজাগৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন এঁরাই। তাই ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কের আকর্ষণ বিকর্ষণে এঁদের মানসিকতা প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয়েছে। বাঙলা নাটকের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে আমরা এই আকর্ষণ বিকর্ষণের গতিরেখাটি অনুধাবন করতে পারি, কেননা নাটকের মধ্যেই জাতির মানসিকতা সর্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয় রেনেসাঁস এনেছিলো জ্ঞানে ও কর্মে মুক্তি—যার উভয়মুখী সংমিশ্রণে শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞানে হয়েছিলো বিরাট অগ্রগতি। নবজাগৃতির যুগে বাঙালীর কর্মে অধিকার ছিলো না। আগেই বলেছি, তাঁরা ছিলেন মূলত চাকুরী-জীবী ও জমির উপসত্ত্বভোগী। তাই কর্মে মুক্তি বাঙালীর আসেনি। ফলে জ্ঞানের মুক্তি সর্বাঙ্গীন হতে পারেনি। ইউরোপীয় রেনেসাঁস যুগের বুর্জোয়া মধ্যবিত্তের সঙ্গে তাদের ছিলো গুণগত পার্থক্য। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, ভৌগোলিক নব নব আবিষ্কার, বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের বিস্তার, যন্ত্রশিল্পের অভূতপূর্ব অগ্রগতি প্রভৃতি নানা বিষয় মানুষের মনকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে তাকে বৃহৎ বিশ্বের মুখোমুখি এনে হাজির করেছিলো। তার ফলে, যে বিপুল কর্মোদ্দীপনা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মানুষ প্রতি শিরায় শিরায় অনুভব করেছিলো, তার সার্থকতম প্রতিফলন ঘটেছে এলিজাবেথীয় নাট্যসাহিত্যে। ক্রিয়া ও দ্বন্দ্বই যে নাটকের প্রাণ—এই মূলসূত্র তাই এলিজাবেথীয় নাট্যসাহিত্যই সর্বাপেক্ষা বেশি করে প্রমাণ করেছে। রেনেসাঁসের উপরোক্ত বিশেষত্বগুলি নবজাগৃতি যুগের বাঙালীর পক্ষে করায়ত্ত করা কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। বাঙালীর বিজ্ঞান সাধনা ছিলো কুণ্ঠিত। কর্মে অধিকার না থাকায় আবিষ্কারের নব নব পদ্ধতি নিয়ে মস্তিষ্ক বিকাশের প্রয়োজনও তার ঘটেনি। বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ও ব্যবহার-গত উদ্ভাবন যা হয়েছে, তাকে অকিঞ্চিৎকর বললেও অত্যুক্তি হয় না। জাতীয় সম্পদ বিকাশের বৃহৎ কর্মযজ্ঞশালায় তাই বাঙালীর শ্রম নিয়োজিত হতে পারেনি। ফলে তাদের জীবনপ্রবাহ হয়েছে নিস্তেজ, নিস্তরঙ্গ। যথার্থ প্রগতির জন্য প্রয়োজন ত্রিবিধ আন্দোলন—অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক। এই ত্রিবিধ আন্দোলনের মেল বন্ধনে রচিত হয় বিপ্লব। ইউরোপীয় রেনেসাঁস এই বিপ্লবের প্রকাশ মাত্র। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী দেশের অর্থনৈতিক

কাঠামো পরিবর্তনের জন্য বিশেষ কোনো আন্দোলনে নামেননি, দেশের গণজাগরণ সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন আশ্চর্য রকম নিস্পৃহ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরোধী। কদাচিৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে—যেমন নীল বিদ্রোহের সময় তাঁরা নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে আসতে সক্ষম হয়েছেন বটে, তবু তাঁদের রাজনৈতিক আন্দোলনের অধিকাংশই ছিলো কিছু মানবিক অধিকার লাভের দাবীদাওয়া—যেমন ইংরেজের সমতুল্য রাজপদ বা বিচারবিভাগীয় সমতা, এবং সেটুকু দাবী মেনে নেওয়াও ইংরেজের পক্ষে ছিলো অসম্ভব। ফলে নবজাগৃতি যুগের বাঙালীর চিন্তা ও উদ্যমের প্রায় সমস্তটাই ব্যয় হয়েছে সমাজসংস্কার, ধর্মান্দোলন ও শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে। সে শিক্ষার স্বরূপও মূলত শাসকশ্রেণীর প্রয়োজনে প্রযুক্ত শিক্ষা এবং দেশের অধিকাংশ লোকের কাছেই তা ছিলো অনধিগম্য। অর্থাৎ বাঙলাব নব-জাগৃতি যুগের বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণীবিন্যাস যা ছিলো তাতে সমাজ সংস্কার ও ধর্মান্দোলনের গণ্ডী ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসা তাঁদের পক্ষে বিশেষ সম্ভব ছিলো না। বাঙালী রচিত নাট্য সাহিত্য এই মানস প্রবণতার সাক্ষ্য বহন করে।

তবে কি নবজাগৃতি একেবারেই অর্থহীন ও অফলপ্রসূ? উপরোক্ত আলোচনা থেকে এধরণের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হবে না। বাঙলার নবজাগৃতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে যথার্থই প্রচুর পবিবর্তন এনেছিলো, এ প্রসঙ্গে এ তথ্য বিস্মৃত হলে চলবে না। মানবতাবোধ, স্বাধীন চিন্তার আকাঙ্ক্ষা, স্ত্রী জাতির সামাজিক বন্ধন মোচন প্রচেষ্টা, প্রাচীন প্রথানুগত্য অপেক্ষা উদার ধর্ম-বোধের শ্রেষ্ঠতা প্রচার প্রভৃতি বিশেষত্বগুলি যথার্থই গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালী বচিত সাহিত্য তথা নাট্যসাহিত্য এই বিশেষত্বগুলির স্বাক্ষরবাহী।

দুই

এবার নবজাগৃতি যুগের বিশেষত্বগুলি বাংলা নাট্যসাহিত্যে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। সেজন্য নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের পর্ববিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত—এই একশো কুড়ি বছরের গতিরেখাটি এখানে অনুসরণ করা যেতে পারে। স্বভাবতঃই এই দীর্ঘ সময়ের গতিরেখাটি খুব সরল ও বৈচিত্র্যহীন হতে পারে না। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে 'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুন' রচনার মাধ্যমে মৌলিক নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত। তারপর রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধুর হাতে নাটকের যৌবনপ্রাপ্তি। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনার মধ্য দিয়ে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ যুগের সুরু এবং পেশাদার রঙ্গমঞ্চকে আশ্রয় করে গিরিশচন্দ্র থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত—অর্থাৎ বাঙলা নাট্যসাহিত্য যাঁদের

রচনায় সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ হয়েছে—তাঁদের সাহিত্য কৃতি। মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের তিরোধানে ১৯১২/১৩ সাল নাগাদ এ পর্বের সমাপ্তি ধরা যেতে পারে। ১৯১২ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বলা যেতে পারে, পেশাদার রঙ্গমঞ্চে গতানুগতিকতার যুগ। এ পর্বে কিছু ভালো রচনার সাক্ষাৎ পেলেও একালের নাট্যকারেরা গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরীতিকে অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এ পর্বের গৌরবজনক ব্যতিক্রম। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাবলী যাকে সমালোচকবৃন্দ সাঙ্কেতিক নাটক নামে অভিহিত করে থাকেন—তা এই পর্বেই রচিত। তাঁর শারদোৎসবের রচনাকাল ১৯০৮ এবং 'কালের যাত্রা' ও 'তাসের দেশ' যথাক্রমে ১৯৩১ ও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে রচিত। এ সময়সীমার মধ্যে রচিত হয়েছে ডাকঘর, অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী প্রভৃতি কালজয়ী নাটক। রবীন্দ্রনাথের এই সুমহান নাট্যসাহিত্য যদি রচিত না হতো তবে আলোচ্য পর্বটিকে বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা দুর্বল পর্ব বলা চলতো। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এ কথাও স্মর্তব্য, রবীন্দ্রনাথ কখনো বাঙলার সমকালীন নাট্যান্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তাঁর নাট্য প্রচেষ্টা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এবং পেশাদার রঙ্গমঞ্চ—যার আশ্রয়ে গিরিশচন্দ্র থেকে সুরু করে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত নাট্যকারদের প্রতিভা বিকশিত হয়েছিলো—অধিকাংশ সময়েই রবীন্দ্রনাথকে নানা যৌক্তিক ও অযৌক্তিক কারণে অবহেলা করে গেছে। এ বিষয়ে পরে আরো বিশদ আলোচনা করা যাবে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান। তার পরবর্তী পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে বাঙলাদেশে এমন কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল, যার প্রভাব বাঙলা সাহিত্য তথা নাট্যসাহিত্যে হলো সুদূর প্রসারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের আগষ্ট বিপ্লব, পঞ্চাশের মন্বন্তর, আজাদ-হিন্দ ফৌজ ও নৌবিদ্রোহ, ছেচল্লিশের আত্মধ্বংশকারী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, স্বাধীনতা ও দেশবিভাগ ইত্যাদি নানা ঘটনাপ্রবাহ বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেল। তার ফলে যে নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠলো তার রচনারীতি ও বক্তব্য বিষয়েও গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল। ১৯৪২ সাল থেকেই, বলা যেতে পারে, এ পর্বের সুরু এবং তার রেশ অধুনাতন কাল পর্যন্ত প্রসারিত। অবশ্য একেবারে হাল আমলে বাঙলা নাটকের গতি পরিবর্তনের কিছু কিছু ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে, তবে তা কতখানি অন্ত্যর্থক ও ফলপ্রসূ তা এ মুহূর্তে বিচার করা কঠিন। কাজেই এ সুদীর্ঘ একশো কুড়ি বছরের নাট্যসাহিত্যের যদি পর্ববিভাগ করা যায়, তা নিম্নরূপ হবে।

এক : ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ মৌলিক নাট্যরচনার সূচনা কাল থেকে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপন পর্যন্ত। এ পর্বকে প্রস্তুতি পর্ব বলা যেতে পারে

দুই : ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত—পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপন থেকে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু পর্যন্ত। এই পর্বকে প্রতিষ্ঠা পর্ব নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

তিন : ১৯১২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ গিরিশচন্দ্রের তিরোধান থেকে আগষ্ট বিপ্লব ও পঞ্চাশের মন্বন্তর পর্যন্ত। এ পর্বকে অনুকারীপর্ব আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ এ পর্বের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

চার : ১৯৪২ থেকে অধুনাতন কাল পর্যন্ত।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে একথাও স্মর্তব্য যে উপরোক্ত পর্ববিভাগ কখনোই যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে না। তাছাড়া পর্বগুলির সময়সীমার মধ্যে আবার কখনো কখনো এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে যার প্রভাব নাট্যসাহিত্যে হয়েছে গভীর ও ব্যাপক। এ ধরণের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হলো।

এক : ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ—হিন্দু মেলা

দুই : ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ—নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন

তিন : ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

উপরোক্ত প্রত্যেকটি ঘটনাই বাঙলা নাট্যসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিলো।

তিন

বাঙলা সাহিত্যে মৌলিক নাটক যখন রচিত হতে সুরু করেছিলো তখন নবজাগৃতির তরুণ কাল। ইংরেজের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর সম্পর্ক তখন অতি মসৃণ। তাছাড়া প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান—যার প্রভাবে বাঙালীর মানসমুক্তি ঘটেছিলো বলা হয়ে থাকে—তার প্রভাব ছিলো অপরিসীম। রামমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কার প্রযাস (যার অধিকাংশই ছিলো স্ত্রীজাতির বন্ধনমুক্তির প্রচেষ্টা), রামমোহন দেবেন্দ্রনাথের ধর্মান্দোলন, শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর ভূদেবের নিরলস শ্রম, এবং অন্যদিকে ইয়ং বেঙ্গলের বাঁধন ছেঁড়া জয়োল্লাস—এই উভয় কোটির কর্মোদ্যমের প্রধান কথাই ছিলো উদার মানবতাবাদের উদ্বোধন ও প্রাচীন প্রথার অন্ধ আনুগত্যকে অস্বীকার। কাজেই প্রথম সার্থক নাট্যকার রামনারায়ণের নাট্য প্রচেষ্টা যে সমকালীন সমাজ আন্দোলনের স্বাক্ষরবাহী হবে তা আকস্মিক নয়। প্রথম প্রবীন প্রতিভাসম্পন্ন নাট্যকার মধুসূদনের নাট্যকৃতিতে যে অন্ধ প্রথানুগত্যের প্রতি ব্যঙ্গ ও উদার মানবতাবোধ ধ্বনিত হয়েছে তা গভীর অর্থবহ। যুগপরিবেশ ও প্রতিভার সার্থক মেলবন্ধন হয়েছিলো মধুসূদনে। তাই তাঁর নাট্য রচনায় যে বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হয়েছিলো, বাঙালীর মানস ভাবসাম্য বিচলিত হওয়ার পরবর্তী নাট্যকারগণ তার উত্তরাধিকারী হতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। পূর্বেই আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কের আকর্ষণ বিকর্ষণে বাঙালীর মানসিকতা প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয়েছিলো এবং নাট্যসাহিত্য এই আকর্ষণ বিকর্ষণে তরঙ্গায়িত

হয়েছিলো সর্বাপেক্ষা অধিক। ইংরেজ, অবশ্যই স্বীয় প্রয়োজনে, শিক্ষিত বাঙালীর কাছাকাছি সরে এসেছিলো ফলে ইংরেজ সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালীর প্রচণ্ড মোহমুগ্ধতা ছিলো। ইংরেজের সামাজিক ব্যবহার এই মোহকে প্রশ্রয় দিয়েছিলো। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজ এদেশে রাজত্ব ও বাণিজ্য করতো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব-কলমে। তাই শাসনকার্যে কিছু পক্ষপাতিত্ব ও পীড়ণ হলেও তাতে সকল ইংরেজ জড়িত নয়—বাঙালীর মনে এ ধারণা জন্মেছিলো। এই ধারণা থেকেই এসেছিলো বাঙালীর 'বড়ো ইংরেজ' ও 'ছোটো ইংরেজ' (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) চিন্তাধারা। তাছাড়া ইংরেজও জানতো এদেশে তাদের শাসন ও পীড়ণের রথ অব্যাহত রাখতে হলে বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীর সমর্থনের প্রয়োজন আছে। বিশেষতঃ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে যে একের পর এক প্রচণ্ড গণ-বিক্ষোভ বিদ্রোহের আকারে ফেটে পড়েছিলো, তার সঙ্গে শিক্ষিত শ্রেণীর নেতৃত্ব যদি মিলে যায় তাহলে ভারতে রাজত্ব করা তাদের পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব হবে, তা তারা জানতো। তাই বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীকে তুষ্ট রাখার চেষ্টা তাদের ছিলো। শিক্ষিত বাঙালীরাও—যেহেতু তাঁরা ছিলেন চাকুরীজীবী ও জমির উপসত্ব ভোগী—নিজস্ব স্বার্থে, হয়তো বা অজ্ঞাতসারে, ইংরেজের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তখন ভারত ও ইংল্যাণ্ডের ভৌগোলিক দূরত্ব ছিলো প্রচুর, তাই ঘন ঘন 'হোমে' যাওয়া ইংরেজের পক্ষে সহজ ও সম্ভব ছিলো না। তাই তারা অনেকটা বাধ্য হয়েই এদেশীয়দের সঙ্গে সামাজিকতায় আগ্রহী হতেন। বিজয়ী জাতির এই আগ্রহ পরাধীন বাঙালীর কাছে অভূতপূর্ব উদারতা বলে পরিগণিত হতো। কিন্তু ১৮৫৭/৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিলো। শিক্ষিত বাঙালী সিপাহী বিদ্রোহে অধিকাংশ সময়ে মৌন অবলম্বন করেছিলো এবং কখনো কখনো ইংরেজকে সক্রিয় সাহায্যও করেছিলো, তবু এদেশীয়দের সম্পর্কে ইংরেজের সন্দেহ অনেক বর্ধিত হলো। তার পরে পরেই হলো নীলবিদ্রোহ। নীলবিদ্রোহে বাঙালী কৃষকের প্রতি বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীর খোলাখুলি সমর্থন ইংরেজকে আরো উদ্বিগ্ন করে তুললো। অবশ্য সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করেও শিক্ষিত বাঙালীর নীলবিদ্রোহকে সমর্থন এবং ইংরেজ কর্তৃক আপাত হলেও নীলকরদের অত্যাচার রোধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু কোম্পানীর শাসন ক্ষমতাকে বিলোপ করে দিয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক শাসনভার গ্রহণের অর্থ প্রত্যক্ষ-ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুরু; সুয়েজখাল কাটার ফলে ইংল্যাণ্ডের ভৌগোলিক দূরত্ব হ্রাস প্রভৃতি ব্যাপার ইংরেজ বাঙালীর মানসনৈকট্যকে বিপর্যস্ত করে দিলো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র ইংরেজ জাতির প্রতিনিধি ছিলো না, কিন্তু ব্রিটিশ

রাজকর্মচারীরা সমগ্র ইংরেজ জাতির প্রতিভূ—এ সহজ সত্য ধীরে ধীরে তাঁদের হৃদয়ঙ্গম হতে সুরু করলো। তাই 'বড়ো ইংরেজ' 'ছোটো ইংরেজ' জাতীয় চেতনা ক্রমে বিলীন হতে লাগলো। তাছাড়া ইংরেজের যে law and justice-এর মাহাত্ম্যে শিক্ষিত বাঙালী মুগ্ধ ছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হাতে সেই law and justice-এর অপপ্রয়োগ দেখে তাঁরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। শিক্ষিত বাঙালীরা কিন্তু তাতে বিদ্রোহে ফেটে পড়ে বিপ্লবের পথে গেলেন না। কেননা সেপথে যাওয়া—আগেই বলা হয়েছে শ্রেণীগত স্বার্থের কারণে তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তাঁদের হলো অভিমান। অর্থাৎ আপন জনের কাছে আশা করে যদি তা পূরণ না হয়, তাহলে যে ধরণের মনোভঙ্গী মানুষের মনে প্রশ্রয় লাভ করে, এই অভিমান তার চাইতে বিশেষ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছিলো না। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে' যত না ছিলো বিদ্রোহ, তার চাইতে বেশী ছিলো ইংরেজের law and justice-এর ওপর অগাধ আস্থা এবং ইংলণ্ডেশ্বরীর কাছে কাতর আবেদন। অবশ্যই এই মন্তব্যে নীলদর্পণের সাহিত্য মূল্য বা তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা হচ্ছে না, শুধু সমকালীন বাঙালীর মানসিকতা কেমন ছিলো অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকৃতি নীলদর্পণের উদাহরণ দিয়ে তা ব্যক্ত করা হলো মাত্র।

চার

ইংরেজ বাঙালীর সামাজিক সম্পর্ক যে খুব একটা গভীর ও আন্তরিক ছিলো না, ঐতিহাসিক ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার সে বিষয়ে Social relation between Englishmen and Indians[১] প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। নানাভাবে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে তিনি মন্তব্য করেছেন—The Europeans now began to show those signs of aloofness from Indians which culminated in almost complete isolation after the outbreak of 1857.[২] শুধু তাই নয়, তিনি আরো বলেছেন—The cases of assault of Indians by Europeans not only continued throughout the period under review, but seem to have been on the increase as year rolled by[৩] ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ডিগবি সাহেব ও ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে W. S. Blunt ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজের ব্যবহার নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। ভারতীয়দের সম্পর্কে ইংরেজদের সাধারণ ধারণা কিরূপ Garrat তার বিবরণ দিয়েছেন—Countless middle class Englishmen learnt to look upon Indians as the creatures, half gorilla, half negro.[৪] ইংরেজের এই পরিবর্তিত মনোভঙ্গী বাঙালীর অবিদিত ছিলো না। কিন্তু তবু তাঁদের

মোহভঙ্গ হয় নি। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর যখন একের পর এক আইন পাশ করে ক্রমাগত ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার হরণের উদ্যোগ হতে লাগলো, তখন তাঁরা বিচলিত হলেন। বিশেষত ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে The Indian Whipping Act তাঁদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দিয়ে গেল। Sir Henry Cotton এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—The Indian Whipping Act was passed in 1864 and is one of the disastrous consequences of post-Mutiny legislation.[৫] ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন—The Bengalees, who were more advanced in political ideas, were the bete-noire of the Jingo imperialists. A strong anti-Bengalee feeling marked the average Englishmen throughout the nineteenth century.[৬] ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে Calcutta Review পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ইংরেজের এই মনোভঙ্গী আরো স্পষ্ট রূপ নিয়েছে—Provincial Bengalees are the same, unsophisticated and uneducated; mere varieties of timid, cunning, perfidious race unlike a man of action……Bengal of the Bengalees is not civilised……Bengal of the Bengalees is a land of cowards and liars… It is but a race of women, not men।[৭] এর চাইতে কটু মন্তব্য আর কি হতে পারে? কাজেই সুরু হলো উল্টো রথের পালা। ইংরেজ-বাঙালীর মানসমিলনে যে ফসল ফলতে সুরু করেছিলো ১৮৬৫।৬৬ খৃষ্টাব্দে এসে তার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল এবং এটি কম তাৎপর্যপূর্ণ নয় যে বাঙলা সাহিত্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার বীজ বপণ হয়েছিলো এ সময়ের পূর্বে। যাই হোক, সম্পর্কের এই জোয়ার-ভাঁটা বা ভাঙা-গড়ার ইতিহাসে সবচাইতে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলো বাঙলা নাটক। রামনারায়ণ তর্করত্নের শ্রেষ্ঠ নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব' ও 'নবনাটক' রচিত হয়েছিলো যথাক্রমে ১৮৫৪ ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে। মধুসূদনের কলপ্রসূ নাট্যজীবন স্থায়ী হয়েছিলো ১৮৫৮ থেকে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। দীনবন্ধু প্রতিভার দিকচিহ্ননির্দেশক নাটকদ্বয় 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী' রচিত হয়েছিলো যথাক্রমে ১৮৬০ ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে। আমাদের প্রস্তাবিত প্রথম পর্বের অন্তর্গত নাট্যকারদের মধ্যে এ তিনজনই প্রধান এবং মধুসূদন তার অবিসংবাদী অধিনেতা। এই সময়ে বাঙালীর চিন্তাজগতে ইংরেজী তথা ইউরোপীয় নবজাগরণজাত যে মূল্যবোধ গড়ে উঠেছিলো তার মধ্যে একটি প্রচণ্ড মুগ্ধতাবোধ ছিলো। তাই প্রাচ্য নাট্যাদর্শ অস্বীকার করে কেন বাঙলা নাটক প্রতীচ্য-ধর্মী হবে তার দীর্ঘ কৈফিয়ৎ প্রথম মৌলিক নাট্যকার যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'কীর্তিবিলাস' নাটকের ভূমিকায় দিয়েছেন। এই পর্বের নাটকগুলো বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো অনুধাবন করা যায়:

[এক] মানবতাবোধ

[দুই] নারীর সামাজিক বন্ধন মুক্তি
[তিন] সামাজিক উৎকেন্দ্রিকতাকে ব্যঙ্গ করে প্রহসন—যা মূলত গঠনমূলক
[চার] সীমাবদ্ধ হলেও কিছু রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সচেতনতা

রামনারায়ণ তর্করত্ন যখন 'কুলীনকুলসর্বস্ব' বা 'নব নাটক' লিখেছিলেন, তখন তিনি স্পষ্টতই বিদ্যাসাগরের সমাজ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ রূপটি প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। অর্থাৎ সমসাময়িক সমাজ আন্দোলনের গঠনমূলক ও অস্ত্যর্থক আবেদনে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন। নারী সম্পর্কিত ধারণায় শিক্ষিত বাঙালীর যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিলো, তা প্রায় পুরোটাই চিন্তা জগতে, সমকালীন বস্তু জগতে নয়। তাই নারীর আত্মবিকাশের ক্ষেত্র দেখাতে গিয়ে মধুসূদনকে কখনো আশ্রয় নিতে হয়েছে হিন্দু মহাকাব্য বা পুরাণ, গ্রীক উপকথা এবং দূর অতীতের ঐতিহাসিক কাহিনী। কিন্তু তবু মধুসূদন পুরাণ অবলম্বনে ভক্তিরসাশ্রিত পৌরাণিক নাটক লিখতে বসেননি এবং ইতিহাসের আশ্রয়ে দেশপ্রেম প্রচারেও ব্যস্ত হননি। কেননা তাঁর যুগ-পরিবেশ তাঁকে তেমনভাবে পরিচালিত করে নি। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে তাই রয়েছে নারীর স্বাধীন চিত্তবৃত্তির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে জটিল রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পতিত চিরন্তন মানব মনের দ্বন্দ্ব ও ব্যথাদীর্ণ হাহাকারই ধ্বনিত হয়েছে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' তাই সাধারণ মানুষের পদ সঞ্চারে অগ্নিগর্ভ। এ পর্বে যে তিনটি শ্রেষ্ঠ প্রহসন রচিত হয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ করে আরো সহজে আমাদের প্রতিপাদ্যে পৌঁছুতে পারি, কেননা প্রহসনের মধ্যেই সমসাময়িক সমাজ মানস সর্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'সধবার একাদশী'—এ তিনটি প্রহসনে প্রকাশিত হয়েছে একদিকে প্রাচীন পন্থীদের রক্ষণশীলতার ভণ্ডামী এবং অন্যদিকে তথাকথিত প্রগতি পন্থীদের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ। এই বিদ্রূপ নাট্যকারদ্বয় করেছিলেন গঠন-মূলক দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারা পরিচালিত হয়ে। অর্থাৎ আমাদের সমাজের যথার্থ উন্নতির জন্য যেগুলো বাধা বলে তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন, তাকে কশাঘাতে বিধ্বস্ত করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো।

পাঁচ

কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে এ পর্বের ধীরে ধীরে রূপান্তর হচ্ছিলো। একদিকে যেমন নাট্য জগতের কিছু ঘটনা প্রবাহ সৌখিন নাট্যশালার পালা শেষ করে পেশাদার মঞ্চ যুগের সূত্রপাত করেছিলো, অন্যদিকে বাঙলার সামাজিক জীবনে চিন্তাধারার পরিবর্তনের ফলে নাট্য রচনার ক্ষেত্রেও পালা বদলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ‘হিন্দুমেলার’ পত্তন হয়। ‘ন্যাশনাল’ নব গোপাল মিত্র কর্তৃক এই মেলাটির প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য ছিলো ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কের বাঁধন ছেঁড়া গৃহাভিমুখী বাঙালীকে মানসিক আশ্রয় দান। এর আগের যুগে যেমন ছিলো ‘যা কিছু ইংরেজের সব ভালো’—এ জাতীয় চেতনা। এবং সম্ভবত তার ফলেই বাঙালীর লোকনাট্যের মধ্যে যে প্রাণশক্তি নিহিত ছিল তার প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর অবহেলা পরিলক্ষিত হয়েছিলো। যে কোনো দেশেই নাট্যরচনার সূচনা পর্বে লোকনাট্য একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। রেনেসাঁস যুগের উষাকালে ইউরোপে যে নাট্য রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়—যার চরম বিকাশ এলিজাবেথীয় ইংল্যাণ্ডে এবং সমকালীন স্পেনে—সেখানে স্ব স্ব দেশের লোকনাট্যই অভিজাত নাট্য রচনার ভিত্তি বলে পরিগণিত হয়েছে। স্থানিক ও সাময়িক হওয়া সত্ত্বেও লোকনাট্যের মধ্যে যে প্রাণশক্তি নিহিত থাকে, তার সঙ্গে সমাজের উচ্চকোটির মানস সম্মিলনে যথার্থ জাতীয় নাটক গড়ে ওঠে এবং সেই নাটক দেশে কালে সীমাবদ্ধ হলেও তা সার্বজনীন। কিন্তু কোলকাতা নিবাসী বাঙালীর সাহিত্য তাঁদেরই সৃষ্টি—যাঁদের সঙ্গে বাঙলার গ্রাম সমাজের ঘটেছিল বিরাট বিচ্ছেদ। তাই অবহেলিত অবজ্ঞাত গ্রাম্য সমাজ কোন্ ধরণের শিল্পকর্মের মাধ্যমে তাদের নাট্যরস পিপাসা মিটিয়ে চলছিলো, তার প্রতি শিক্ষিত বাঙালীরা ছিলেন নিদারুণ ভাবে অজ্ঞ। হিন্দু মেলার প্রবর্তন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ-ভাবে হলেও নাট্যকারদের দৃষ্টি ও মনকে তৎকালে প্রচলিত লোকনাট্য ও যাত্রার দিকে নিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলো। ফলে তাঁদের মধ্যে একটি নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল যার প্রকৃতি পূর্ববর্তী পর্ব থেকে পৃথক। কাজেই ‘হিন্দুমেলার’ প্রবর্তনের কারণ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা এ প্রসঙ্গে অবান্তর হবে না।

আগেই বলা হয়েছে, পূর্ব যুগটি ছিলো ইংরেজদের প্রতি মুগ্ধতার যুগ। ইংরেজ আমাদের সঙ্গে যেমন ব্যবহারই করে থাক না কেন, আমরা ছিলাম কৃতজ্ঞ বিনীত, ইংরেজ উদারতায় বিমুগ্ধ। সে বিমুগ্ধতার ফলে প্রতীচ্যের সঙ্গে যে মানস সম্মিলন ঘটেছিলো তা আমাদের জাতীয় জীবনে এবং পরিণামে সাহিত্য জগতে নতুন যুগের পত্তন করেছিলো, তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু এই মূল্য-বোধ ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে পড়ছিলো। তার কারণ পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে। ইংরেজের সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সূত্রপাতে আমাদের প্রয়োজন হলো নিজস্ব জগত এবং যেহেতু বাঙালীর মনোভঙ্গী অনেকটাই ছিলো অভিমান মূলক, তাই আমাদের প্রমাণ ও প্রচারের প্রয়োজন হলো যে বাঙালীরাও একেবারে অপদার্থ নয়, আমাদের সমাজের মধ্যেও প্রচুর অস্তিবাচক বিষয় আছে। ‘হিন্দু-মেলা’ হলো এই অস্তিবাচক বিষয়গুলো প্রদর্শনের মঞ্চ। এখানে লক্ষ্যণীয়, এই

মেলাব নাম 'হিন্দুমেলা'— বাঙালী মেলা', 'ভাবত মেলা' বা জাতীয় মেলা' নয়। অর্থাৎ এই সঙ্গে সুরু হলো Hindu Revivalism এবং সূত্রপাত হলো বাঙলা তথা ভারতবর্ষের ভাবী বিপদের। ন্যাশনাল নবগোপালেব ন্যাশনালিজমের ধাবণা ভাবতীয মুসলমানদেব বাদ দিয়ে ব্যক্ত হলো। হিন্দুমেলা'র সঙ্গে যুক্ত সমকালীন বুদ্ধিজাবী বাঙালীব যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষযটি নজবে পড়ে নি, সেটা সত্যই দুভাগ্যজনক এবং এই 'হিন্দুমেলা'র ন্যাশনালিজম্ যে অনেকটাই ছিলো ইংবজের অন্ধ অনুকবণ তা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব তীব্র ব্যঙ্গোক্তিতে[৮] প্রকাশিত। যাই হোক বাঙালী নাট্যজগত অর্থাৎ নাটক বচনা ও রঙ্গমঞ্চ অতঃপব হিন্দু মেলা দ্বাব কি গভাবভাবে প্রভাবিত হযেছিল তা আমবা আলোচনা কবে দেখবো।

ছয

হিন্দুমেলাব উদ্বোধন হয ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দেব এপ্রিল মাসে। হিন্দুমেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুব ও সহ সম্পাদক নবগোপাল মিত্র এ মেলাব উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছিলেন ১৭৮৮ শতাব্দেব চৈত্র সংক্রান্তিতে যে একটি জাতীয মেলা হইয়াছিল, স্বজাতীয়দিগেব মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কবা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বাবা স্বদেশেব উন্নতি সাধন করাই তাহাদেব উদ্দেশ্য।"[৯] এই হিন্দুমেলাব উৎস হলো বাজনাবায়ণ বসু প্রবর্তিত "জাতীয গৌবব সম্পাদনী বা গৌবেচ্ছা সঞ্চাবণী সভা"। এই সভাব কার্যক্রম আবো ব্যাপক কবাব উদ্দেশ্য নিযে বাজনাবায়ণ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংবেজীতে একটি অনুষ্ঠানপত্র বচনা কবেন। এই অনুষ্ঠান পত্রটিব স বমম ১৭৮৮ শকেব আশ্বিনসংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায প্রকাশিত হযে-ছিলো। এই পত্রে—"হিন্দু ব্যায়াম, হিন্দু সঙ্গীত, হিন্দু চিকিৎসা বিদ্যা এবং সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষাব অনুশীলন, যত পাবা যায বাঙলা শব্দ ব্যবহাব কবিযা আমাদিগেব কথোপকথনেব ভাষাব বিশুদ্ধতা সম্পাদন। বাঙলাভাষায পবস্পব পত্রলেখা এবং বাঙালীব সভাতে বাঙলায বক্তৃতা কবা, সুবাপানাদি বিদেশীয় অনিষ্টকব প্রথা যাহাতে প্রচালত না হয তাহাব উপায অবলম্বন কবা, হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন কবিযা সমাজ সংস্কাব কার্য সম্পাদন কবা, স্বদেশীয সুপ্রথা সকল বক্ষা কবা, নমস্কাব প্রণামাদি স্বদেশীয় শিষ্টাচাব পালন কবা, বিদেশীয রীতিতে পবিচ্ছদ পবিধান ও আহাব কায সম্পাদন পবিত্যাগ কবা, দেশীয ভাষায নাটকাদি অভিনয কবা ইত্যাদি বিবিধ বিষয আলোচিত হয।'[১০] 'বাজ নাবাযণ বসু লিখেছেন—"শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহোদয আমাব প্রণীত 'জাতীয় গৌববেচ্ছা সঞ্চাবিণী সভাব অনুষ্ঠানপত্র পাঠ কবাতে হিন্দুমেলাব ভাব তাঁহাব মনে প্রথম উদিত হয। ইহা তিনি আমাব নিকট স্পষ্ট স্বীকার কবিয়াছেন। এই হিন্দুমেলা সংস্থাপন কবিবাব পব উহাব অধ্যক্ষতা কবিবাব জন্য মিত্র মহাশয় জাতীয় সভা সংস্থাপন কবেন।"[১১] হিন্দুমেলাব উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম বছবেব অধিবেশনে যেসকল প্রস্তাব

গৃহীত হয়, তাদের মধ্যে হিন্দু "সমাজের বাৎসরিক উন্নতি, স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলন, দেশীয় লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শন, স্বদেশীয় সঙ্গীত নিপুণ ব্যক্তিগণকে উৎসাহদান" ইত্যাদি প্রধান ছিলো। দ্বিতীয় বৎসরের অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার উদ্দেশ্য আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন "আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য. ইহা ভারতভূমির জন্য।

"ইহার আরো একটি. মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনিভর। এই আত্মনির্ভর ইংরেজ জাতির প্রধান গুণ। আমরা সেই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহৎকর্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনিভর কহে।··· কেন আমরা কি মনুষ্য নহি ?···অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয় ভারতবর্ষ বদ্ধমূল হয় তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।"[১২] আবার এই আত্মনিভরতা সম্পর্কে যাতে শাসক ইংরেজের কোনো ভুল ধারণা না হয়, সেজন্য প্রথম অধিবেশনের প্রধান বক্তা assured the assembly that it was purely a social and neither a religious or political one[১৩] এই উক্তিতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এই মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তৃতীয় বছরের অধিবেশনের অন্যতম উদ্যোক্তা মনোমোহন বসুর বক্তৃতায় আরো বিশদ ভাবে আলোচিত হয়। তিনি বলেন— "সামাজিক উন্নতি বলাতে সমাজের নিয়মাদি পরিবর্তন অথবা নূতন প্রথা প্রচলনদ্বারা সমাজের উন্নতি সাধন করা এ মেলার উদ্দেশ্য নহে ; সাধ্যায়ত্তও নহে। সমাজবন্ধন দৃঢ় করা এবং সামাজিকতার নষ্টোদ্ধার করাই সার অভিপ্রায়।"[১৪] এ উক্তিটির মাধ্যমে তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালীর মানসিকতা অত্যন্ত স্পষ্টরূপ লাভ করেছে। যাইহোক, এই হিন্দুমেলা কিভাবে বাঙলা নাট্যজগতকে প্রভাবিত করেছে, সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। "হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থখানি পাঠ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে যদিও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় এই মেলার অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছিলো, কিন্তু এ মেলার কর্মীপুরুষ ছিলেন প্রধানত দুজন— নবগোপাল মিত্র ও মনোমোহন বসু। বাগবাজারের যে মধ্যবিত্ত তরুণদল নাট্যাভিনয়ের প্রচণ্ড ক্ষমতায় কোলকাতার বুকে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন নবগোপাল মিত্র ছিলেন তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই তরুণ সম্প্রদায়ের নাট্যাভিনয় ক্ষমতা যতটা ছিলো, তেমন ছিলো না অর্থসামর্থ। তাই তখনকার সৌখিন নাট্য প্রযোজনার বিপুল ব্যয়ভার বহন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। একমাত্র পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রবর্তন মাধ্যমেই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে—এরূপ ধারণার যাঁরা উৎসাহদাতা ছিলেন নবগোপাল মিত্র তাঁদের অন্যতম। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"এই উদ্যমে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, 'মধ্যস্থ' সম্পাদক মনোমোহন বসু, 'ন্যাশনাল পেপার' সম্পাদক নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি উৎসাহ দিতে লাগিলেন।"[১৫]

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়—"কথা উঠলো থিয়েটারের কি নাম দেওয়া হবে?……নবগোপাল বাবু আমাদের থিয়েটারের নাম The Calcutta National Theatre রাখবার প্রস্তাব করেন। শেষে মতিবাবুর প্রস্তাবমত Calcutta টুকু বাদ দিয়ে কেবল The National Theatre রাখা হয়।"[১৬] কাজেই এই National Theatre-এর প্রবর্তনায় হিন্দুমেলায় উদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতার কথা স্পষ্টই প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনার মধ্যদিয়ে নাট্যরচনার যে নতুন পর্ব সুরু হলো তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

সাত

কিন্তু বাঙলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে আরো একটি অর্থপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছিলো। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ হিন্দুমেলা প্রবর্তনার বছরেই রচিত হয়েছিলো মনোমোহন বসুর প্রথম নাটক 'রামাভিষেক নাটক'। আগেই উদ্ধৃত হয়েছে, 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র প্রস্তাবিত কার্যাবলীর মধ্যে ছিলো 'দেশীয় ভাষায় নাটকাদি অভিনয় করা।' অর্থাৎ অতিরিক্ত প্রতীচ্যমুখীনতা নাট্যকলায় বর্জন করাই ছিলো এর মূল উদ্দেশ্য। মনোমোহন বসুর প্রথম নাট্যরচনায় এই উদ্দেশ্য প্রতিফলনের প্রচেষ্টা অলক্ষ্য নয়। এই প্রথম বাঙলা সাহিত্যে মহাকাব্য ও পুরাণ অবলম্বনে পৌরাণিক নাট্যরচনার সূত্রপাত হলো। পৌরাণিক নাটকের মূল অবলম্বন ভক্তিরস। এর আগে মহাকাব্য বা পুরাণ অবলম্বনে যে সকল নাটক রচিত হয়েছিলো, তা ভক্তি রসাশ্রিত ছিলো না, তাতে ছিলো মানব মুখীনতা। প্রমাণ, মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটক। কিন্তু হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য'জাতীয়ভাবের উদ্দীপন'এবং আমাদের জাতীয় ভাব'ধর্মাশ্রিত ভক্তিরস প্রবাহিনী' —এই পৌরাণিক ধারার বিখ্যাত নাটকগুলো রচনা করেই গিরিশচন্দ্র ঘোষ জাতীয় নাট্যকার অভিধায় অভিহিত হয়েছিলেন এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্নেহ কৃপা লাভ করেছিলেন। কাজেই আমাদের নাটকে জাতীয় ভাবপ্রবাহ আনয়নে মনোমোহন বসুকে ভগীরথ বলা চলে। শুধু যে নাট্যরস পরিবেষণে পরিবর্তন এলো তা নয়, নাট্য রচনারীতিও পরিবর্তিত হলো। এতদিন প্রধানত প্রতীচ্য নাট্যরচনারীতি বাঙালী নাট্যকারদের অনুসরণের পালা ছিলো। কিন্তু এবার প্রয়োজন হলো দেশীয় নাট্যকলা উদ্ভাবনের, সেইরূপ দেশীয় নাট্যকলা প্রচলিত গীতিবহুল যাত্রার আশ্রয়েই সৃষ্ট হওয়া সম্ভব—এমন ধারণা রূপ নিতে লাগলো। মনোমোহন বসু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন—"আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, নাট্যাভিনয়ে গানের বড় আবশ্যক হয় না। ইউরোপীয় রঙ্গভূমিতে নাটকাভিনয়কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাহারা এই সংস্কারের বশতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও স্বদেশীয় রুচি যে সম্যক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাহারা

ভাবিয়া দেখেন না। যে স্থানে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্যেই গান নহিলে চলে না—…যেদেশ কালোয়াতি গান সকলে বুঝিতে পারে না বলিয়া অপর সাধারণের তৃপ্তির নিমিত্ত যাত্রা, কবি, পাঁচালী, মরিচা, তর্জা, ভজন, কীর্তন, ঢপ, আখড়াই, হাফ আখড়াই, পদাবলী…বাউলের গান প্রভৃতি বহু প্রকার গীতিকাব্যের প্রচলন…সে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সঙ্গীতের রস প্রবৃষ্ট হইয়া আছে, তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে? যাত্রাওয়ালারা স্বভাবের ঘাড় ভাঙ্গিয়া অপ্রাকৃত সং, রং, ঢং ইত্যাদি তামাসা দেখাইবার পরেও সহস্র সহস্র লোকের যে এতদূর চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, সে কি শুদ্ধ দেশস্থ লোকের অনভিজ্ঞতা ও গুণ গ্রহণের অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত? কদাচ নহে।"[১৭] অর্থাৎ প্রতীচ্য নাট্যরচনারীতিকে অস্বীকার করে বাঙলা নাটকে দেশীয় ভাব প্রবর্তনের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানালেন মনোমোহন বসু এবং খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে এই বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম বাৎসরিক সভায়। এই ন্যাশনাল থিয়েটারকে আশ্রয় করেই বাঙলার জাতীয় নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যপ্রতিভা স্ফুরিত হয়েছিলো। উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশ অনুধাবন করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়। বাঙালীর নাট্যরচনা ইংরেজ আদর্শে হওয়া উচিত নয়, কেননা স্বদেশীয় রুচি ভিন্ন। আমাদের নাটক লোকনাট্য বা যাত্রার আদর্শে রচিত হওয়া বিধেয় ও তার জন্য প্রয়োজন নাটকে গীতিবাহুল্য। যাত্রার প্রাধান্য ও কবি পাঁচালী প্রভৃতি লোকপ্রচলিত সঙ্গীত নাটকে গ্রহণের ফলে তার আবেদন সমাজের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে সীমাবদ্ধ না থেকে সাধারণ মানুষের বৃহত্তর অংশের কাছে পৌঁছোতে সক্ষম হবে। এপ্রসঙ্গে মনোমোহন বসু আরো বলেছেন—"যাত্রাওয়ালারা সুসিদ্ধ হয়, তাহার কারণ কেবল তাহাদের গান ভিন্ন আর, কিছুই না। যাত্রার দোষের মধ্যে স্থান কাল ও চরিত্র সম্বন্ধে স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি না রাখা; ওপক্ষে আবার বর্তমান নাট্যাভিনয়ের মধ্যেও গানের অসঙ্গতি বা অপকর্ষতাই একটি মহদ্দোষ। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই বোধহয় যে অভিনেত্রীগণ অধুনা যেরূপ অভিনয়ের নিমিত্ত যত্ন পান, তৎসঙ্গে গানের পারিপাট্য সাধনার্থ যদি তদ্রূপ মনোযোগী হইতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের অভিনয় দর্শন সময়ে শ্রোতা ও দর্শকমণ্ডলী একেবারে মোহে অভিভূত হইয়া গলিয়া যাইবেন। আমরা এমন বলিতেছি না, যে যাত্রাওয়ালারা যেমন কথায় কথায়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া থাকে, নাটকেও তদ্রূপ হউক। আমার অভিপ্রায় এই যে, স্বভাবোক্তির পর যেখানে যেখানে গান খাটিতে পারে, তাহা উক্ত স্বাভাবিক নিয়মে সংখ্যায় যতই কেন হউক না, ফলত যেকয়টি গান হইবে, সে কয়টি যেন উত্তমরূপে গাওয়া হয়।…আমরা চাই দেশে পূর্বে যাহা ছিলো, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই, সেই যাত্রার গানসংখ্যা কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়া

নাটকের কথোপকথনাদি বিবৃত হউক।"[১৮] এপ্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে কবিওয়ালা ও তর্জা গায়কদের সঙ্গে মনোমোহন বসু ও গিরিশচন্দ্রের নাট্যজীবনের প্রারম্ভে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো। গিরিশচন্দ্র যাত্রার দলে অভিনয়ও করতেন। যাই হোক দেশীয় যাত্রার প্রভাবে মনোমোহন বসুর রচনা 'গীতাভিনয়' নামে অর্থবহ হয়ে উঠলো। অর্থাৎ বাঙলা নাট্যরচনারীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিলো। অবশ্য মনোমোহনে যা ছিলো সূচনা তা সার্থক হয়েছিলো গিরিশচন্দ্রের লেখনীর মাধ্যমে। মনোমোহন আরেকটি নতুনত্বের প্রবর্তন করলেন—যেটির সম্পর্কে সম্ভবত তিনি ততটা অবহিত ছিলেন না কিন্তু তার প্রভাব হয়েছিলো সুদূর প্রসারী—সেটি হলো, মহাকাব্য ও পুরাণ অবলম্বনে রচিত নাটকে ভক্তিরসের প্রাবল্য। এই শ্রেণীর নাটকই আমাদের সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক অভিধা লাভ করেছে। অর্থাৎ আমাদের দেশের সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মূলে যে ভক্তিরস ক্রমাগত উৎসারিত হচ্ছে, এই শ্রেণীর নাটকে ঈশ্বরের কাছে সেই অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণের কাহিনী নানাভাবে রূপ পেয়েছে। এই ভক্তিরস আমাদের প্রচলিত ধর্মবোধের আশ্রয়ে যাতে পরিপুষ্ট ও প্রকাশিত হতে পাবে, সেবিষয়ে নাট্যকারদের প্রচেষ্টার অন্ত ছিলো না। তাছাড়া বাঙলা নাটক আর এইসময় থেকে সৌখিন রঙ্গমঞ্চে কিছু ধনীব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্কীর্ণতায় সীমাবদ্ধ রইলো না, এখন তা সাধারণ রঙ্গালয়ের পাদপ্রদীপে দেশের আপামর জনসাধারণের বিস্মিত দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম পেশাদার রঙ্গমঞ্চ ন্যাশনাল থিয়েটার উদ্বোধনের মাধ্যমে এই যুগাবর্তনের পদসঞ্চার। এই সময় থেকেই বাঙলানাটকের আন্তরসত্তায় ঘটলো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। তাই যা কিছু 'দুষ্প্রবৃত্তিসাধক' ও 'ধর্মনীতিঘাতক'—তাই-ই মনোমোহন বসুর ভাষায় কঠোরভাবে ধিকৃকৃত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষণা করেছিলেন "জাতীয় বৃত্তি পরিচালনা ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতির হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম ধর্ম। দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম স্পর্শ করিতে পারিবেন না। ভারত ধার্মিক।···হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম, মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।"[১৯] মনোমোহন বসুর প্রচেষ্টা ও গিরিশচন্দ্রের প্রতিভাব স্পর্শে লোকরুচিপ্রিয় এই ধর্মবোধ নাটকে রূপান্তরিত হয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পরিবেষিত হতে লাগলো।

আট

১৮৭২ থেকে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙলা নাটকের প্রতিষ্ঠা কাল। পূর্ববর্তী পর্বের সঙ্গে এই পর্বের মূল পার্থক্য হলো এই যে পূর্ববর্তী পর্বে নাট্যরচনা ছিল সৌখিন মঞ্চ আশ্রিত। এই পর্বে সৌখিন নাট্যশালা বিলুপ্ত না হলেও পেশাদার মঞ্চের তুলনায় নিষ্প্রভ হয়ে পড়লো। এই পেশাদার মঞ্চ অবলম্বনেই বঙ্গরঙ্গ-জগতের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান নাট্যকারগণ আবির্ভূত হলেন। পূর্ববর্তী পর্বের

নাট্যরচনা প্রয়াস ছিল মূলত শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত। 'বাঙলা সাহিত্যে ভাল নাটক নেই। অতএব ভালো নাটক লিখতে হবে'—প্রথম পর্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মধুসূদনের এই ছিল মনোভাব। কখনো কখনো সাময়িক উদ্দেশ্য প্রণোদিত নাটক রচিত হয়েছে, কিন্তু তা প্রায় কোন সময়েই নাট্যকারদের শিল্পদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে নি। তাছাড়া, সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত নাটকগুলোর মূল বক্তব্য ছিলো গঠনমূলক, প্রাচীন পন্থা-বিরোধী ও সংস্কারপন্থী। প্রচলিত ধর্মবোধ অপেক্ষা জীবনধর্ম প্রকাশই প্রথম পর্বের নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশ্লেষণ করলে এই পর্বের নাটকগুলোকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—

ক: রোম্যান্টিক নাটক—যার মুখ্য অবলম্বন জীবননিষ্ঠ প্রেম, যথা—শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী।

খ: ঐতিহাসিক নাটক—ইতিহাসের জটিল রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পতিত অসহায় মানবমনের দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ জীবনের প্রকাশ, যথা—কৃষ্ণকুমারী। তাছাড়া, সমকালীন ইতিহাসের সংঘাতও 'নীলদর্পণ' নাটকে প্রকাশিত।

গ: সামাজিক নাটক—অতীতের অন্ধ আনুগত্য অস্বীকার করে নবযুগের যে সংস্কারমুখী সমাজ আন্দোলন, এ শ্রেণীর নাটকগুলো তারই রূপায়ণ। যেমন, কুলীন-কুলসর্বস্ব বা বিধবা বিবাহ নাটক।

ঘ: প্রহসন—এ শ্রেণীর নাটকগুলো পূর্ববর্তী শ্রেণীর নিকট আত্মীয়, শুধু মেজাজে পৃথক। অর্থাৎ সংস্কারমুখী সমাজ আন্দোলনে বিশ্বাসী নাট্যকারগণ এখানে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে তাঁরা সমাজের চেতনা সম্পাদনে আগ্রহী। যথা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, সধবার একাদশী।

কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের নাট্যকারদের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকাংশে পৃথক। তাঁরা কেবলমাত্র শুদ্ধ শিল্পের জন্য নাট্যরচনায় ব্রতী হলেন না। তাছাড়া তাঁদের সামনে প্রেরণা হিসেবে উপস্থিত সাধারণ দর্শক। সেই দর্শকদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য কিরূপ সে প্রসঙ্গ পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে কিন্তু এই নবজাগ্রত গণদেবতাকে অস্বীকার করে নাট্য-রচনা তাঁদের সাহস ছিলো না, ইচ্ছেও ছিলো না। কেননা এই পর্বের নাট্যকর্মীদের এবং নাট্যকারদেরও জীবিকার একটি বড় অংশ পূর্ণ হতো এঁদের অর্থে। এই বিপুল দর্শকশ্রেণীকে কেবলমাত্র শুদ্ধ শিল্পের আশ্বাসে ভোলালে চলতো না। তাই তাঁদের পছন্দসই বিষয়বস্তু পরিবেষণে নাট্যকারেরা বাধ্য হলেন। সেজন্য তাঁদের রচনাভঙ্গীতে এলো পরিবর্তন।

শুধু তাই নয়। এ পর্বের বড় বৈশিষ্ট্য হল, প্রতীচ্য জীবন সাধনাকে উপেক্ষা করে প্রাচ্য জীবনাদর্শের গরিমা প্রচার। পূর্বেই বলা হয়েছে, নানা কারণে ইংরেজের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর আকর্ষণ ক্রমে বিলুপ্ত হচ্ছিলো। পাশ্চাত্য প্রীতি বিসর্জন

দিয়ে ভারতীয় জীবনাদর্শের স্বরূপ যাতে জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারেন, নাট্যকারগণ সচেতন ভাবে সে বিষয়ে আগ্রহী হলেন। বর্তমানের মতো বিরাট রাজনৈতিক জনসমাবেশ তখন আমাদের দেশে অজানা ছিলো এবং একসঙ্গে প্রচুর লোক সমাগম সম্ভবত নাট্যশালা ব্যতীত অন্যত্র দুর্লভ ছিলো। তাই রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠলো প্রচারের প্ল্যাটফর্ম। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের সংস্কার প্রয়াসী ধর্মান্দোলন যা অনেকাংশে প্রতীচ্যধর্মী—তার তীব্রতা হারালো। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরা 'ব্রেহ্মজ্ঞানী' বলে ধিকৃত হতে লাগলেন আরো বেশি—নাটকে তাঁদের মলিন চিত্র অঙ্কিত হতে লাগলো। এ যুগ, অবশ্যই সীমাবদ্ধ অর্থে, Hindu Revivalism-য়ের যুগ। একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিনিষ্ঠ—যদিও তা পাশ্চাত্ত্য চিন্তাবিদদের মতাশ্রয়ী-আলোচনা, অপর দিকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহজ সরল ও অনেকাংশে লোকজীবনাশ্রয়ী ভক্তিবাদ বাঙালীকে নবভাব প্রবাহের পথে পরিচালিত করলো। এবং এটি ঐতিহাসিক সত্য যে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রামকৃষ্ণদেব বঙ্গরঙ্গমঞ্চকে অনেক বেশি প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী নাট্যকৃত হয়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হয়েছে বটে, কিন্তু তা শুধু তাঁর রচনার গল্পরসের আকর্ষণে। বঙ্কিম প্রদর্শিত জীবনাদর্শ, তত্ত্বচিন্তা বা তাঁর উপন্যাসের ট্র্যাজিক প্যাটার্ণ দ্বারা নাট্যকারগণ বিশেষ প্রভাবিত হন নি। অথচ সেই ট্র্যাজিক প্যাটার্ণ যে কখনো কখনো শেকসপীয়রের অনুরূপ সমুন্নতিলাভ করেছিলো, নাট্যকারেরা সে সম্পর্কে ছিলেন অধিকাংশ সময়েই উদাসীন। বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত মতবাদ প্রতীচ্যগন্ধী বলেই নাট্যকারদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছিলো কি না, তাও সন্দেহের বিষয়। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব প্রদর্শিত সহজ সরল ভক্তিরস জাতীয় জীবনের সর্বাংশকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়ে উঠলো। ফলে, এক নতুন জীবনবোধ জনসাধারণকে উদ্বেলিত করলো এবং নাট্যকারগণ বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয় এই জীবনবোধকেই উদ্ভাসিত করে তুললেন। প্রখর বাস্তব বুদ্ধিসমন্বিত রামকৃষ্ণদেবও নাটকের মাধ্যমে এই ভক্তিরসাশ্রিত জীবনবোধের প্রচার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের মঞ্চের সংস্রব ত্যাগের বাসনাকে বাধা দিয়ে তিনি বলেছিলেন—"ওতে লোকশিক্ষা হবে।" 'লোকশিক্ষা' শব্দটিকে অত্যন্ত সচেতনভাবেই তিনি ব্যবহার করেছিলেন।

নয়

অতএব দেখা গেল, এই পর্বের নাট্যকারদের জীবন সম্পর্কিত মূল্যবোধ দুটি প্রধান বিষয়—দেশপ্রেম ও ভক্তিরস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মূলত এই মূল্যবোধ দ্বারা চালিত হয়ে এ পর্বে যে সকল নাটক রচিত হলো, তাদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে আমরা প্রধানত নিম্নলিখিত শ্রেণীগুলো লক্ষ্য করি :

এক, পৌরাণিক নাটক: এই শ্রেণীর নাটক রচনার সূত্রপাত যদিও পূর্ববর্তী পর্বে, মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক নাটক' রচনার মাধ্যমে, কিন্তু তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিলো এই পর্বে প্রধানতঃ গিরিশচন্দ্রের লেখনী স্পর্শে। এই ধারার শ্রেষ্ঠ নাট্যকারও অবিসংবাদিত ভাবে গিরিশচন্দ্র। পুরাণ ও মহাকাব্য অবলম্বন করে নাটক রচনার উদাহরণ সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', 'উত্তররচরিত' বা 'বেণীসংহার' অর্থাৎ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের উজ্জ্বলতম রত্নরাজির একটি বড়ো অংশ পুরাণ ও মহাকাব্যাশ্রিত। কিন্তু সেখানে কালিদাস, ভবভূতি বা ভট্টনারায়ণ পুরাণের আশ্রয়ে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচারে ব্যস্ত হন নি। সেখানে যদি কোনো ধর্ম প্রকাশিত হয়ে থাকে, তবে তা জীবনধর্ম—বিশেষত প্রেমধর্ম। পুরাণ আশ্রয় করে মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা' রচনা করলেন, তারও মুখ্য অবলম্বন জীবননিষ্ঠ প্রেম। শুধু তার সঙ্গে যুক্ত হলো নবজাগৃতি যুগের মানবতাবোধ, নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি ও স্বাধীন চিত্তবৃত্তির অকুণ্ঠ উল্লাস। কাজেই তাঁর নাটক পুরাণ আশ্রিত হলেও 'পৌরাণিক' হতে সক্ষম হলো না। কিন্তু আলোচ্য পর্বের পুরাণাশ্রিত নাটকগুলোতে যে প্রেম ব্যক্ত হলো তা ঈশ্বর প্রেম, নরনারীর মিলন বিরহ সেই প্রেমেরই বিচিত্র প্রকাশ মাত্র। রামায়ণ মহাভারতের প্রচলিত কাহিনীগুলো মূলত ভক্তিরসে জারিত হয়ে নাট্যরূপায়িত হলো। অর্থাৎ দেশীয় যাত্রার মূল সুর—মনোমোহন বসু যার বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ ছিলেন, অনেকাংশে আধুনিকীকৃত হয়ে বাঙলা নাটকের সঙ্গে একাত্মীভূত হলো। শুধু যে পুরাণ ও মহাকাব্যের কাহিনী নিয়েই পৌরাণিক নাটক রচিত হলো তাই নয়, ভারতবর্ষের ধর্মজগতের মহাপুরুষদের জীবন-কাহিনী অবলম্বন করেও গিরিশচন্দ্র এই শ্রেণীর নাটক রচনা করলেন। সে মহাপুরুষগণও, সমালোচকদের মতে, রামকৃষ্ণদেবের আদর্শে রূপায়িত হলেন। এই উভয় ধরণের পৌরাণিক নাটকের জনপ্রিয়তার কাছে ভিন্ন স্বাদের কোনো পৌরাণিক নাটক প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয় নি। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন তাঁর 'পাষাণী' নাটকে পৌরাণিক ভক্তিরসের পরিবর্তে খানিক যুক্তির অনুপ্রবেশ ঘটাতে সচেষ্ট হলেন, তা তদানীন্তন দর্শকবৃন্দ বিশেষ উৎফুল্ল হয়ে গ্রহণ করেন নি। ক্ষীরোদপ্রসাদকেও 'নরনারায়ণ' নাটকের মধ্যে প্রবল যুক্তিবাদ ও আধুনিক জটিল মানসিকতার অবতারণা করেও শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ভক্তিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে।

দশ

দুই, ঐতিহাসিক নাটক: মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' এ শ্রেণীর প্রথম নাটক এবং তা পূর্বতন পর্বের অন্তর্গত। 'কৃষ্ণকুমারী' সম্পর্কে পূর্বেই সামান্য বলা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পর্বে যেসকল ঐতিহাসিক নাটক রচিত হলো তার প্রকৃতি 'কৃষ্ণ-কুমারী' থেকে পৃথক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' রচনার মাধ্যমে এ

ধারার সূত্রপাত এবং তা সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলোতে। মধুসূদন যেখানে ইতিহাস তথা রাজনীতির জটিল আবর্তে চিরন্তন মানবহৃদয়ের অন্তহীন আর্তি প্রকাশ করেছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেখানে প্রবর্তন করলেন ঐতিহাসিক কাহিনীর মাধ্যমে দেশপ্রেম প্রচার। মধুসূদনের নাটকে দেশপ্রেম অলক্ষ্য ছিলো না, কিন্তু তা কখনোই স্বয়ং প্রধান হয়ে ঐতিহাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্যকে গ্রাস করে বসে নি। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বঙ্গ সাহিত্যে একদা ঐতিহাসিক নাটক ও সাম্প্রতিক কালে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রাদুর্ভাবে অভিধাটি অত্যন্ত পরিচিত। কিন্তু ইতিহাসের যে কোনো ঘটনা অবলম্বন করে লিখলেই ঐতিহাসিক নাটক কিংবা উপন্যাস হয় না। প্রত্যেক যুগের মধ্যেই নিহিত থাকে তার নিজস্ব সংকট। কেবলমাত্র অতীতকালের সংকটগুলো নানা তথ্য ও তত্ত্বের উন্মোচনে যতটা বুদ্ধিগ্রাহ্য মনে হয় সমসাময়িক সংকট ততটা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নাও হতে পারে। অবশ্য অত্যন্ত ধীশক্তিসম্পন্ন ও দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী কোনো মনীষীর মানসচক্ষে হয়তো তা প্রত্যক্ষবৎ হওয়া সম্ভব। প্রতিটি যুগের স্থিতির মধ্যে আছে প্রতিস্থিতির বীজ এবং উভয়ের দ্বন্দ্ব ও আলোড়নে উদ্ভূত হয় নতুনতর সংস্থিতি। স্থিতি প্রতিস্থিতির এই টানাপোড়েন সর্বদাই অলক্ষ্যে চলছে, বিপুল ঘটনাবর্ত তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অমাবস্যার রাতে নদীর নিকষকালো জলপ্রবাহের দুরন্তবেগ প্রত্যক্ষীভূত হয় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ফেনপুঞ্জের সমারোহে, অদৃশ্য নিরন্তর বেগবান কালপ্রবাহে ঘটনারাশি ফেনপুঞ্জ মাত্র। স্থিতি প্রতিস্থিতির আলোড়নের পর্যায় পেরিয়ে যখন আসে নতুনতর সংস্থিতি, সে সময়টিকেই ক্রান্তিকাল বলে গ্রহণ করা চলে। ঐতিহাসিক নাটক, বা উপন্যাস, যিনি লিখবেন, তাঁর পক্ষে বিধেয় হবে তাঁর অবলম্বিত যুগের অন্তর্নিহিত এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ অনুধাবন ও উদ্ঘাটন করা। সাধারণত বৃহৎ ব্যক্তিত্বের আশ্রয়েই এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"পৃথিবীতে অল্প সংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় যাঁহাদের সুখ দুঃখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত বদ্ধ। রাজ্যের উত্থানপতন মহাকালের সুদূর কার্যপরম্পরা, যে সমুদ্র গর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে সেই মহান কলসংগীতের সুরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে।"[২০] তিনি আরো বলেছেন—"এই যে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে কালের গতি ইহা আমাদের প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ গোচর নহে। যদি বা তেমন কোনো জাতীয় ইতিহাস-স্রষ্টা মহাপুরুষ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকেন তথাপি কোনো খণ্ড ক্ষুদ্র বর্তমান কালে তিনি এবং সেই বৃহৎ ইতিহাস একসঙ্গে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না।"[২১] সেই বৃহৎ ব্যক্তিত্বেরা প্রতিভাশালী হলেও তাঁরা যুগের প্রয়োজনে ইতিহাসের সৃষ্টি। ইতিহাস ও ব্যক্তির এ সম্পর্ক সর্বদাই বর্তমান, ক্রান্তিকালে তা উজ্জ্বলতর হয় মাত্র।

ঐতিহাসিক নাটক বা উপন্যাস রচয়িতার পক্ষে এই কালসচেতনতা ও দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমেই ইতিহাসের আপাতঃ অসংলগ্ন ঘটনাপুঞ্জ অসীম তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মিলন ঘটায়। অর্থাৎ ইতিহাস তখন আর প্রাচীন নীরস ঘটনাপুঞ্জ হয়ে থাকে না, তা নিত্যবর্তমানে পরিণত হয়। ফলে, যে কোনো যুগের দর্শক বা পাঠক তার মধ্যে চিরন্তনতা উপভোগে সক্ষম হয়। কোনো লেখক যদি ঐতিহাসিক নাটক বা উপন্যাস রচনাকালে এই সহজসত্য বিস্মৃত হন বা উপেক্ষা করেন, তবে তাঁর রচনা সার্থক হলেও তাকে অন্ততঃ 'ঐতিহাসিক' অভিধায় অভিহিত করা চলে না। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত উপন্যাস 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' বা 'কালের মন্দিরা' রচনা হিসেবে যতই সুখপাঠ্য হোক না কেন, তা ইতিহাস-আশ্রিত রোমান্স মাত্র, ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। বরং রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'য় কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র না থাকা সত্ত্বেও তা অনেক বেশি ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। ঐতিহাসিক নাটক প্রসঙ্গেও একই কথা বলা চলে।

এই পর্বে ইতিহাস অবলম্বনে রচিত নাটকগুলোকে এই অর্থে, অনুরূপ কারণেই, ঐতিহাসিক নাটক রূপে অভিহিত করা চলে না। ইতিহাসের ঘটনা অবলম্বনে নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ প্রচারই এই নাটক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো। এ প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর নাট্যরচনার যিনি সূত্রপাত করেন তাঁর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলছেন— "হিন্দুমেলার পর হইতেই কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরব-কাহিনী কীর্তন হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"২২ এই উদ্দেশ্যে অতীত ভারতের বিশেষতঃ চিতোরের রাজপুত বীরত্বকাহিনী অবলম্বনে প্রচুর নাটক রচিত ও অভিনীত হতে লাগলো। নাট্যকারদের এরূপ প্রবণতা এত বর্ধিত হয়েছিলো যে অমৃতলাল বসু তাঁর 'তিলতর্পণ' নাটকে এ নিয়ে বেশ খানিকটা ব্যঙ্গ করেছিলেন। যাই হোক, এশ্রেণীর রচনাকে 'ঐতিহাসিক নাটক' না বলে "জাতীয় ভাবাত্মক রোম্যান্টিক' ২৩ নাটক "অভিধায়" অভিহিত করা হয়েছে তা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। প্রসিদ্ধ সমালোচক ডাঃ আশুতোষ ভট্টচার্য এ প্রসঙ্গে যথার্থ মন্তব্য করেছেন—"প্রাচীন ঐতিহাসিক বিষয় বস্তু নাট্যকারের সমসাময়িক একটি বিশিষ্টভাবের বাহন করিবার ফলে নাটকের ঐতিহাসিকত্ব যেমন বিনষ্ট হইল, তেমনি ইহাদের মধ্যে একটি অখণ্ড রস নিবিড় হইয়া উঠিতে পারিল না।...তদুপরি ঘটনাসমূহ ইতিহাসের পথে অগ্রসর হইতে বাধা পায়।...এই শ্রেণীর নাটক ঐতিহাসিক হইতে পারে না; যাহা হয়, তাহার রোম্যান্টিক নাটক বলিয়া পরিচয় নেওয়া যাইতে পারে।"২৪ তখনকার শিক্ষিত বাঙালীর দেশপ্রেম অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসপ্রবণ ও আবেগভিত্তিক

ছিলো। তাঁদের আদর্শ ছিলো উচ্চ কিন্তু সেই আদর্শকে বাস্তব ও ফলপ্রসূ করে তোলার মতো বিশেষ কোনো কর্মসূচী ছিলো না। এবং সর্বাপেক্ষা বড়ো কথা, সর্বাত্মক স্বাধীনতা ঘোষণা করার কল্পনা তাঁদের আদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। ফলে তখনকার নাটকে কেবলমাত্র উচ্চ আদর্শসম্পন্ন ভাবই প্রকাশিত হয়েছে এবং তা বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন হয়ে উচ্ছ্বাসময় রোমান্স রূপ লাভ করেছে। জ্যোতিরিন্দ্র নাথে এই শ্রেণীর নাটকরচনার সূত্রপাত, কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় নাট্যকারদের প্রচেষ্টায় বিশেষত দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় তা আরো ব্যাপ্তিলাভ করেছিলো।

এগার

তিন: সমাজ সমস্যামূলক নাটককে বিষয়বস্তু ও প্রবণতা অনুযায়ী দুভাগে বিভক্ত করা চলে। নাট্যকার যেখানে সমাজ জীবনের গভীর ও জটিল রূপ অঙ্কনে আগ্রহী, তাকে সামাজিক নাটক বলা চলে। আবার যখন সমাজের অন্তর্নিহিত ত্রুটি ও অতিচার নাট্যকারের ব্যঙ্গ বিদ্রূপকে উদ্বোধিত করে তুলেছে, নাটক তখন প্রহসনে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। জীবনদৃষ্টি ও প্রবণতা অনুযায়ী রচনা এ উভয় কোটির কোনো একটিকে বরণ কবে নিতে পারে। পণপ্রথা অবলম্বনে গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটক সম্পর্কে অমৃতলাল বসু বলেছিলেন—"মশায়, এমন powerful নাটক লেখা আপনার দ্বারাই সম্ভব। Marriage problem নিয়ে আমি একটা farce করেছি, আপনি তা নিয়ে এত বড় একটা Tragedy করলেন।"[২৫] অর্থাৎ পণপ্রথা নামক সমাজ সমস্যাটি গিরিশচন্দ্রেব জীবনদৃষ্টিকে একটি ট্র্যাজেডি লিখতে উদ্বোধিত কবেছিলো, কিন্তু অমৃতলালেব প্রবণতা তাঁকে তা দিয়ে একটি প্রহসন লিখিয়ে নিয়েছিলে। যাই হোক পূর্বেই বলা হয়েছে, উনবিংশ শতাব্দীব নবজাগৃতির ফলে বাঙালীর কর্মপ্রচেষ্টা প্রকাশিত হয়েছিলো প্রধানত: সমাজ আন্দোলনেব ক্ষেত্রে, তাই সমাজ সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে নাট্যকাবগণ প্রথম থেকেই নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম পর্বে যেমন তাঁদের প্রচেষ্টা ছিলো প্রধানত: প্রগতিমূলক, দ্বিতীয় পর্বে তা অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছিলো। স্ত্রী জাতির প্রতি সমাজেব উৎপীড়ন পূর্বের মতোই হয়তো নাট্যকারদের বিচলিত করেছে, কিন্তু স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রী শিক্ষা অধিকাংশ সময়েই দ্বিতীয় পবের নাট্যকারদের দ্বারা ব্যঙ্গ বিদ্ধ হয়েছে। পণপ্রথা, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি বিষয় নাট্যকারদেব যেমন আকৃষ্ট করেছে, আবাব বিলাসিনী কারফরমা বা মিসেস পাকরাশীর মতো চরিত্র চিত্রণেও তাঁরা ব্যস্ত হয়েছেন। তাঁরা সম্ভবত লক্ষ্য করেন নি যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া সমাজে স্ত্রী জাতি তাঁদের প্রাপ্য সম্মান ততটা পেতে পারেন না এবং শিক্ষা সেই স্বাধীনতা অর্জনের সোপান মাত্র। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অধিকার এমনিতেই থাকে

অবগুণ্ঠিত, তাই তাকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা আরো দুরূহ। কিন্তু ভারতীয় নারীত্বের সুমহান আদর্শ প্রচারে ব্যস্ত থেকে নাট্যকারগণ সম্ভবত এই বিষয়টি অবহেলা করেছিলেন যে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় সেই প্রাচীন আদর্শ কতটা বাস্তব ও ফলপ্রসূ হতে পারে। কেননা আদর্শও যুগ ও কাল পরিবেশে পরিবর্তিত হয়। এই পর্বের স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ প্রহসন রচয়িতা অমৃতলালের নাটক বিশ্লেষণ করে আমরা উপরোক্ত উক্তির সত্যতা বিচার করতে পারি।[২৬] তাছাড়া এই শ্রেণীর নাটকের অন্তর্গত ছিলো 'সামাজিক পঞ্চরং'। সাধারণ রঙ্গালয় প্রবর্তন হবার ফলে যে বিপুল দর্শক সৃষ্টি হয়েছিলো, তাদের শিল্পরুচি খুব একটা উন্নত ছিলো না। প্রগতিমূলক কল্যাণকর্মের গভীরতা ও সার্থকতা তাঁদের কাছে বিশেষ উপলব্ধ সত্যরূপে প্রতিভাত হয় নি। সাধারণ দর্শকদের মধ্যে অনেকে, তখন কেন, এখনো বর্তমানের নারীপ্রগতি নিয়ে নানা উপহাস ও অরুচিকর মন্তব্য করে থাকে। তাই সেকালীন নাট্যকারগণ এই শ্রেণীর দর্শককে তৃপ্ত করার মানসেও ঐরূপ প্রহসন লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

সমাজ সমস্যা নিয়ে যে সকল সিরিয়স নাটক লেখা হয়েছে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতি ও প্রচার লাভ করেছিলো গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল'। স্বর্ণলতার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে গিরিশচন্দ্র 'প্রফুল্ল' রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। তাই 'প্রফুল্ল' নাটকটির প্রবণতা বিশ্লেষণ করে এই শ্রেণীর নাটক রচনার উদ্দেশ্য বিচার করা যেতে পারে। প্রফুল্ল নাটকের মূল বক্তব্য একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙ্গন ও তার জন্য নাট্যকারের অপরিসীম ব্যথাবোধ। ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায়—"উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার যৌথ পরিবারের ভিত্তি শিথিল হইয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলো। তাহার পরিচয়টিই যে 'প্রফুল্ল' নাটকে মূলত বিবৃত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়।...নব প্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবিকা উপার্জনের সূচনা হইতেই আধুনিক বাঙলার যৌথ পরিবারগুলির বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছিলো—'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্য দিয়া সেই বিষয়টিই সার্থকভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।"[২৭] ডাঃ ভট্টাচার্যের এ অভিমত সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া যায় না কেননা গিরিশচন্দ্র বাঙলাদেশের এই জ্বলন্ত সমস্যাটির অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশেষ অনুধাবন করতে সক্ষম হন নি, তাই তাঁর নাটকটি ব্যক্তিগত বিয়োগ ব্যথার সমারোহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকায় স্থাপিত হয়ে সার্বজনীন রূপলাভে সমর্থ হয় নি। অর্থাৎ এই নাটকটি যতটা পারিবারিক, ততটা সামাজিক হয়ে ওঠে নি। সামাজিক সমস্যা কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা পরিবারকে আশ্রয় করে বিকশিত হয় বটে, কিন্তু নাট্যকার যদি তাতে উপযুক্ত উর্দ্ধায়ন না ঘটাতে পারেন, তবে তাকে সামাজিক নাটক

বলা চলে কিনা সন্দেহ। 'প্রফুল্ল' এবং তৎকালীন সমাজ-সমস্যামূলক নাটকে এ ত্রুটি অলক্ষ্য নয়।

বারো

চার, রোমান্সমূলক নাটক: নরনারীর হৃদয়গত সম্পর্ক অর্থাৎ প্রেম এই শ্রেণীর নাটকের বিষয়বস্তু। এ শ্রেণীর নাটকের কাহিনী নাট্যকারের স্বকপোল কল্পিত। দীনবন্ধু মিত্রের রচনায় এ শ্রেণীর নাট্যরচনার সূত্রপাত হয়েছিলো, গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের এই ধারাটি অনুসরণ করে নিজেও কয়েকখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেছিলেন। ডা: আশুতোষ ভট্টাচার্য এ শ্রেণীর নাটককে 'রোম্যান্টিক' অভিধায় অভিহিত করেছেন ও তাদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যেতে পারে। পাশ্চাত্ত্য, বিশেষত: এলিজাবেথীয় যুগের, রোমান্টিক নাটকে নরনারীর মধ্যে হৃদয়গত সম্পর্ক—তার সমস্ত আবেগ, আসক্তি ও উত্তাপসহ প্রকাশিত হয়েছে, তার বাস্তব ভিত্তি ছিলো। নরনারীর মুক্ত প্রেম পাশ্চাত্ত্য সমাজে সম্ভব কেন না তাদের সমাজ নারীকে সেই স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু উনিশ শতকীয় বাঙালী সমাজব্যবস্থা নরনারীর সম্পর্ককে সেরূপ সহজ বিচরণের ক্ষেত্র তৈরী করে দেয় নি। তাই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে যা একান্ত স্বাভাবিক, আমাদের সাহিত্যে তা অত্যন্ত কাল্পনিক ও অবাস্তব রূপে দেখা দিয়েছে। তাই এ শ্রেণীর নাটকগুলো অধিকাংশই কৃত্রিম ও উৎকেন্দ্রিক হয়েছে। দীনবন্ধুর এই শ্রেণীর নাটক সমালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখেছিলেন[২৮] তা রোম্যান্সমূলক প্রায় সকল নাটকে প্রয়োগ করা চলে।

এ মন্তব্যের যুক্তিযুক্ততা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে রোম্যান্সমূলক গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য গুলো বিশ্লেষণ করলে। আবু হোসেন, আলিবাবা, শিরি ফরহাদ ও হিন্দা হাফেজ সম্ভবত এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতি অর্জন করেছিলো। এ নাটকগুলোর বিষয়বস্তুর উৎস উপকথা এবং তাদের মধ্যে যে উৎকেন্দ্রিকতা ও তরল রঙ্গরস পরিবেষিত হয়েছে তাতে প্রেমের সৌন্দর্য ও মাধুর্য অনুপস্থিত। প্রেমের হাস্যময় হৃদয়নন্দন চিত্র নাটকে অবলম্বিত হতে পারে বটে, কিন্তু এরূপ স্থূল অগভীর ও অবাস্তব হলে তা অভিনন্দনযোগ্য হয় না।

পাঁচ, গীতি ও নৃত্যনাট্য: এ শ্রেণীর নাটকে প্রেম থেকে সুরু করে সামাজিক জীবনের সাময়িক ও অতি সাধারণ বিষয়ও অবলম্বিত হয়েছে। প্রেমবিষয়ক গীতি ও নৃত্যনাট্যে, পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রেমের গভীরতা ও সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ ভাবানুভূতি প্রায়শই অনুপস্থিত। চটুল অবাস্তব ও কখনো কখনো অর্থহীন নাচ গানের মধ্য দিয়ে লোকরঞ্জনের প্রচেষ্টা হয়েছে মাত্র। তাছাড়া 'ভোট মঙ্গল', 'বড়দিনের বকশিস' প্রভৃতি সাময়িক ও সাধারণ বিষয়বস্তু নিয়েও এ

শ্রেণীর নাটক রচিত হয়েছে। নৃত্য ও গীত বলতে যে সূক্ষ্ম ও গভীর ভাবদ্যোতক শিল্পকর্ম বোঝায়—এই শ্রেণীর নাটকে তার পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। অবশ্য এ ধরনের নাট্য রচনার প্রয়োজনীয়তা ছিলো। পরবর্তী অধ্যায়ে তা আলোচিত হবে।

উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর নাটক ছাড়াও আরো কিছু স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত নাটক বাঙলা নাট্যসাহিত্যের তালিকায় দেখা যায়। 'জমিদার দর্পণ', 'চাকর দর্পণ', বা 'কেরানী চরিত' ইত্যাদি নাটকের সাহিত্য মূল্য যাই হোক না কেন তা প্রচলিত নাট্যধারার অনুগামী নয়। কিন্তু এ জাতীয় নাট্যপ্রয়াস ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং সেগুলো কখনোই একটি বিশেষ শ্রেণী সৃজনে সক্ষম হয় নি। তবু তাদের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

তেরো

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ—এই চল্লিশ বছরের নাট্য রচনার বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। পূর্বেই বলা হয়েছে, বাঙলা নাট্যসাহিত্যের যে সকল রচনা নিয়ে সচরাচর গর্ব করা হয়, তার প্রায় পুরোটাই রচিত হয়েছে এই পর্বে এবং এ পর্বের নাট্যকারগণ নাটকের যে শ্রেণীবিন্যাস করে দিয়েছিলেন তা অনুসৃত হয়েছে পরবর্তী পর্ব পর্যন্ত। বস্তুত: বাঙলা নাট্যসাহিত্যে যে প্রথানুগত্যের পালা সুরু হয়েছিলো. তা বিপর্যস্ত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন জাতীয় সংকট মুহূর্তে—ভারতীয় গণনাট্য সংঘ কর্তৃক 'নবান্ন' প্রযোজনার মাধ্যমে। কাজেই সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ এই দ্বিতীয় পর্বের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি :

এক : জাতীয় জীবনে কর্মোদ্দীপনার অভাব, তাই নাটকে ক্রিয়া ও দ্বন্দ্বের অভাব। উদ্দীপনা ছিলো মূলত মস্তিষ্ক সঞ্জাত, তাই নাট্যকারদের রচনায় যে ক্রিয়া ও দ্বন্দ্ব পরিবেষিত হয়েছে তা অধিকাংশ স্থলেই আরোপিত। অর্থাৎ তা নাট্যকারদের মাথা খাটিয়ে বার করা, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উদ্ভূত নয়। বাঙলা নাট্যসাহিত্যে যাঁর রচনায় সর্বাপেক্ষা বেশি দ্বন্দ্ব সমন্বিত বলে সমালোচকগণ স্বীকার করেন, সেই দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলো বিশ্লেষণ করলেই এ মন্তব্য যথার্থ বলে প্রমাণিত হবে। নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃজনে তিনি দূর অতীতের ঐতিহাসিক কাহিনীতে—অর্থাৎ যেখানে অতি সহজেই কল্পনার আধিপত্য দেখানো চলে—যতটা সার্থক হয়েছেন, সমসাময়িক সামাজিক জীবন অবলম্বিত নাটকে সেই দ্বন্দ্ব হয়েছে কুণ্ঠিত। এমন কি তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলোর দ্বন্দ্বও অনেকাংশে কৃত্রিম বলে মনে হয়। নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃজনে এই তারতম্য ও ব্যর্থতা অকারণ নয়, তা যুগপরিবেশের গভীরে নিহিত। তাই নাটকীয় দ্বন্দ্ব সম্পর্কে

দ্বিজেন্দ্রলালের ধারণা যতই স্বচ্ছ ও তাৎপর্যপূর্ণ হোক না কেন, নাটকে তার প্রয়োগে তিনি সর্বদা সক্ষম হন নি।

দুই: পূর্বের আলোচনায় লক্ষিত হয়েছে যে আমাদের জাতীয় জীবনে যত না ছিলো কর্মপ্রচেষ্টা, তার চাইতে বেশি ছিলো উচ্ছ্বাসের প্রবণতা। এই উচ্ছ্বাস প্রবণতা আধুনিক কালেরও অন্যতম জাতীয় লক্ষণ। জাতীয় জীবনের এই উচ্ছ্বাসের আধিক্য নাট্যসাহিত্যের আন্তর সত্তায় গভীর স্বাক্ষর রেখেছে। তাই বাঙলা নাটকে লক্ষিত হয় যুক্তি পরম্পরার অভাব। ফলে নাটকীয় কার্যকারণ (Cause and effect) প্রায়শই হয়েছে অবহেলিত। গিরিশচন্দ্রের নাটকে এই কার্যকারণের সমন্বয়হীনতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে পরে আরো বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

চোদ্দ

তৃতীয় পর্ব, পূর্বেই বলা হয়েছে, অতীতের পুচ্ছানুসারী। ইতস্ততঃ কিছু উচ্চ-মানের রচনার সাক্ষাৎ পেলেও সামগ্রিক ভাবে পেশাদার নাট্যরচনায় এমন কোনো বিশেষত্ব দেখা যায় না যাতে এ পর্বেরপ্রয়াসকে অভিনন্দিত করা চলে। ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। আলোচ্য পর্বে, তিনি বলেছেন,—"গল্প উপন্যাসের তুলনায় নাটকে লেখকেরা তেমন বৈচিত্র্য অথবা শক্তি দেখাইতে পারেন নাই।'[২৯] এ অবক্ষয়ের কারণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

এক: বিংশ শতাব্দীতে জাতীয় সমস্যা বলে বিশেষ কিছু রইলো না, তা আন্তর্জাতিক রূপলাভ করলো। বাঙলা নাট্যসাহিত্যের প্রেরণা মুখ্যতঃ ছিলো জাতীয়, এ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠলো না। ফলে নাট্যকারেরা বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে অতীতেই আবদ্ধ রইলেন।

দুই: এ পর্বের কালসীমার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের নিজস্ব সংকট স্পষ্ট হয়ে উঠলো—যার অভিব্যক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। কিন্তু সে সংকটের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক তাৎপর্য নাট্যকারেরা অনুধাবনে অক্ষম হলেন। তাই যে সকল সমস্যা আমাদের জীবনে ঘনীভূত হলো তার প্রকাশ নাট্যসাহিত্যে সম্ভব হলো না।

তিন: এ সময়েই বাঙালী মধ্যবিত্ত বা ভদ্রলোকের জীবনযাত্রার সংকট তীব্র হলো। জমির উপসত্বভোগ আর পূর্ব শতাব্দীর মতো চললো না। চাকরীর বাজারেও নতুন প্রতিযোগীর উদ্ভব হওয়ায় বাঙালী 'ভদ্রলোক' নিদারুণ অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হলেন। ফলে তার জীবনযাত্রায় দেখা দিলো সংকট, যা তার সংস্কৃতিতেও প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বাঙালী বুদ্ধিজীবী—এবং নাট্যকারেরা—বিশেষ সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না।

চার: রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব, কংগ্রেস যাকে প্রতিফলিত করছিলো,

বাঙলা থেকে অন্য প্রদেশে স্থানান্তরিত হলো। উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপী সারা ভারতবর্ষময় বাঙালীর ব্যাপক প্রভাব ও আধিপত্যের সীমা সঙ্কুচিত হলো। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব বাঙালীকে পুরোনো অধিকার থেকে বঞ্চিত করলো। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন ভারতব্যাপী আলোড়ন জাগিয়েছিলো, তা বাঙালীর মানসমর্মমূলে বিশেষ আবেদন জাগাতে পেরেছিলো কি না সন্দেহ বরং এইসময় সশস্ত্র যুব বিদ্রোহ বাঙালী চিত্তে আকর্ষণের সঞ্চার করেছিলো। কিন্তু এ যুব বিদ্রোহও ছিলো মূলত সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। এ সকল কারণে বাঙালীর জাতীয় জীবনে এমন কোনো বিশেষ মূল্যবোধ গড়ে ওঠে নি, যা নাট্যকারদের দ্বারা অবলম্বিত হতে পারে।

পাঁচ : এই পর্বের সময়সীমার মধ্যে অর্থাৎ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে সংঘটিত হয় প্রথম সাম্যবাদী বিপ্লব। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের চিন্তাজগতে রুশ বিপ্লব বিরাট আলোড়ন তুলেছিলো। কিন্তু বাঙালী বুদ্ধিজীবীগণ রুশ বিপ্লব সম্পর্কে কখনো ইংরেজের প্রচারে, কখনো বা সচেতন ভাবে—অজ্ঞতা ও উদাসীনতা দেখিয়েছিলেন। ফলে তাঁরা পৃথিবীর সর্বপ্রথম সর্বহারা বিপ্লবের তাৎপর্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। কাজেই, এ সূত্রে যে নতুন মূল্য বোধ গড়ে ওঠার সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিলো তা বাস্তবায়িত হলো না।

ছয় : এই পর্বে অভিনেতা ও প্রযোজকদের পারদর্শিতার সঙ্গে নাট্যকারদের প্রতিভার সুসমঞ্জস মেলবন্ধন ঘটে নি। পূর্ববর্তী পর্বে অধিকাংশ নাট্যকারই ছিলেন অভিনেতা। কিন্তু এ পর্বটিকে একান্তভাবে বলা যায় অভিনেতার যুগ। বাঙলা মঞ্চে এই প্রথম শিক্ষিত শ্রেণী থেকে এতগুলো অভিনেতা আত্মপ্রকাশ করলেন। অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রমুখ এবং সর্বোপরি শিশির কুমার ভাদুড়ীর আবির্ভাবে বাঙলা মঞ্চজগত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কিন্তু এ পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজক ও অভিনেতা যে নাটকগুলোকে ঐতিহাসিক কিংবদন্তীতে পরিণত করেছিলেন, তাঁর প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা নিয়েও বলতে হয়, তাদের সাহিত্য মূল্য প্রায় সবগুলোরই ছিলো অকিঞ্চিৎকর। তাঁর অভিনীত বিখ্যাত নাটক 'সীতা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য[৩০] তীব্র হলেও অযৌক্তিক নয়। আমেরিকা সফরে তাঁর শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে গতানুগতিক ও অবক্ষয়ী নাটকগুলোর প্রযোজনা প্রধানতঃ দায়ী। যেসকল নাটকের বিষয়বস্তু ও আবেদন অত্যন্ত পুরোনো, কৃত্রিম ও পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অক্ষম অনুকরণ, তার প্রদর্শনে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শককে শুধুমাত্র অভিনয়কলার মাধ্যমে প্রভাবিত করা সম্ভব নয়—এ সহজ সত্য তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন। সমকালীন 'নাচঘর' পত্রিকায় এ সম্পর্কে শিবরাম চক্রবর্তীর বিশদ আলোচনা[৩১] উল্লেখ করা চলে। বরং তিনি যদি কিছু সংস্কৃত নাটক ও রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক আমেরিকায় প্রযোজনা করতেন, তবে তা অনেক বেশি আকর্ষণীয় হতো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ শিশির কুমার ভাদুড়ী তাঁর

অভিনয় ক্ষমতায় এত বেশি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে নাটকের সাহিত্য মূল্য সম্পর্কে হয়ে পড়েছিলেন উদাসীন। তিনি একবার বলেছিলেন তিনি যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে 'বর্ণ-পরিচয়' পাঠ করেন তাহলেও জনসাধারণ তা ভিড় করে শুনবে। এই উক্তিতে দর্শকের ওপর তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব প্রমাণিত হয়। অথচ এই প্রত্যয় কোনো নাট্যকারের যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি ক্ষমতাকে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করে নি। মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রয়োগাচার্য ছিলেন স্তানিস্লাভস্কি। মুখ্যতঃ তাঁর প্রেরণা ও প্রয়োগনৈপুণ্যে উদ্বুদ্ধ হয়েই আন্তন চেকভ ও ম্যাক্সিম গোর্কী তাঁদের কালজয়ী নাট্যসম্ভার রচনা করেছিলেন। চেকভ তাঁর 'দ্য সী গাল' নাটকের প্রথম অভিনয়ের দুর্দশা দেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ভবিষ্যতে তিনি আর কখনো নাটক রচনা করবেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে স্তানিস্লাভস্কির অসাধারণ প্রয়োগনৈপুণ্যে ও দীপ্ত অভিনয় দর্শন করে সে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করেছিলেন এবং অন্ততঃ আরো এমন তিনখানি নাটক রচনা করেছিলেন যা বিশ্ব-সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। প্রধানতঃ চেকভের নির্দেশে ও স্তানিস্লাভস্কির অনুরোধেই গোর্কীর বিখ্যাত নাটকগুলো রচিত হয়। কাজেই সাহিত্য মূল্য সমন্বিত নাটক রচনায় অভিনেতা ও প্রযোজকের প্রভাব অপরিসীম। কিন্তু প্রয়োগাচার্য অসাধারণ অভিনেতা শিশিরকুমার এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন কিনা সন্দেহ। বরং পূর্ববর্তী পর্বে অভিনেতা—নাট্যকারের যে মেলবন্ধন রচিত হয়েছিলো, শিশিরকুমারের সময়ে তাও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পনেরো

বর্তমান প্রবন্ধে এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাটক আলোচিত হয় নি। প্রস্তাবিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের প্রায় সম্পূর্ণ কালপরিধি জুড়ে রবীন্দ্র নাট্যধারা বিধৃত। গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা'র মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের স্বীয় নাটকে আত্মপ্রকাশ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এবং তা বিস্তৃত হয়েছিলো নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা' 'শ্যামা'য় ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু রবীন্দ্র নাটককে কখনোই আমাদের প্রচলিত নাট্যধারা ও নাট্যান্দোলনের সঙ্গে সমশ্রেণীতে ফেলে আলোচনা করা চলে না। গিরিশচন্দ্র থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত নাট্যকারগণ সাধারণ রঙ্গালয়কে আশ্রয় করেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্র নাটক মাঝে মাঝে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হলেও তাঁকে কখনোই একই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। বিশেষতঃ রবীন্দ্র রচনার মধ্যে তুলনায় সর্বাপেক্ষা বেশি বার সাধারণ রঙ্গালয়ে উপস্থাপিত হয়েছে প্রহসনগুলো অর্থাৎ জনরুচির কাছে যাদের আবেদন ছিলো অপেক্ষাকৃত সহজ এবং তার মধ্যেও একমাত্র 'চিরকুমার সভা' দর্শক দ্বারা গৃহীত হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা, তাঁর সাংকেতিক নাটক-গুলো, কখনোই বাঙলার সমকালীন সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হতে দেখি না, যদিও বিশ্বে এ শ্রেণীর নাটক রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ বলে পরিগণিত হয়েছে এবং এদের মধ্যে কয়েকটি অনূদিত হয়ে ইউরোপে প্রযোজনার মাধ্যমে সেকালে বিপুল

খ্যাতি অর্জন করেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ সৌখিন বা অপেশাদার মঞ্চের আশ্রয়েই নাট্যান্দোলন করতে বাধ্য হয়েছিলেন—অবশ্য অন্যান্য সৌখিন নাট্যদলের সঙ্গে তাঁর সম্প্রদায়ের ছিলো গুণগত প্রভেদ—যদিও বিষয়টি তাঁর কাছে নিতান্ত সৌখিন ছিলো না। তাই প্রচলিত পেশাদার বা সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যধারার সঙ্গে রসপ্রতীতি ও রচনারীতির দিক দিয়ে তাঁর নাটক কোনক্রমেই মেলে না। রবীন্দ্র নাট্যধারার শ্রেণীবিভাগ করলেই আমাদের এ বক্তব্য আরো স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্র নাট্যধারাকে প্রধানত নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—

এক, গীতি ও নৃত্যনাট্য : এ শ্রেণীর রবীন্দ্র নাটকে শিল্পের অম্বিষ্ট, জীবন প্রীতি, সহজ সৌন্দর্য, গভীর কাব্যরস অপূর্ব গীতিসুষমার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। আবার কখনো—যেমন 'চণ্ডালিকা'য় প্রাণহীন প্রথার বিরুদ্ধে সুগভীর ধিক্কার অভূতপূর্ব বাণীরূপ লাভ করেছে। এ শ্রেণীর নাট্যজগতের সঙ্গে 'আবুহোসেন' বা 'আলিবাবা'র দুনিয়ার দূরত্ব গুণগত।

দুই, রোম্যান্টিক কাব্যনাট্য : এ শ্রেণীর নাটকে কখনো ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব (রাজা ও রাণী), কখনো প্রচলিত ধর্ম অপেক্ষা চিরন্তন মানবধর্ম (বিসর্জন), আবার কখনো অত্যাশ্চর্য প্রেমভাবনা (চিত্রাঙ্গদা) ব্যক্ত হয়েছে। সাধারণ রঙ্গালয়ে এ শ্রেণীর নাটক লক্ষিত হয় না।

তিন, গদ্যনাটক : একে আবার দুভাগে বিভক্ত করা চলে। একদিকে গৃহ-প্রবেশ, বাঁশরী প্রভৃতি তথাকথিত সামাজিক নাটক যার সঙ্গে রুচি ও মেজাজের দিক দিয়ে প্রফুল্ল বা বঙ্গনারীর কোন তুলনাই চলে না। অন্যদিকে প্রায়শ্চিত্ত, পরিত্রাণ, তপতী—যাদের মূলত রোমান্টিক নাটক বলা যেতে পারে। সাধারণ রঙ্গলয়ের এ শ্রেণীর নাটকের সঙ্গে এদের প্রভেদ প্রচুর।

চার, প্রহসন : এ শ্রেণীর সাধারণ লক্ষণ পেশাদার রঙ্গালয়ের প্রহসনগুলোর সঙ্গে সামান্য মেলে কিন্তু তাও বহিরঙ্গে। কেননা সাধারণ রঙ্গালয়াশ্রিত প্রহসন প্রধানত স্যাটায়ার, আর রবীন্দ্র প্রহসনে পরিস্থিতিগত হাস্যরস ও উইটের আধিপত্য, কখনো তা আবার হিউমারের লক্ষণাক্রান্ত—যেমন বৈকুণ্ঠের খাতা। তবু এদের সঙ্গে প্রচলিত প্রহসনের আপাত মিলের জন্যই সম্ভবত চিরকুমার সভা বা শেষরক্ষা কখনো কখনো সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনন্দিত হয়েছিল।

পাঁচ, সাংকেতিক নাটক : রবীন্দ্র নাট্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল বলা যায় এ শ্রেণীর নাটককে। সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকারগণ কখনোই এ ধরণের নাটক রচনা করেন নি। প্রধানত এ শ্রেণীর নাটক রচনার মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ বাঙলা নাট্যসাহিত্যকে সমকালীন আন্তর্জাতিক নাট্যান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সেকালে সাধারণ বঙ্গরঙ্গমঞ্চে এ নাটক কখনোই অভিনীত হতে পারে নি। একবার মাত্র 'নাচঘর' পত্রিকায়[৩২] উল্লেখ দেখা যায় যে শিশিরকুমার

ভাদুড়ী নাকি 'রক্তকরবী' প্রযোজনার অনুমতি পেয়েছেন। কিন্তু তা কখনো ফলপ্রসূ হতে দেখি না। আমাদের আলোচ্য পর্বের নাট্যসাহিত্যে সমকালীন বিশ্বসংকট ও আত্মিক সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'সাংকেতিক' নাটকে, একথা অক্লেশে বলা যায়। এ শ্রেণীর নাটকের সুরু ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে 'শারদোৎসব' রচনার মাধ্যমে এবং বিস্তৃত ১৯৩৩ পর্যন্ত 'তাসের দেশ' অভিযান সমাপ্ত করে। রবীন্দ্রনাথের এ নাটকগুলো যদি না রচিত হতো তাহলে আমাদের প্রস্তাবিত তৃতীয় পর্বকে (১৯১২-১৯৪২) নির্দ্বিধায় সর্বাপেক্ষা বন্ধ্যা পর্ব বলে অভিহিত করা চলতো। রবীন্দ্র নাথের সাংকেতিক নাটক বাঙলা নাট্যসাহিত্যের সে অপবাদ শুধু দূর করে নি, তাকে অপূর্ব মহিমায় ভাস্বর করে তুলেছে। সমকালীন অনেক সমালোচক এ শ্রেণীর রচনাগুলোকে নাটক বলতে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের প্রধান আপত্তি এদের অভিনয় যোগ্যতার অভাব নিয়ে। কিন্তু সম্প্রতিকালে বহুরূপী লিটল্ থিয়েটার বা রূপকার সম্প্রদায়ের এদের কয়েকটির সার্থক প্রযোজনা এ অভিযোগ নিঃসন্দেহে খণ্ডন করেছে।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেল সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রচলিত নাট্যাদর্শ থেকে রবীন্দ্রনাট্যাদর্শ প্রায় সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। সাধারণ রঙ্গালয়ে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় তথাকথিত পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক রবীন্দ্রনাথ একখানিও রচনা করেননি এবং অন্যান্য যা রচনা করেছিলেন তা স্বাদে ও মেজাজে, জীবনাদর্শে ও রচনারীতিতে একেবারেই বিপরীত কোটির। তাই রবীন্দ্রনাট্যধারা আলোচনার জন্য প্রয়োজন পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বতন্ত্র পদ্ধতি।

১ R. C. Majumder : British Paramountcy and Indian Renaissance Part II (Baratiya Vidya Bhavan) 1965. P 337-380)
২ R. C. Majumdar : Op. Cit. P. 342
৩ R. C. Majumdar : Op. Cit. P. 345
৪ R. C. Majumdar : Op. Cit. P. 350
৫ R. C. Majumdar : Op. Cit. P. 350
৬ R. C. Majumdar : Op. Cit P. 373
৭ R. C. Majumdar : Op. Cit. P. 375
৮ বিপিন বিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ (বিদ্যাভারতী ১৩৭৩) পৃঃ ২৯৮
৯ যোগেশচন্দ্র বাগল : হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত (মৈত্রী ১৯৬৮) পৃঃ ৫
১০ তদেব : পৃঃ ২
১১ তদেব : পৃঃ ৩
১২ তদেব : পৃঃ ৭ ৮
১৩ The National Paper 17 April 1867
১৪ হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত পৃঃ ১৫
১৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় : বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩৬৮ স) পৃঃ ৮৪

১৬ তদেব : পৃঃ ৮৫

১৭ তদেব : পৃঃ ১৭-১৮

১৮ তদেব : পৃঃ ১৮

১৯ গিরিশচন্দ্র ঘোষ : পৌরানিক নাটক : গিরিশ রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ ১৯৬৯) পৃ ৭৩২

২০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : (রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড জন্মশত বার্ষিকী সংস্করণ ১৩৬৮) পৃ ৮১৯

২১ তদেব : পৃঃ ৮১৯

২২ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি

২৩ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ : বাংলা নাটকের ইতিহাস (জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিসার্স ২য় সং ১৩৬২) পৃ ১০৪

২৪ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ (এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং ৩য় সং ১৩৭৪) পৃ ৩০

২৫ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ১৩৪০) পৃ ৭৭

২৬ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ৩০৩

২৭ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : তদেব পৃ ২০৭-২০৮

২৮ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : দীনবন্ধু মিত্র

২৯ ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ খণ্ড (বর্ধমান সাহিত্য সভা ১৩৬৫) পৃ ২৮৪

৩০ হেমেন্দ্র কুমার রায় : বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার (ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী ১৩৬১) পৃ ১০৬

৩১ ইন্দ্র মিত্র : সাজঘর (ত্রিবেণী প্রকাশন ১৩৬৭) পৃঃ ৩৫৭-৩৬২ ; পৃ ৩৬২-৩৬৭

৩২ নাচঘর : ১৩ই ভাদ্র ১৩৩১ [বহুরূপী ২৬ সংখ্যায় উদ্ধৃত]

দ্বিতীয় অধ্যায়

দর্শক, মঞ্চ ইত্যাদি

এক

নাট্যকার, প্রযোজক ও দর্শক—তিনের আনুপাতিক সম্পর্কে গড়ে ওঠে নাটক। কাজেই নাট্য সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে স্বতঃই দর্শকের কথা না এসে পারে না। কোন বিশেষ যুগের নাটকের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য নির্ণয়ে সে যুগের দর্শকের রুচি অন্যতম স্থান গ্রহণ করে থাকে। Drama's laws the drama's patrons give—বেন জনসনের এ উক্তিতে অতিশয়োক্তি থাকলেও তার মূলের সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। তাই উনবিংশ শতকে বাঙলা নাটকের উদ্ভব, বিকাশ ও তার প্রবণতার জন্য সমকালীন দর্শক মনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

উনিশ শতকীয় বাঙালী দর্শক সম্পর্কে নানা বিভিন্ন ও বিচিত্র মন্তব্য ইতস্তত লক্ষ্য করা যায়। বাঙলা সাহিত্যের দুই প্রধান নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক দর্শক সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তাতে যে শুধু তাঁদের মানসিক বিভিন্নতা ব্যক্ত হয়েছে তা নয়, তার সঙ্গে দুটো পৃথক নাট্যান্দোলনের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে বলা যায়। "Audience যখন নিতে পারে না, তখন বুঝি audience য়ের মত করে ঠিক বলা হয়নি"[১] এবং "আমার দেশের আপামর সাধারণ লোক আমাকে ভালোবাসে, তাদের ভালোবাসাই আমার গৌরব করবার বস্তু। রঙ্গালয়ের পরিপোষক তারা—আমার নাটক গ্রহণ করেছে তারা। যদি তারা কোন বই না নেয়—তখন আমি ভাবি—প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করি—তাদের কি করে বোঝাব কি করলে আমার বক্তব্য তাদের বোধগম্য হবে।"[২] সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শক সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের সশ্রদ্ধ উক্তির বিপরীত রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য। সাধারণের আনন্দ বিধানের জন্য ক্ষণিক সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও, অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"কবিদলের গানে যে প্রকার উচ্চ আদর্শের শৈথিল্য এবং সুলভ অলঙ্কারের বাহুল্য দেখা গিয়াছে, আধুনিক সংবাদপত্র এবং অভিনয়ার্থে রচিত নাটকগুলিতেও কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে তাহাই দেখা যায়। এই সকল ক্ষণকাল জাত ক্ষণস্থায়ী সাহিত্যে ভাষা ও ভাবের ইতরতা, সত্য ও সাহিত্য নীতির ব্যভিচার এবং সর্ববিষয়েই রূঢ়তা ও অসংযম দেখা যায়।"[৩] বাঙলা নাটকের বিশেষ প্রকৃতি ও প্রবণতা নির্ণয়ের জন্যে এসকল উক্তির তাৎপর্য অনুধাবনের প্রয়োজন আছে।

বাঙলানাটকের সূচনালগ্নে পেশাদার রঙ্গালয় ছিলো অনুপস্থিত। এমন কি তখন

নাট্যপ্রযোজনা ব্যাপারটিও ছিলো অত্যন্ত অনিয়মিত। তাই প্রথম পর্বে নাট্যকারদের নাটক রচনার মূল প্রেরণা ছিল প্রধানত সামাজিক ও সাহিত্যিক। মধুসূদন অবশ্য একটি সৌখিন নাট্যদলের পৃষ্ঠপোষকতায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কিন্তু দীনবন্ধুর তেমন কোনো ধনী পৃষ্ঠপোষক জোটে নি এবং তাঁরা উভয়েই যে সকল নাটক রচনা করেছিলেন তাতে বৃহৎ দর্শকশ্রেণীর কথা তাঁরা কতটা চিন্তা করেছিলেন কিংবা আদৌ করেছিলেন কিনা বলা কঠিন। এই ধনী-আশ্রিত সৌখিন থিয়েটারের দুর্দশা দেখে 'নব প্রবন্ধ' পত্রিকা (শ্রাবণ ১২৭৪, আগষ্ট ১৮৬৭) যে মন্তব্য[৪] করেছিলো তা তখনকার অনেকের মনের কথা সন্দেহ নেই। সৌখিন অভিনেতাদের আদর্শহীনতা ও আন্তরিকতার অভাব দেখে ঐ পত্রিকাতে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের জন্য, 'অভিনয়ের অধ্যক্ষদের' কাছে আবেদন জানানো হয়েছিলো। কিন্তু ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলা নাট্যান্দোলনের দুটো বিভিন্ন ধারার সূত্রপাত হলো। প্রদর্শনী মূল্যের ওপর পেশাদার রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্ব নির্ভর করতে বাধ্য হবার দরুণ এসকল রঙ্গমঞ্চের নাট্যকার দর্শকরুচি সম্পর্কে সচেতন হলেন অধিক এবং পেশাদার রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের উক্তিতে এ সত্যই প্রমাণিত। আবার পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সমান্তরালে প্রধানতঃ জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে যে সৌখিন নাট্যমঞ্চ নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় রত ছিলো, তাতে সাধারণ দর্শকের উপস্থিতি অনিবার্য এবং তাদের রুচিকে তৃপ্ত করার জন্য কোনো দায়িত্ব উক্ত মঞ্চের কর্মাধ্যক্ষদের মধ্যে ছিলো না। তাই ঐ নাট্যমঞ্চের প্রধান পুরুষ রবীন্দ্রনাথ লোকরুচিকে অস্বীকার করেছিলেন। তারই ফলে গিরিশচন্দ্র বঙ্গের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং রবীন্দ্রনাথ শুধু মাত্র closet drama-র লেখক বলে পরিচিত হয়েছিলেন কিনা তা আলোচনার বিষয়।

দুই

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে বাঙলা নাটক সৌখিন ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে মুক্ত হলো। সুরু হলো মধ্যবিত্তের থিয়েটার। "রামনারায়ণ ও মধুসূদন যখন ধনীর প্রাসাদে উপচার সংগ্রহ করিতেছিলেন, দীনের বন্ধু দীনবন্ধু তখন নিঃসহায় মধ্যবিত্ত যুবকবৃন্দের মহাসাধনায় রসদ জোগাইতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্রের ন্যায় খাঁটি বাঙালী ব্যতিরেকে দরদ লইয়া মধ্যবিত্তের জন্য এই আয়োজন করা সম্ভব হইত না।"[৫] হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের এই সঠিক মন্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায়, বাঙলা রঙ্গমঞ্চ ও তার জন্য রচিত বাঙলা নাটক মধ্যবিত্ত মানসিকতাকেই প্রকাশ ও পুষ্ট করেছে। তখনকার কোলকাতার কত পার্সেন্ট লোক প্রতি সপ্তাহে নাটক দেখতেন, তা জানা যায় না। কিন্তু নাট্যগৃহে টিকেটের যা দাম

নাট্য—৩

ছিলো তাতে 'আপামর সাধারণ' (গিরিশচন্দ্রের ভাষায়.) নাটক দেখতে সক্ষম হতেন কিনা সন্দেহ। কিছু মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের পক্ষেই সে মূল্য দেওয়া সম্ভব হতো। সূষ্টলগ্নে ন্যাশনাল থিয়েটারের টিকেটের হার ছিলো যথাক্রমে দু' টাকা, একটাকা ও আট আনা। পরে মূল্য আরো বর্ধিত হয়। গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউস ভাড়া নিয়ে 'হিন্দু ন্যাশনাল' ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যে অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন তাতে টিকেটের হার অনেক বেশি দেখা যায়।[৬] অবশ্য তা একটি Charity Show ছিলো। এমন কি ভিড় বেশি হলে চার টাকার টিকেট আট টাকাতেও পাওয়া যেত না (কালোবাজারী ?) এমন তথ্যও নথিবদ্ধ আছে।[৭] যেখানে ভারতবাসীর মাথা পিছু দৈনিক আয় ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে দু' আনা থেকে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে দেড় আনাতে পরিণত হয় এবং বৃটিশ ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী প্রদেশ বাঙলাদেশের অধিবাসীদের মাথা পিছু বার্ষিক আয় পনেরো টাকা তিন আনা,[৮] সেখানে টিকিটের অত উচ্চ মূল্য দিয়ে নাটক দেখা সমাজের মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবানের পক্ষেই সম্ভব হতো মনে হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে কলকাতা শহরের কয়েকটি অঞ্চলের মোট লোকসংখ্যার কতজন ও কত অংশ কোন্ বৃত্তিজীবী তা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাদের মাসিক আয় সম্পর্কে একট রেখাচিত্র গড়ে তোলা চলে। কলুটোলা অঞ্চলের লোকসংখ্যার মধ্যে মোট শিল্পজীবী ছিলেন ২৫,০৫২ (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৯.৭%), বাণিজ্যজীবী ৬১৩৬ জন (অর্থাৎ জনসংখ্যার ৯৭%) এবং উকিল ডাক্তার শিক্ষক ইত্যাদি বৃত্তিধারী লোকসংখ্যা ৩০৩৫ (অর্থাৎ জনসংখ্যার ৪.৮%)। জোড়াসাঁকো অঞ্চলের শিল্পজীবী লোকসংখ্যা ১৮,৮২৬ (মোট জনসংখ্যাব ৩৫ ৫%), বাণিজ্যজীবী ৮০৪৪ (জনসংখ্যার ১৫.১% এবং উকিল ডাক্তার ইত্যাদি বৃত্তিধারী ৩৩৯৫ (মোট জনসংখ্যার ৬ ৪%)।[৯] সামান্য তারতম্য থাকলেও কলকাতা শহরেব বৃত্তিবিন্যাসের একটি স্পষ্ট চিত্র এ সংখ্যাতত্ত্ব থেকে অনুধাবন করা যায়। এঁদের মধ্যে যাঁরা শিল্পজীবী অর্থাৎ জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ তাঁদের মাসিক আয় পাঁচ টাকা থেকে পনেরো টাকার বেশি হ'ত না। এমন কি তার চাইতেও কম হ'ত। কাজেই অর্থনৈতিক কারণেই তাঁদের পক্ষে বঙ্গীয় নাট্যশালায় দর্শকরূপে উপস্থিত থাকা সম্ভব হতো কি না সন্দেহ। "আজিও বাঙ্গালীদিগের সেরূপ ধনবৃদ্ধি হয় নাই যে আমোদার্থে মাসে এত ব্যয় করিতে পাবেন।"[১০] চাকুরিজীবীদের ক্ষেত্রেও আয় বিন্যাসের একটি রেখাচিত্র এঁকেছেন সমাজতাত্ত্বিক –"অধিকাংশ সরকারী চাকরীতে বাঙালী হিন্দুরই আধিপত্য। এই আধিপত্য সরকাবী চাকরীর নিম্নস্তরেই বেশি, বাঙালী হিন্দুর সংখ্যা সেখানে প্রায় শতকরা ৯০ জন, এবং বেতন গড়ে ৬০ টাকা থেকে ২৫-৩০ টাকা। ১০ টাকা থেকে ২০ টাকার কর্মচারীর সংখ্যাও কম নয়। মধ্যস্তরের সংখ্যা (১০০-১৫০ টাকা বেতনের) তেমন বেশি নয়, উচ্চস্তরের সংখ্যা (২০০-৪০০-৫০০)

খুবই অল্প।...মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দুর „ (নাগরিক) কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে প্রধানত এই নিম্নস্তরের চাকরী সম্বল করে।"[১১] অধিকাংশ ক্ষেত্রে একান্নবর্তী পরিবার প্রতিপালন করে শতকরা কতজনের নাট্যগৃহে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হ'তো, তা সন্দেহের বিষয়। "সে সময়ে থিয়েটারের দর্শকসংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিলো।"[১২] অথচ প্রেক্ষাগৃহে বাদুড় "ঝুললে" দৈনিক টিকেট বিক্রয় ১৮০০্ টাকা এমন কি তারও বেশি হ'ত, এমন তথ্যও পাওয়া যায়। কাজেই নাট্যগৃহে নিয়মিত দর্শক হিসেবে উপস্থিত ভদ্রজনের মধ্যে অধিকাংশই যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে আসতেন, তাঁরা হলেন উচ্চস্তরের কেরানী, উকিল ডাক্তার প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তিধারী এবং জমির উপস্বত্বভোগী ইংরেজসৃষ্ট নতুন জমিদার শ্রেণী। বাঙলা নাটকের গতিপ্রকৃতি মূলতঃ এঁদের রুচি মেজাজ ও চাহিদা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়।

তিন

মধ্যবিত্ত কারা? আধুনিককালে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিপুল জটিলতা অনুধাবন করে সমাজতাত্ত্বিকগণ মধ্যবিত্তের কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু আধুনিককালের ইতিহাসে মধ্যবিত্তের ভূমিকা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ সচেতন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক পোলার্ড সাহেবের মতে, সামন্ততান্ত্রিক যুগ থেকে আধুনিকযুগকে পৃথক করেছে মূলতঃ নবোদ্ভূত নগরবাসী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। শিল্প ও বাণিজ্য ব্যতিরেকে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও অস্তিত্ব সম্ভব নয় এবং যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে নি, সেখানে রেনেসাঁস বা রিফর্মেশন সূচিত হতে পারে না। কাজেই রেনেসাঁসের ধারক ও বাহক হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দায়িত্ব ও গুরুত্ব অপরিসীম। উনিশ শতকীয় বাঙলার রেনেসাস বা নবজাগৃতি নবোদ্ভূত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনন প্রক্রিয়ার ফলেই সম্ভব হয়েছিলো—এ সিদ্ধান্তও ঐতিহাসিক।

কিন্তু পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে এবিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে বাঙলার নবজাগৃতির সঙ্গে ইউরোপীয় রেনেসাসের সামান্য মিল থাকলেও পার্থক্য ছিলো প্রকট। নতুন যুগোপযোগী মানবতাবোধ, অন্ধ প্রথানুগত্যের বিরোধিতা, স্ত্রী জাতির বন্ধন মুক্তির জন্য আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে স্বাধীন চিন্তার আকাঙ্ক্ষা ও কর্মপ্রচেষ্টায় বাঙালীর জীবনে প্রচণ্ড পরিবর্তন এসেছিলো সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু উনিশ শতকীয় বাঙালী বুদ্ধিজীবী সঙ্গত কারণেই কেবলমাত্র সমাজ ও ধর্মান্দোলনের মধ্যে তাঁদের সকল মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাছাড়া, পূর্বেই বলা হয়েছে, জাতীয় সম্পদ বিকাশের বৃহৎ কর্মযজ্ঞশালায় বাঙালীর শ্রম নিয়োজিত হতে পারে নি, তাই জাতীয় জীবনে দেখা দিয়েছিলো ক্রিয়া ও দ্বন্দ্বের অভাব। তাই বাঙালীর নাট্য প্রচেষ্টায়—নাটকের যা

প্রাণসত্তা—ক্রিয়া ও দ্বন্দ্ব হয়েছে অধিকাংশ স্থলেই আরোপিত ও কৃত্রিম এবং তাতে দেখা দিয়েছে উচ্ছ্বাসের আধিক্য, ফলে নাটকে যুক্তিপরম্পরা (Cause and effect) হয়েছে অবহেলিত। পাবলিক থিয়েটরের দুই প্রধান নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক বিশ্লেষণ করলে এ সত্য প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ নাট্যকারদের রচনা সমকালীন যুগ পরিবেশ ও মধ্যবিত্ত মানসিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, এ কথা বলা যায়।

এখানে অবশ্য একটি তর্কের সূত্রপাত হতে পারে। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন—বাঙলা নাটক বাঙালীর জাতীয় ভাবধারার অভিব্যক্তি এবং তাতে বাঙালী মানস প্রবণতা প্রকাশিত হয়েছে, কাজেই ইউরোপীয় বিশেষ করে শেকসপীরীয় নাটকের মানদণ্ডে এ নাটকের বিচার অন্যায় ও অযৌক্তিক। ইউরোপীয় চিত্ত তমঃ ও রজঃ গুণসমন্বিত, তাই তাঁদের নাটক দ্বন্দ্ব নাটক। কিন্তু আমাদের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ভারতীয় আদর্শ সত্ত্বগুণের প্রকাশক—তাই তাঁর রচনা বিচারের মাপকাঠি হওয়া উচিত পৃথক। জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতার জন্য নাটকের আন্তর সত্তা পৃথক হতে পারে। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' ও জাপানের 'নোহ্' নাটকগুলো পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শকে অবহেলা করেও নাটক হিসেবে অতুলনীয় বলে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র প্রমুখ সম্পর্কে সম্ভবতঃ তা প্রয়োগ করা চলে না। গিরিশচন্দ্রকে "বাঙলার শেকসপীয়র" অভিধায় অভিহিত করে যে শুধু তাঁকে পাশ্চাত্ত্য নাটকের সঙ্গে সমসূত্রে বিচার করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে তা নয়, তিনি নিজেও আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন— "Dramatist-কে সীমাবদ্ধ কয়েকটি দৃশ্যপটের ভিতর through action কথাবার্তায় সমুদয় রস ও ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে প্রত্যেক চরিত্রটিকে পরিস্ফুট করে সত্যকে প্রচার করতে হয়,"১৩ আবার অন্যত্র "ঘটনার পারম্পর্যে, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে অন্তর সংগ্রামে মানুষের যে চরিত্র ফুটে উঠে, সেটি নিপুণভাবে স্তরে স্তরে দেখানোই প্রকৃত নাট্যকারের কলাকৌশল।"১৪ এবং সেই সঙ্গে জানিয়েছেন—"আমি শেক্সপীয়রের আদর্শের অনুকরণে নাটক রচনা করেছি। তিনিই আমার আদর্শ।"১৫ অর্থাৎ তাঁর নাটক সম্পর্কিত ধারণা বহুলাংশে শেক্সপীরীয় নাট্যাদর্শকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিলো, এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়। অথচ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ অন্যান্য নাট্যকার—বাঙলা নাটকে পাশ্চাত্ত্য ক্রিয়া ও ঘাত প্রতিঘাত পরিবেষণে ব্যর্থ হয়েছেন তাঁদের প্রতিভাহীনতার জন্য নয়, বরং প্রধানতঃ সমকালীন যুগপরিবেশ ও সমাজ মানসের বৈশিষ্ট্যের জন্য। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে আশ্রিত নবনাট্যকারদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালই সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ও জনপ্রিয়। অর্থাৎ দর্শক প্রশংসাধন্য। কাজেই তাঁদের নাটকের বিশেষ প্রকৃতির স্বরূপ নির্ধারণে যেমন প্রয়োজন সমকালীন যুগপরিবেশ বিশ্লেষণ, তেমনি দর্শকমানসের শ্রেণীচরিত্র ও প্রবণতা বিচার।

এই সাধারণ দর্শক—যাঁদের জন্য গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল ও অন্যান্য নাট্যকারেরা লেখনীচালনা করেছিলেন—তাঁদের রুচি কেমন ছিলো? সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন মন্তব্য ও সমালোচকদের রচনায় যা প্রকাশিত তা বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক নয়। অবশ্য সাধারণ দর্শকের রুচি সম্পর্কে কোনো দেশেই খুব একটা উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায় না। এলিজাবেথীয় দর্শকের স্বাভাবিক প্রবণতা ও চাহিদা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যে মন্তব্য করেছেন এ প্রসঙ্গে তা স্মরণ করা যেতে পারে। বিখ্যাত সমালোচক ব্র্যাডলের মতে[১৬] শেক্সপীরীয় দর্শক ছিলেন প্রধানত অজ্ঞ হৈহল্লাকারী, নাচগান ও কুৎসিৎ রসিকতা প্রিয়, সৈন্য ভেরীবাদন ও কামান গর্জনের পক্ষপাতী এবং যে নাটক তাঁদের পছন্দসই নয় তার প্রযোজনা স্বভাবসুলভ হিংস্র উপায়ে বন্ধ করে দেওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু সমালোচকের ভাষায় তাঁরা loved poetry এবং তাঁদের ব্যতীত the Elizabethan drama could never have been the thing it was. শেক্সপীয়র তাঁদের রুচিকে স্বীকার করে নিয়েই কালজয়ী নাট্য সাহিত্য রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ এলিজাবেথীয় ইংরেজ রেনেসাঁসযুগের প্রাণ চাঞ্চল্যে সর্বদা ছিলেন তরঙ্গিত এবং তাঁদের সেই অদম্য জীবনীশক্তি বা vitality শেক্সপীয়রের নাটকে প্রকাশিত হয়েছে। হিসেবে দেখা যায় ১৫৯৯ থেকে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লণ্ডন শহরের মোট জনসংখ্যার শতক ১৩ ভাগ—অর্থাৎ প্রতি পনেরো জনের দুজন—প্রতি সপ্তাহে থিয়েটারে যেতেন এবং the large majority of these were craftsmen, tradesmen and labourers, while small minority were professionals and the gentry।[১৭] কিন্তু উনিশ শতকীয় বাঙলা নাটকের দর্শকবৃন্দ ছিলেন মোটামুটিভাবে বিপরীত। তাঁরা মূলত ভদ্রলোক। আগেই বলা হয়েছে, তাঁদের জীবন-প্রবাহ ছিলো নিস্তরঙ্গ, নিস্তেজ, দ্বন্দ্বসংঘাতবিহীন। এই ভদ্রলোকদের থিয়েটার প্রীতির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গে[১৮] যতই রহস্যপ্রিয়তা থাক, তার মূলের সত্যকে অস্বীকার করা চলে না। বাঙালী দর্শক সম্পর্কে লেবেদেভের উক্তিকে[১৯] হয়তো প্রাচীন বা এক পেশে বলে অবহেলা করা চলতো, যদি না পরবর্তীকালে বহু রচনায় তার সমর্থনযোগ্য প্রচুর নজির না পাওয়া যেতো। বাঙালীর প্রিয় আমোদ-প্রমোদ - সমাচার দর্পণের মতে—চুঁচুড়ার সং, হাজি সাহেবের সং, নূতন যাত্রা, সকের কবিতা, "গোলোক-মণি ও দয়ামণি এবং রত্নমণি প্রভৃতি তিন দল নেড়ী কবির গান" মল্লযুদ্ধ বা কুস্তির লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো বা ঘোড় দৌড়।[২০] তাছাড়া নাচগান, যাত্রা, "উড়িষ্যামুলুক হইতে উপস্থিত" রামলীলা, আখড়া, সঙ্গীত, কবির লড়াই, বুলবুলাক্ষ্য পক্ষীর যুদ্ধ এবং নাটক।[২১] এ হলো বাঙলা নাটক ও সাধারণ রঙ্গালয় সৃষ্ট হবার পূর্ববর্তী কালের চিত্র। পরেও যে তা বিশেষ পরিবর্তিত হয়েছিলো তার বিশেষ প্রমাণ নেই। সমকালীন বাঙলা দেশের অবস্থার সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্য পতনকালীন দুরবস্থার তুলনা

করে ১লা শ্রাবণ ১২৭৯ সালে 'সোমপ্রকাশ' লিখছেন—"আজিকালি বাঙলা দেশেও ঐরূপ ব্যসনের একাধিপত্য। অধিকাংশ লোকের আমোদে-প্রমোদে কালক্ষেপ। গান বাদ্য যাত্রা অভিনয় লইয়াই অনেকে ব্যতিব্যস্ত।··· পুরুষোচিত গুণের অর্জনে কাহার যত্ন নাই। কতকগুলি লোকে বুদ্ধিবৃত্তির মার্জনাকারী কেবল কিছু লেখাপড়া শিখিয়া তৃপ্ত হইয়া আছেন।··· বাঙালিদিগের বাণিজ্যে প্রবৃত্তি নাই, সংগ্রামে গতি নাই, আয়াসকর কার্যে মতি নাই, ভোজ্য ও শয়ন অতি কোমল, সুতরাং বিলাসেই গাঢ়তর অনুরাগ জন্মিয়াছে।"[২২] ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনের কিছু পূর্বে সোম-প্রকাশের এই বাঙালী চরিত্র বিশ্লেষণ গভীর অর্থবহ। অর্থাৎ কর্মদ্বন্দ্ববিহীন নিস্তরঙ্গ-তাই যে মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের বৈশিষ্ট্য তা সেকালেও আলোচনার বিষয় ছিলো। অবশ্য সোমপ্রকাশের দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো মূলতঃ নীতিবাদী। তবু উদ্ধৃত অংশের সত্যতা অনস্বীকার্য। তাই ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য যখন লেখেন—"অর্থকরী নাট্যশালা হইলেই নাটক রচনা সর্বসাধারণের রুচির অনুগামী হয়। এদেশের সর্বসাধারণ বলিতে কি প্রকার পদার্থ বুঝায় তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেরই জানা আছে। আমাদের মধ্যে অসাধু রুচির প্রবলতা যথেষ্টই আছে"[২৩]—তখন তা বুদ্ধিজীবীর উন্নাসিকতা বলে নিতান্ত লঘু করে দেখলে চলে না। সমকালীন বঙ্গরঙ্গমঞ্চের কুরুচি দূর করবার জন্যই নাকি দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। "এই সকল নাটক রচনায় বাঙালার রঙ্গমঞ্চের উন্নতি সাধন করা দ্বিজেন্দ্রলালের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো।'[২৪] সমালোচকের ভাষায়—"এমন এক সময় ছিলো যে স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের দুই একখানি নাটক ছাড়া, বাঙালার রঙ্গমঞ্চ এমন কুরুচিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে ভদ্র ব্যক্তিরা সেখানে যাইতে সঙ্কোচবোধ করিতেন।···দ্বিজেন্দ্রলাল রঙ্গমঞ্চের এই হাওয়া যে অনেকটা পরিবর্তন করিতে পরিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।"[২৫] কুমুদবন্ধু সেনের সঙ্গে গিরিশ-চন্দ্রের কথোপকথনেও জানা যায় যে অমৃতলাল বসু নাকি তৎকালীন রঙ্গালয়ের দুরবস্থা দেখে আক্ষেপ করেছেন—"দর্শকের রুচি জঘন্য হচ্ছে, আর রঙ্গমঞ্চেও সব রকম কদর্য নাচ গান, হাবেভাবে লোকের মন কুরুচিপূর্ণ হচ্ছে।"[২৬] গিরিশচন্দ্রও স্বীকার করেছেন—"বেশির ভাগ লোক যায় নাচ দেখতে আর গান শুনতে। থিয়েটারে নাটক দেখতে খুব কম লোকই যায়।"[২৭] ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"আমাদের দেশে দর্শকের রুচি বলিয়া একটা পদার্থই নাই বলা যায়। নাট্যশালার কর্তৃপক্ষরা নিজ নিজ রুচি অনুসারে যখন যাহা কিছু দেখাইতেছেন, দর্শকেরা বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া তাহাই দেখিয়া যাইতেছে। নাট্যশালা হইতে যে রুচি গড়িয়া দেওয়া হয়, দর্শকেরা কেবল তাহারই অনুসরণ করে মাত্র।"[২৮] এবং এই কুরুচি বিস্তারে অন্যান্য নাট্যকার সহ স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের প্রচুর অবদান আছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। অবশ্য নাট্যশালা দর্শকের রুচি সর্বাংশে নিয়ন্ত্রিত করে ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের এ অভিমত খানিক চরমপন্থী। কেননা যে কোনো যুগেই দর্শকসাধারণের চাহিদা ও প্রবণতা এবং রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও জীবনাদর্শ পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ

নাট্যান্দোলনে গড়ে ওঠে। 'গোগোলকে দর্শকের স্তরে নামিয়ে এনো না, বরং দর্শককেই গোগোলের স্তরে উন্নত করো'—"চেকভের এই বক্তব্য যেমন সত্য, তেমনি সত্য গোগোল যাঁদের পক্ষে অনধিগম্য তাঁদের কাছে গোগোলকে উপস্থিত করা পণ্ডশ্রম মাত্র। গিরিশচন্দ্র প্রযোজিত বিদগ্ধজন প্রশংসিত ম্যাকবেথ দশ রাত্রির বেশি চলে নি, এ ঘটনাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

পাঁচ

সোমপ্রকাশ পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ সালে অর্থাৎ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় দশ বছর পরে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিলো।[২৯] চিঠিটি নানা-দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। বিস্তৃত আলোচনায় পাবলিক থিয়েটারের নানা দোষ বর্ণনা করে পত্রলেখক লিখছেন—"বর্তমান রঙ্গভূমি বঙ্গের বিন্দুমাত্র হিতসাধন না করিয়া বরং সহস্র প্রকার বিষময় ফল উৎপাদন করিতেছে।" অবশ্য পত্রলেখক অতিরিক্ত নীতিবাদী, রঙ্গমঞ্চে বারবনিতা সহযোগে অভিনয় বিষয়ে অত্যন্ত ছুঁৎমার্গী। যেখানে অনুরূপ স্ত্রীলোক নিয়ে নাট্য প্রযোজনা হয়—এমন কি—তার বিলোপ তিনি কামনা করেছেন। তবু তাঁর দীর্ঘ পত্রের মাধ্যমে তৎকালীন বাঙালীর একটি বিশেষ মানসিকতা অভিব্যক্ত হয়েছে বলা যায়। 'মধ্যস্থ' পত্রিকাও ১২৮০ সালেই সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনেতাদের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—"তাঁহারা যত আমোদ করুন, যত দৃশ্য-কাব্যের অভিনয় প্রদর্শন দ্বারা সাধারণের যত অনুরাগভাজন হউন; ধনে মানে ও নামে পূর্বাপেক্ষা পুনর্বার শতগুণে কৃতকার্য হউন; কিন্তু যেন তাঁহাদের আদ্যাবস্থার প্রতিজ্ঞা ও উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হয়েন, যেন জাতীয় নাট্যসমাজরূপ মহোচ্চ উপাধির কার্য করিতে ত্রুটি না করেন—যেন স্বদেশের কুরীতি, কুনীতি, কুপ্রথা, কুব্যবহারের সংশোধনে তিলমাত্র শিথিল-যত্ন না হয়েন।"[৩০] ২৩শে কার্তিক ১২৮৮ সালে সোমপ্রকাশ লিখছেন—"এখন সাধারণতঃ আমাদের সমাজের যা অবস্থা, তদনুসারে আমরা চাই যে, আমাদের নাট্যশালাগুলি বিশেষরূপে সংস্কৃত ও নৈতিক অনুশাসনে পরিচালিত হইয়া পরিমার্জিত রুচিবান ব্যক্তিবৃন্দের দর্শনোপযোগী হউক।"[৩১] অর্থাৎ 'সমাজ সংস্কার', 'দেশের হিতসাধন' ও নৈতিক অনুশাসন'—বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের কাছে এই ছিলো সেকালীন শিক্ষিত থিয়েটর প্রেমিক বাঙালীর দাবী।

উদ্ধৃত অংশগুলোর সময়সীমা ১২৮০ সাল থেকে ১২৮৯ সাল অর্থাৎ ১৮৭৩ থেকে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ—প্রায় দশ বছর। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের জনক গিরিশচন্দ্র তখন অদ্বিতীয় অভিনেতা হিসেবে 'গ্যারিক' আখ্যা লাভ করলেও, নাট্যকাররূপে তখনও খ্যাতি অর্জন করেন নি, আত্মপ্রকাশ করেছেন মাত্র। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা গুটি সাতেক এবং সেগুলো সবই পৌরাণিক। তখনো বাঙলা নাট্যসাহিত্যের শ্রেণীবিন্যাস সুস্থির হয় নি। পাবলিক থিয়েটার আশ্রিত নাটকাবলী অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আমাদের প্রায় পুরো নাট্যসাহিত্যকে মোটামুটি ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—

পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক তথা পারিবারিক, রোমান্স, গীতি নৃত্যনাট্য ও প্রহসন। বহুকাল পর্যন্ত বাংলা নাটকরচনা এই শ্রেণীবিভাগ মেনে চলেছে। গিরিশচন্দ্রের রচনাতেই এই শ্রেণীবিভাগ প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে—এ ছয়টি বিভাগের বাইরে নাটক আর কোনরূপই বা হবে। কাজেই এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের বিশেষত্বগুলো বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। অবশ্য পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তা কিছু বিস্তৃত করা হলো।

পুরাণাশ্রিত নাটক মধুসূদনও লিখেছিলেন। বরং বলা যায় মৌলিক বাঙলা নাট্য রচনার সৃষ্টিলগ্নে পুরাণ বা মহাকাব্য বাঙালী নাট্যকারকে বিষয়বস্তু যোগান দিয়েছিলো ; প্রমাণ—তারাচরণ সিকদারের 'ভদ্রার্জুন'। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের হাতে পুরাণাশ্রিত নাটক ভক্তিরস দ্বারা জারিত হয়ে 'পৌরাণিক' হয়ে উঠলো। তাঁর অন্বিষ্ট হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন—শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবর্তিত সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী প্রচার। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রচলিত প্রায় সবগুলো ভারতীয় ধর্মমত, প্রচারক ও সাধকদের জীবনী তাই গিরিশচন্দ্রের অবলম্বন। বৌদ্ধ শাক্ত বৈষ্ণব পৌরাণিক ও সনাতন ধর্ম, যাদের মধ্যে হয়তো দর্শনতত্ত্ব-গত মিল সামান্যই, তাদের সবগুলোকেই গিরিশচন্দ্র এক মনোভূমিতে মিলিয়েছিলেন এবং সে মনোরাজ্যের সাধারণ দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ। এমন কি প্রচলিত ধর্মমতগুলোর আধুনিক যুগোপযোগী নবীকরণও গিরিশচন্দ্র করেন নি, যা করেছিলেন রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ। ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব তখন স্তিমিতপ্রায়, বঙ্কিমচন্দ্রের কঠোর বুদ্ধি ও যুক্তি অনুশাসিত কর্মমুখর নবহিন্দুত্ব সাধারণের কাছে অতিরিক্ত ইনটেলেকচুয়াল অতএব অগম্য তাই আধুনিক যুগে থেকেও মধ্যযুগে প্রস্থানকারী গিরিশচন্দ্রের ভাবাতিরেক ও আবেগ প্লাবী নাটকে 'আপামর সাধারণ' স্বস্তি পেয়েছে এবং গিরিশচন্দ্র সেজন্যই "জাতীয়" নাট্যকার। প্রধানত পৌরাণিক নাটক রচনার মাধ্যমেই এ অভিধা তিনি অর্জন করেছিলেন।

আধুনিক অর্থে ঐতিহাসিক নাটক বলতে যা বোঝায়, পূর্বেই বলা হয়েছে, বাঙলা ঐতিহাসিক নাটক তার সমীপবর্তী কিনা সন্দেহ। আমাদের ঐতিহাসিক নাটক অধিকাংশই দেশপ্রেম প্রচারের মাধ্যম। ঐতিহাসিক নাটকে দেশপ্রেম থাকতে পারে এবং থাকেও, কিন্তু তাই তার একমাত্র উপজীব্য হতে পারে না। অবলম্বিত যুগের দ্বন্দ্বের গভীরে অবগাহন করে নাট্যকার যদি তার প্রাণসত্তাটিকে—হতে পারে সেটি তার স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীগত—প্রস্ফুটিত করতে না পারেন, তবে তা আর যাইহোক ঐতিহাসিক নাটক নয়। তখনকার দেশপ্রেমে যেহেতু রাজনীতি-সচেতনতা নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের আর তাও অদ্ভুত শ্রেণীস্বার্থের দ্বিধায় ছিল অবগুণ্ঠিত, তাই তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য ও বক্তৃতার প্রাধান্য। কিন্তু সেকালে এ নাটকগুলোর জনপ্রিয়তা ছিলো অপরিসীম। কারণ স্পষ্ট।

বাঙলা সামাজিক নাটক ও প্রহসন একই উপলব্ধির ভিন্ন রসাশ্রয়ী প্রকাশ মাত্র। পুরোনো মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকারদের সামাজিক নাটক লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তার থেকে সামান্য বিচ্যুতি তাঁদের তীব্র বিদ্রূপকে আমন্ত্রণ-করেছে। এ যুগের সর্বপেক্ষা জনপ্রিয় সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙ্গনের চিত্র এবং সে-ভাঙ্গন, নাট্যকারের মতানুযায়ী, প্রধানত পুরোনো ধর্মাদর্শ থেকে স্খলনের ফল। গৌণ চরিত্র হয়েও প্রফুল্লর নামে নাটকের নামকরণে নাট্যকারের এক বিশেষ মানসিকতা অভিব্যক্ত হয়েছে। রমেশের ধর্মহীনতার পাশে প্রফুল্লের ধর্মবোধ ও আত্মত্যাগ নাট্যকার উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন, যাতে নাটকের মূল উদ্দেশ্য অনুধাবনে দর্শক ব্যর্থ না হন এবং সেজন্যেই নাটকের নামকরণও অনুরূপ হয়েছে। অথচ কোন্ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে এ ভাঙ্গন ত্বরান্বিত হচ্ছে তার কারণ নির্ণয়ে নাট্যকার পরাঙ্মুখ। ফলে নাটকে ব্যক্তিগত বিয়োগব্যথা পরিবারিক গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহৎ তাৎপর্য লাভ করে 'সামাজিক' হয়ে উঠতে পারে নি। অতি উৎসাহী সমালোচক অবশ্য গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলোকে ইবসেনের নাটকের সমশ্রেণীতে স্থাপন করে তার অর্থ নির্ণয় করতে আহ্বান জানিয়েছেন,[৩২] কিন্তু তাতে যতটা উচ্ছ্বাসের আধিক্য প্রকাশ পেয়েছে যুক্তি ততটা নেই। আমাদের সামাজিক নাটকে প্রধানত নারীর পাতিব্রত্য, সনাতন হিন্দু আদর্শের প্রচার ও প্রাচীন সংস্কারের বিজয়বার্তা ঘোষিত হয়েছে এবং তা প্রচলিত ধর্মবোধদ্বারা জারিত। এবং যেখানেই এ বিশেষত্ব থেকে বাঙালী স্খলিত হয়েছে, নাট্যকার প্রহসনের তীব্র বিদ্রূপাঘাতে তাকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। সেজন্যই বাঙলা প্রহসনের ব্যঙ্গের প্রিয় বিষয়বস্তু হলো স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা। কদাচিৎ প্রহসনে—যেমন জ্যোতিরিন্দ্রনাথে—এর থেকে ভিন্ন রস পরিবেষিত হয়েছে। এবং সেজন্যেই জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের প্রহসনগুলো অধিকাংশই সাধারণ রঙ্গালয় কর্তৃক অবহেলিত হয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠতম প্রহসন 'অলীকবাবু' সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হতে দেখি না। যেখানি সর্বাপেক্ষা বেশীবার অভিনীত হয়েছে—কিঞ্চিৎ জলযোগ—তাতেও স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতাকে বেশ ব্যঙ্গ করা হয়েছিলো। এ যুগের প্রধানতম প্রহসনকার অমৃতলাল বসু স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতাকে বিদ্রূপকণ্টকিত করেই 'রসরাজ' আখ্যা লাভ করেছিলেন, এ বিষয়টি অনুধাবন যোগ্য।

বাঙলা গীতিনৃত্যনাট্যগুলোতে—যা সাধারণ রঙ্গালয়ে জনপ্রিয় হয়েছিলো—প্রধানত উৎকট কাল্পনিকতা, অবাস্তব দৃশ্যবিন্যাস ও অদ্ভুত রসবিকারের সমারোহ লক্ষ্য করা যায়। এ-ধরণের নাটকের বিষয়বস্তু অধিকাংশ সময়ে আরব্যোপন্যাসের অন্তর্গত এবং কখনো কখনো নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত কিন্তু তা-ও আরব্যোপন্যাসের-লক্ষণাক্রান্ত। সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় আবুহোসেন, আলিবাবা, শিরী ফরহাদ বা হিন্দাহাফেজ তার প্রমাণ। যে রোমান্সপ্রিয়তা মানুষকে প্রাত্যহিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে কল্পনার ঊর্ধ্বলোকে

প্রেরণ করে বিস্তৃত করে তোলে এগুলোতে তার নিতান্ত অভাব সহজেই চোখে পড়ে। এ নাটকগুলোই রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষদের অর্থ দিয়েছে সর্বাধিক। 'হিন্দা-হাফেজ ও তুকাণীর প্রথম রাত্রেই বিক্রী হয় ১২২৮৲। হাজারের বড় কম হইত না, নবম রাত্রে আরও বেশী হইয়াছিল।'[৩৩] গিরিশচন্দ্র স্বীকার করেছেন—"থিয়েটার জমাতে হবে বলে কতকগুলি কুরুচিপূর্ণ নাচগানের অবতারণা করলে দর্শকদের রুচি আপনি খারাপ হয়ে যায়"[৩৪] কিন্তু তিনিও এ আবেষ্টনী অতিক্রম করতে পারেন নি। তুলনামূলকভাবে এ শ্রেণীর নাটক বাঙলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে অধিক। রঙ্গালয়ের জীবনধারণের জন্য তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

রোমান্স বা রোমান্টিক নাটক প্রযোজিত হয়েছে খুব কম এবং তাতেও সনাতন হিন্দুধর্মের জয়ঘোষণা প্রাধান্য পেয়েছে। শেকস্পীয়রের রোমান্সগুলো বিশ্লেষণ করে সমালোচক তার লক্ষণ নির্দেশ করেছেন—"The first and fundamental article of the romantic doctrine is clearly proclaimed in Shakespeare's comedies, where love is commonly represented as a trancendent experience, an actual recreation of being that sets the imagination aflame, stimulates sensibility, reveals the exhilarating poetry of life, and brings to perfection the fine flower of almost every virtue।"[৩৫] বাঙলা রোমান্টিক নাটকের সঙ্গে পার্থক্য সহজেই অনুমেয়। শেকস্পীয়রে যেখানে জীবনধর্মের জয়যাত্রা, বাঙলা নাটকে সেখানে প্রচলিত ধর্মের অন্ধ আনুগত্য। তাই এলিজাবেথীয় নাটক reflex of the turbulent, creative age,[৩৬] আর বাঙলা নাটক মধ্যবিত্ত মানসিকতার ভদ্র খণ্ডিত ও নিরাপদ অভিব্যক্তি।

বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয়াশ্রয়ী নাটকের এ শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে অপেশাদার মঞ্চের নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের নাটকের শ্রেণীবিন্যাসে প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান এবং সে পার্থক্য গভীর অর্থবহ। এর মধ্যে পাবলিক থিয়েটার ও অপেশাদার মঞ্চাশ্রিত নাট্যান্দোলনের চারিত্রধর্ম প্রকাশিত। পাবলিক থিয়েটার যে সাধারণ দর্শক তৈরী করেছিলো এবং যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় পাবলিক থিয়েটার অস্তিত্ব বজায় রেখে ব্যবসা চালাতে সক্ষম হয়েছিলো, রবীন্দ্রনাটকের সঙ্গে ছিলো তাঁদের দুরতিক্রম্য ব্যবধান। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ, বিশেষ কোনো দর্শকশ্রেণী সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। তাই রবীন্দ্রনাট্যধারা তৎকালীন বঙ্গনাট্যসাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন একক ও স্বকীয় মহিমায় নির্বাসিত।

ছয়

পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং প্রহসন পঞ্চরং ও গীতি-নৃত্যনাট্য সাধারণ রঙ্গালয়ের এই হলো নাটক বৈচিত্র্য। তুলনায় রোমান্স অনেক কম রচিত ও অভিনীত

হতে দেখি। এদের মধ্যে জনপ্রিয়তা ও প্রাচুর্যে প্রহসন গীতিনৃত্যনাট্য প্রধান স্থান অধিকার করে আছে এবং তা মূলত অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনে। সমকালীন অনেক সমালোচক এগুলোর রুচিহীনতার প্রতি তীব্র মন্তব্য করেছেন সত্য, কিন্তু রঙ্গালয়ের জীবনধারণের জন্য প্রত্যেক দেশেই এ ধরণের নাটক প্রচুর অভিনীত হতে দেখা যায়।

কিন্তু পৌরাণিক ঐতিহাসিক সামাজিক নাটক ও কিছু প্রহসন বাঙালী নাট্যকারদের সাহিত্য প্রতিভার বিজয় বৈজয়ন্তী বলে স্বীকৃত। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অমৃতলাল বাঙলা নাটকের অবিসংবাদী প্রতিনিধি। এঁদের সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদকেও অন্তর্ভুক্ত করা চলে। কেননা ওপরে বর্ণিত সকল শ্রেণীর নাটক প্রত্যেকে লিখলেও গিরিশচন্দ্র যেমন পৌরাণিক ও সামাজিকে, দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটকে ও অমৃতলাল প্রহসনে আধিপত্য দেখিয়েছেন, ক্ষীরোদপ্রসাদে তেমনি কোনো বিশেষ শ্রেণীর প্রতি আনুগত্য অনুপস্থিত। অবশ্য সামাজিক নাটক ব্যতীত সর্বশ্রেণীর নাটক রচনায় তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন এবং আলিবাবা, আলমগীর বা নরনারায়ণ লিখে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, একথা অনস্বীকার্য।

এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, দর্শক সাধারণের রুচি, মেজাজ ও চাহিদা এবং নাট্যকারদের শ্রেণীচরিত্র ও প্রতিভা কোন্ কেন্দ্রবিন্দুতে মিলে উপরোক্ত রসাশ্রয়ী নাট্যরচনা সম্ভব করেছিলো। আগেই বলা হয়েছে, গতশতকের যুগপরিবেশের প্রভাবে বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর ধর্মান্দোলন, সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারের নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে পদচারণা বিশেষ সম্ভব ছিলো না। পরে জাতীয় ভাব উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রেম প্রাধান্য লাভ করেছিলো বটে কিন্তু রাজনৈতিক সচেতনতার দিক দিয়ে তা নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের এবং দেশের সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ঘোষণা বা সংগ্রাম তাঁদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। এর মধ্যে শিক্ষা সমস্যা নিয়ে নাট্যপ্রযোজনা পাবলিক থিয়েটারে একেবারেই অনুপস্থিত। অথচ বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ইংরেজের প্রচুর প্রচার সত্ত্বেও দেশের অত্যন্ত ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের কাছে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছিলো। "মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর (প্রবেশিকা পরীক্ষা) পর্যন্ত বিচার করলে উনিশ শতকের শেষে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ত্রিশ হাজারের মতো। গ্রাজুয়েটদের যদি উচ্চশিক্ষিত ধরা যায়, তাহলে ১৮৫৮ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত চব্বিশ বছরে ১৭১২ জন বি এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পরবর্তী উনিশ বছরে এই হারে গ্রাজুয়েটের সংখ্যা যোগ করলে ১৯০০ সাল পর্যন্ত মোট গ্রাজুয়েটের সংখ্যা হয় ৩০০০-এর কিছু বেশি।"[৩৭] প্রায় সাত কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত বঙ্গদেশে শিক্ষার এই হার অত্যন্ত শোচনীয়। অথচ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তনে অত্যুৎসাহী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ভারতের নিজস্ব শিক্ষাদান পদ্ধতিকে বিপর্যস্ত করেছিলো বলা যায়। ফলে শিক্ষিত জনসাধারণের হার বৃদ্ধি মধ্যযুগের তুলনায় ইংরেজ যুগে এমন কিছু উৎসাহব্যঞ্জক নয়। শিক্ষাজগতের এই

বিরাট সমস্যাটি সমকালীন নাট্যকারদের নজর এড়িয়ে গিয়েছিলো। কাজেই ধর্ম, সমাজ ও দেশপ্রেম ব্যতীত নাট্যকারদের অবলম্বিত বিষয় অন্যকিছু হতে সক্ষম হলো না। ন্যাশনাল থিয়েটারের জয়যাত্রা 'নীলদর্পণ' প্রযোজনার মাধ্যমে সূচিত হয়েছিলো বটে কিন্তু তা সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকারদের নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করে নি। প্রচণ্ড সম্ভাবনা সত্ত্বেও 'নীলদর্পণ' তাই কোনো ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয় নি। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে 'নীলদর্পণ' নিঃসঙ্গ নক্ষত্র। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর অর্থ-রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে যে সকল নাটক প্রকাশিত হয়েছিলো যথা 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩) বা চা-কর দর্পণ' (১৮৭৫), তা পাবলিক থিয়েটরের কর্মকর্তাদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে। নাটক দুটোর পাশে প্রকাশকালেব উল্লেখ করা হ'ল এই কারণে যে 'নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল' (১৮৭৬) যা বাঙলা নাট্যরচনাকে কঠোরভাবে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিলো তা তখনো ছিলো ভবিষ্যতের গর্ভে। তাছাড়া নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল উপেক্ষা করে বহু নাটক উত্তরকালে প্রযোজিত হয়েছে ও রাজরোষ বরণ করেছে—তা ঐতিহাসিক সত্য। তাই এই শ্রেণীর নাটকের প্রতি মঞ্চের অধ্যক্ষদের অনীহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'জমিদার দর্পণ' নাটকের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রেব বিবাগের কথা ছেড়ে দিলেও এই শ্রেণীর নাটকের প্রতি তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালীর বিতৃষ্ণা নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'দুর্ভিক্ষ-দমন' নাটক সমালোচনা প্রসঙ্গে 'রহস্য সন্দর্ভপত্রিকা' যে মন্তব্য করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। এধরণের নাট্যলেখকদের নিন্দা করে বলা হয়েছে—"তাহারা অনাথিনী বঙ্গভাষাকে যথেচ্ছা মত অঙ্গভঙ্গ কবিয়া জনসমাজে উপনীত করিতে কিছুমাত্র ক্রুটি করিতেছে না। যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই নাটক বলিয়া প্রচার করিতেছেন ; এবং এমত লোকও বর্তমান হইয়াছে, যাহারা দুর্ভিক্ষকেও নাটকের পদার্থ বলিয়া কাগজ নষ্ট করিয়াছে।"[৩৮] দুর্ভিক্ষ নাট্যরচনার বিষয় হতে পাবে না—এমন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তদানীন্তন শিক্ষিত বাঙালীর মনোভঙ্গী স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে।

ধর্ম, দেশপ্রেম ও সমাজ সংস্কার সম্পর্কে নাট্যকারদের চিন্তা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকে অভিব্যক্ত হয়েছে। এর মধ্যে আবার ধর্মপ্রধান হয়ে সকল শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কেননা গিরিশচন্দ্রের ভাষায়—"হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।"[৩৯] রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙালী মনীষীদের কর্মপ্রচেষ্টা অনুধাবন করলে গিরিশচন্দ্রের এ উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে। এঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর সম্ভবত বিরল ব্যতিক্রম। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ ধর্মের যে যুগোপযোগী নবীকরণ করে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, গিরিশচন্দ্রে তা ছিলো অনুপস্থিত এবং গিরিশচন্দ্রই বাঙলা নাটকের প্রধানতম পুরুষ বলে সমকালে অভিনন্দিত। অর্থাৎ বাঙলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে বাঙলা নাটকের যে মেলবন্ধন আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের প্রথম পুরুষ মধুসূদন গড়ে তুলেছিলেন, গিরিশচন্দ্র তাকে পৃথক

করলেন। বাঙলা সাহিত্যে নাটক কি সেজন্যেই অন্যান্য শাখার তুলনায় দুর্বল বলে পরিগণিত হয়েছে? কিন্তু গিরিশচন্দ্রের উপায় ছিলো না। তাঁর যুগপরিবেশ ও শ্রেণীবৈশিষ্ট্য তাঁকে প্রচলিত আন্দোলন ও দর্শকসমাজকে অনুসরণ করতে বাধ্য করেছিলো। পুরাণের ধর্মধারণার পরিপন্থী 'পাষাণী' রচনা করে দ্বিজেন্দ্রলাল বিকৃত হয়েছিলেন। ষ্টার থিয়েটারের তৎকালীন অধ্যক্ষ অমৃতলাল বসু সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রধান পুরুষ ও গিরিশচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য—দ্বিজেন্দ্রলালকে জানিয়েছিলেন—"ঐ নাটকের (পাষাণীর) পাত্রপাত্রীদের নাম পরিবর্তন করিয়া কাল্পনিক নাম দিলে তিনি ঐ নাটিকা অভিনয় করিতে পারেন—নতুবা নহে।"[৪০] আশ্চর্যের বিষয়, মাত্র কয়েক বছর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায় অনুরূপ কারণেই রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন। 'পাষাণী' রচনাকালে দ্বিজেন্দ্রলাল সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার নন, কিন্তু 'চিত্রাঙ্গদা' সমালোচনাকালে দ্বিজেন্দ্রলালের নাম গিরিশচন্দ্রের পাশেই উচ্চারিত। তবে কি সাধারণ রঙ্গালয়-অনুসৃত মনোভঙ্গী ও ধর্মাদর্শ দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রভাবিত করে 'চিত্রাঙ্গদা' সমালোচনায় প্রবৃত্ত করেছিলো?

পূর্বেই বলা হয়েছে, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের কাছে বাঙালী দর্শকের দাবী ছিলো 'নৈতিক অনুশাসন', 'সমাজ সংস্কার' ও 'দেশের হিতসাধন'। সোমপ্রকাশ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত অধিকাংশ নাটক দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন—"এরূপ রচনাপূর্ণ গ্রন্থদ্বারা সমাজের উপকার না হইয়া রুচিবিকাররূপ অপকার ঘটিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা,"[৪১] এবং আশা প্রকাশ করেছিলেন "রঙ্গভূমির পুনরুজ্জীবনে আনুষঙ্গিক দেশের অনেক উন্নতি হইবে এবং ভাল ভাল নাটকের অভিনয় হইলে দেশের ধর্মনীতির ও উন্নতি হইতে পারে।"[৪২] ভালো নাটকের একমাত্র লক্ষণ হলো 'ধর্মনীতির প্রচার'—এটাই লক্ষণীয়। তাই ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটারের 'সীতার বনবাস' অভিনয় দেখে সোমপ্রকাশ যখন লেখেন "...অতি সুন্দর অভিনয় দর্শনে আমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে এই রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ অন্তরের সহিত যত্ন পাইলে ইহাকে অচিরকালের মধ্যেই বিশেষ উন্নতিশালী করিতে পারেন"[৪৩] তখন তৎকালীন বাঙলা নাট্য আন্দোলনের পটভূমি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে এটাও লক্ষণীয়, পূর্ণাঙ্গ নাটক রচয়িতা হিসাবে গিরিশচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এবং সে বছর তাঁর রচিত ছয়খানি নাটকের মধ্যে চারখানিই পৌরাণিক অর্থাৎ "ধর্মনীতি'র প্রকাশক। ধর্মনৈতিক অনুশাসন শুধু যে পৌরাণিক নাটকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তা নয়, সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকও এ অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমেই গিরিশচন্দ্র প্রমুখ নাট্যকারবৃন্দ 'সমাজ সংস্কার' ও 'দেশের হিতসাধন' করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যে সকল ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছলো তারও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো 'দেশের হিতসাধন'। অর্থাৎ দর্শকের রুচি ও চাহিদা এবং নাট্যকারদের প্রবণতা ও প্রতিভা এক কেন্দ্রবিন্দুতে মিলে একটি বিশেষ নাট্যান্দোলন সম্ভব করেছিলো—যার ফসল বাঙলা নাট্যসাহিত্য।

একথা ঠিক, প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তাঁর সমকালীন দর্শককে তৃপ্ত করেই কালজয়ী নাটক রচনা করে থাকেন। এলিজাবেথীয় দর্শক যা ভালোবাসতেন, শেকস্‌পীয়র তাঁর নাটকে তা প্রচুর পরিমাণে পরিবেষণ করেছিলেন। 'হ্যামলেট' নাটকটিকে বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায়—প্রেতাত্মা হত্যা, আত্মহত্যা, তলোয়ার খেলা, মড়ার মাথা, কামান গর্জন, প্রতিশোধ, জিঘাংসা, বিষপ্রয়োগ অর্থাৎ এলিজাবেথীয় দর্শকের যা কিছু বিষয় প্রিয় তার প্রচুর সমাবেশ, কিন্তু তার মধ্যেই শেকস্‌পীরীয় প্রতিভা মানব চরিত্রের জটিল দ্বন্দ্ব, অনন্ত জিজ্ঞাসা, অসীম উপলব্ধি ও অনন্যসাধারণ কবিত্ব সহযোগে তাকে বিশ্বসাহিত্যের বিস্ময় করে তুলেছে। এই বাহ্য আড়ম্বর ও দৃশ্যময়তা শেকস্‌পীয়রের নাটককে 'য়্যুনিভার্সাল' করে তোলে নি, বরং সমকালকে তৃপ্ত করেও তিনি শ্রেণীসীমানা বা class line অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তিনি কালোত্তীর্ণ ও য়্যুনিভার্সাল।[৪৪] পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ঠ লেখক শ্রেণীসীমানা বা class line অতিক্রম করেই কালোত্তীর্ণ ও য়্যুনিভার্সাল হতে পারেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র প্রমুখ বঙ্গ রঙ্গালয়ের নাট্যকারগণ সমকালীন দর্শকরুচির কাছে শুধু আত্মসমর্পণই করেছেন, class line পেরিয়ে যাবার কোনো প্রচেষ্টা তাঁদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। তাই তাঁদের রচনা য়্যুনিভার্সাল হতে পারে নি। কালোত্তীর্ণও হতে পেরেছে কি? মধুসূদনের নাটক এখনো যে অর্থে আধুনিক, গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল-অমৃতলালের রচনা সে অর্থে আধুনিক বলে মনে হয় কি? গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সশ্রদ্ধ উক্তি ও বহুভাষাবিদ হরিনাথ দে'র উৎসাহী মন্তব্য সত্ত্বেও এ প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক হবে সন্দেহ নেই।

সাত

১৯১২ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র সংসার রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রলাল। গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের তিরোধানে বাঙলা নাট্যরচনার একটি যুগের অবসান হলো। উনিশশো এগারোতে অতুল মিত্র ও উনিশশো ষোলোতে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে নাট্যপ্রযোজনা ও অভিনয় ক্ষেত্রেও শূন্যতার সৃষ্টি হ'ল। বিগত যুগের নাট্যকারদের মধ্যে রইলেন অমৃতলাল বসু ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং অভিনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) ও অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গিরিশচন্দ্রের তিরোধানের পর মঞ্চের প্রয়োজনেই অভিনেতা অপরেশচন্দ্র নাট্যকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর রচিত প্রথম নাটক অভিনীত হয় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। উনিশশো বারোর পর অমৃতলাল বসু তাঁর জীবনের শেষ সতেরো বছরে মাত্র চারখানি নাটক রচনা করেছিলেন এবং সমালোচকের মতে সেগুলো বিষয়বস্তু বা রচনারীতিতে তাঁর পুরোনো নাট্যকীর্তিকে অতিক্রম করে যেতে পারে নি। অতএব সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রথম সারির নাট্যকারদের মধ্যে রইলেন একমাত্র

ক্ষীরোদপ্রসাদ। তাই এটি আকস্মিক নয় যে পরবর্তী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজক ও অভিনেতা শিশিরকুমার ভাতুড়ী পেশাদার রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' অবলম্বন করে।

গত অধ্যায়ে বলা হয়েছে, বাঙলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে তৃতীয় পর্ব (১৯১২ ১৯৪২) পূর্বতনের অনুকারী যুগ এবং তুলনামূলকভাবে বন্ধ্যা যুগ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলো এর অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না। ডঃ সুকুমার সেনের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য এপ্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তিনি অবশ্য সমকালীন বিশ্বসাহিত্যেই নাট্যরচনার দুর্বলতার কথা বলেছেন এবং কারণ হিসেবে লিখেছেন—"ছাপা বইয়ের প্রচলন হইবার পরে এবং পাঠ্যগল্প উপন্যাস চালু হইবার ফলে শ্রব্য রচনার অপেক্ষা পাঠ্য রচনার প্রতি লোকের অনুরাগ বাড়িয়াছে। সুতরাং সাহিত্যরস জোগানিয়া হিসাবে নাটকের আদর ও কদর কমিয়াছে। তাহার উপর সিনেমা আসিয়া পড়ায় নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্র দিন দিন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। এইসব কারণে নাটকরচনায় সাহিত্যিকদের উৎসাহ নাই।'[৪৫] ডঃ সেনের মতের মধ্যে কিছু সত্য থাকলেও উক্তপবে বাঙলা নাটকের দুর্বলতা নির্ণয়ে তাঁর প্রদর্শিত কারণগুলো যথেষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ নয়। ছাপা গল্প উপন্যাসের তুলনায় ছাপা নাটকের কদর কম ঠিকই কিন্তু পাঠ্যহিসেবে না হলেও দৃশ্যহিসেবে নাটকের জনপ্রিয়তা সে সময়ে কমেছিলো বা আদৌ কমে কিনা বিচার্য। সিনেমার আবির্ভাবে নাটকরচনা ও নাট্যপ্রযোজনায় সর্বদেশেই ভাঁটা পড়ে, কিন্তু তা অত্যন্ত সাময়িক। কেননা নাটকের যে প্রাণশক্তি আছে তা সকল বিরোধিতা ও বিপর্যয়কে অতিক্রম করে আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন নাট্যসমালোচক এরিক বেণ্ট্‌লে এবিষয়ে বিশদ আলোচনা[৪৬] করে দেখিয়েছেন সিনেমা নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হতে পারে না। সিনেমা জনপ্রিয় হবার পরেও সমগ্র বিশ্বে নাট্যসাহিত্যের বিরাট অগ্রগতি ডঃ সেনের মতের সমর্থন করে না। আলোচ্য তৃতীয় পর্বের সময় সীমার মধ্যে বিশ্বসাহিত্যে বেশ কিছু প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার আবির্ভূত হয়েছিলেন যাঁদের রচনা কালজয়ী মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। অন্যসকলের কথা ছেড়ে দিলেও এপ্রসঙ্গে আমেরিকার ও'নীল, স্পেনের লোরকা, আয়ার্ল্যাণ্ডের ও'কেসী ও ইয়েটস, ইংল্যাণ্ডে বার্ণার্ড শ, জার্মানীর বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের কথা বলা যায়। কাজেই সারা বিশ্বের নাট্যসাহিত্যেই তখন বন্ধ্যাত্ব চলছিলো এ তথ্য যুক্তিবহ নয়। আসলে এপর্বে বাঙলা নাট্যরচনার পুচ্ছানুসারিতার কারণ অন্যত্র, তা সমকালীন বাঙলার বিশেষ সমাজ বিন্যাস ও দর্শক মানসিকতার গভীরে নিহিত।

পূর্বেই বলা হয়েছে বাঙলার পাবলিক থিয়েটার মূলতঃ ছিলো মধ্যবিত্তের থিয়েটার। তাকে আশ্রয় করে যে নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠেছিলো তা মধ্যবিত্ত মানসিকতাকেই

প্রকাশ করেছিলো। আলোচ্য পর্বে বাঙালী মধ্যবিত্ত ভুবনে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হলো। উনিশ শতকীয় যে মূল্যবোধ নিয়ে বাঙালী মধ্যবিত্ত মানসিকতা গড়ে উঠেছিলো তা নানা কারণে বিপর্যস্ত হ'ল। বিশেষজ্ঞের ভাষায়—"প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তব বিকাশপথ রুদ্ধ হয় নাই। একদিকে এই পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সংস্কৃতি, অন্যদিকে ভারতীয় ঐতিহ্যের মানস সম্পদ, একদিকে সামন্তনীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা, অন্যদিকে নিষ্ক্রিয় ভিক্ষানীতির স্বদেশীতে অরুচি, তৃতীয়ত, আপন পারিবারিক ধারারও বিশিষ্ট দান,—এই সকলের পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়াছিলো রবীন্দ্রনাথে। ...তবু তাঁহারই জীবনকালে স্পষ্ট হইয়া উঠে—কত সামান্য বনিয়াদের উপর বাঙালীর এই কালচার গঠিত। উহার গোড়ার 'ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রার' মৃত্তিকাহীন শুষ্কতা ক্রমশ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। · প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পরে বাঙালী শিক্ষিতদের শ্রেণীতে বেকারদশা গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ভদ্রলোকের জীবিকায় প্রবল দাবীদার হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল নব্যশিক্ষিত বাঙালী মুসলমান, নবজাত মুসলমান মধ্যবিত্ত (ও মুষ্টিমেয় নিম্নবর্ণ শিক্ষিত হিন্দু)। এই মধ্যবিত্তের চাকরির কাড়াকাড়িই মূলত বাড়িতে বাড়িতে দাঁড়াইল সম্প্রদায়িক মারামারিতে। ১৯২১-এর পর হইতে তাই বাঙালী 'ভদ্রলোকের' মনে মধুসূদন বঙ্কিমযুগের সেই প্রবল আত্মবিশ্বাসের স্থান কোথায় ছিলো? সবল মানসিকতা তখন আর টিঁকে নাই। তাহার পল্লীসভ্যতা তখন একেবারে ভাঙিয়া পড়িতেছে, অনেক পূর্বেই ব্যবসার ক্ষেত্রে তাহার স্থান সে নিজেই ত্যাগ করিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেও তাহার আসন ধ্বসিয়া যাইতেছে। এদিকে শিল্পক্ষেত্রে নিজের প্রবেশ পথও তাহার অগোচর। যে কালচারের গোড়ায় উপকরণগত স্থিরতা নাই, যাহার পরিবেশে সমাজগত পুষ্টি নাই,—শুধুমাত্র মানসিক আবেগকে সম্বল করিয়া মাত্র জনাকয় চাকুরের ও উকিলের ডাক্তারের প্রয়াসে যাহা রূপ পাইয়াছিলো, সেই 'বাঙলার কালচার' যে উনিশ শত ত্রিশের পরে তাহার শেষ পাদে আসিয়াই পৌঁছিয়াছিলো, তাহাতে সন্দেহ ছিলো না।"[৪৭] উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলো কিন্তু এর মাধ্যমে তৎকালীন সাংস্কৃতিক উপকরণের বিপর্যয়ের চিত্রটি স্পষ্ট হলো সন্দেহ নেই। পূর্ব অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। পুরোনো মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হয়েছে কিন্তু কোনো নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠেনি। তখনকার যুগ-সংকট ও সমস্যার তাৎপর্য অনুধাবনে নাট্যকারেরা ছিলেন উদাসীন ও ব্যর্থ। যে ভাঙন সমাজ শরীরে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে নাট্যকারেরা তা অনুধাবনে অক্ষম হলেন। সে ভাঙনের চিত্র কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের সংকেতিক নাটকে অত্যন্ত তির্যকভাবে প্রতিফলিত হয়েছিলো, কিন্তু তার মধ্যেও local colour ছিলো অনুপস্থিত। সমকালীন বঙ্গরঙ্গমঞ্চ সে নাটকগুলোকেও অস্বীকার করেছিলো। 'নাচঘর' পত্রিকায় ১৩ই ভাদ্র ১৩৩১ সালের সংখ্যায় উল্লিখিত হয়েছে—"রসিক সমাজকে আজ আমরা আর একটি আনন্দ সংবাদ দিতে চাই। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগ্রহে শিশিরকুমার তাঁর নূতন

ও অপূর্ব নাটক 'রক্তকরবী' অভিনয় করবার অধিকার পেয়েছেন।...এ শ্রেণীর নাটক বাঙলা রঙ্গালয়ে আর-কখনো অভিনীত হন নি এবং শীঘ্র হ'তও কিনা সন্দেহ, কারণ প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে এখন এরকম নাটক অভিনয় করে সফল হবার শক্তি, সাহস ও প্রতিভা আছে একমাত্র শিশিরকুমারেরই। পরন্তু 'রক্তকরবীর' অভিনয়েও শিশির কুমার যদি তাঁর অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন, তবে বাঙলার নাট্যজগতে যথার্থ নবযুগের প্রবর্তন হবে। আমরা সাগ্রহে সেই মহেন্দ্র ক্ষণের প্রতীক্ষায় রইলুম।"[৪৮] কিন্তু আমরা জানি সে সম্ভাবনা সে যুগে কখনো ফলপ্রসূ হয়নি। এবং হলেও নিঃসন্দেহে দর্শক প্রশংসাধন্য হতো না। ষ্টার থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের 'গৃহ প্রবেশ' প্রযোজনা করেছিলেন, প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী। রসিকজনের কাছে অভিনন্দিত হলেও তা দর্শক কৃপালাভে বঞ্চিত হয়েছিলো, ফলে নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষায় স্বভাবতই পেশাদার মঞ্চের কর্তৃপক্ষ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন নি।

আট

আলোচ্য পর্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এ যুগ সর্বতোভাবে অভিনেতার যুগ। আলমগীর প্রযোজনার মাধ্যমে ম্যাডাম থিয়েটারের অধীনে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন নরেশচন্দ্র মিত্র, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ দিকপাল অভিনেতৃবর্গ। নাট্য প্রযোজনায় যুগান্তর এলো। "এই সময়ে থিয়েটারে অনেক দিক দিয়ে পরিবর্তন এসেছে দেখা যায়,—সকলেই বুঝেছেন যে কম খরচে থিয়েটার চালানোর দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। অভিনেতা অভিনেত্রীদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে, প্রদর্শনী মূল্য আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে এবং এবিষয়ে প্রথম পথ প্রদর্শন করেন শিশিরকুমার। নাট্যমন্দিরেই প্রথম টিকিটের দাম দু টাকা-চার টাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচ টাকা-দশ টাকা করা হয়। এবং এই রঙ্গালয়েই সর্বপ্রথম আট আনার গ্যালারি তুলে দেওয়া হয়, শিশিরকুমারের থিয়েটারে পেছনের আসন কখনো এক টাকার কম পাওয়া যেত না।"[৪৯] এবং সেই সঙ্গে প্রযোজনার খরচও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। "ক্লাসিক থিয়েটার খোলবার আগে ষ্টারের মাসিক খরচ ছিল সাত আটশ টাকা। আর্ট থিয়েটার যখন পুরোদামে চলেছে তখন খরচ দাঁড়িয়েছে মাসে বারো হাজার টাকার উপর।"[৫০] অথচ এ যুগেই মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি উনিশ শতকের তুলনায় প্রচণ্ডভাবে দেখা দেয় এবং জাতীয় ও মাথাপিছু আয় নিদারুণ হ্রাস পায়। জমির উপসত্ব থেকে মধ্যবিত্তের যে আয় হতো তাও সংকুচিত হয়ে যায়। কিন্তু বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক মানসিকতায় রয়ে গেলেন তাঁদের প্রতিষ্ঠিত পুরোনো স্বর্গে। সাম্প্রতিক কালে J. H Broomfield তখনকার ভদ্রলোক শ্রেণীর সংকট নিয়ে বিশদ আলোচনা

নাট্য – ৪

করেছেন।[৫১] কাজেই সমালোচক যখন লেখেন—'বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে শিশিরকুমারের মতো একজন বিদগ্ধ প্রতিভাবান নট যে পুরাণকে আশ্রয় করে আত্ম-প্রকাশ করবেন, এটা সত্যই ভাবতে কেমন লাগে। যুগোপযোগী বলিষ্ঠ ও সমাজ সচেতন একটি নাটক মঞ্চে উপস্থাপিত করে নাট্যশালা থেকে ভাবের স্রোতমুখ তিনি পরিবর্তন করে দেবেন, এই তো ছিলো আমাদের প্রত্যাশা। কিন্তু দেখা গেল সেই যুগেই নাট্যমন্দির ও আর্ট থিয়েটার নূতন করে রামায়ণ-মহাভারতের স্রোতকে রঙ্গমঞ্চে প্রবাহিত করে নিয়ে এলেন। থিয়েটারে নব যুগ এলো সত্য, কিন্তু নাটকের দিক দিয়ে অভিনবত্ব কিছুই এলো না''[৫২]—তখন এ মন্তব্যের গভীরে যে কারণগুলো আছে তা অনিবার্যভাবেই বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। অর্থাৎ যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী দর্শকের মানসিকতার গুণগত কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি বলেই শিশির-কুমারকে পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছিল এবং তার অভিনীত ও প্রযোজিত অধিকাংশ নাটকই গতানুগতিক হতে বাধ্য হয়েছিলো। একদিকে মধ্যবিত্তের আয় হ্রাস, অন্যদিকে টিকেটের মূল্যবৃদ্ধি—তার ওপর যদ আবার এমন নাটক উপস্থাপিত করা হয় যা দর্শক কৃপালাভে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা, তাতে নাট্যব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাতে সন্দেহ নেই। নাট্যব্যবসায়ীদের সঙ্গে শিশির-কুমারের বিরোধের কথা ঐতিহাসিক সত্য এবং পরিণামে যে শিশিরকুমার পরাজিত হয়েছিলেন তা অজানা নয়। ব্যবসায়ী থিয়েটারকে অস্বীকার করে সত্যিকার আর্ট থিয়েটার প্রবর্তনার মাধ্যমে নতুন যুগোপযোগী নিজস্ব দর্শক বা প্রয়োজন হলে লিটল থিয়েটার মুভমেণ্ট সুরু করা শিশিরকুমারের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই যথার্থ কোনো নাট্যান্দোলন তাঁর দ্বারা সংগঠিত হয়েছিলো কি না সন্দেহ। কেননা নাট্যা-ন্দোলন হবে অথচ তার দ্বারা কোনো নতুন নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠবে না এ অবস্থা সঙ্গত ও স্বাভাবিক হতে পারে না।

নয়

এ পর্বে নাট্যসমালোচনার একটি বিশেষ লক্ষণ হল এই যে সাহিত্য হিসেবে নাটকের বিচার অপেক্ষা অভিনেতা ও অভিনয়ের আলোচনাই হয়েছে অধিক। শিশিরকুমার ভাদুড়ী একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুধী দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন প্রচণ্ড। তাঁর অভিনয়ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে সমকালীন শ্রেষ্ঠ কবি কাব্যরচনা করেছেন যা সম্ভবত পূর্ববর্তীকালে কোন অভিনেতার ভাগ্যে জোটে নি। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ প্রখ্যাত সাহিত্যিকদেরও প্রশংসাধন্য হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু যেসকল নাট্যপ্রযোজনার মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, সামান্য কয়েকটি ব্যতীত তাদের সাহিত্যমূল্য অকিঞ্চিৎকর। 'সীতা' প্রযোজনা দেখে সমকালীন দর্শক

উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন কিন্তু সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তার নাটকত্ব নিয়ে বিশেষ কেউ প্রশ্ন তোলেন নি। 'সীতা' সম্পর্কে আলোচনাতেও লক্ষ্য করা যায় সাহিত্য হিসেবে তার বিচার অপেক্ষা প্রযোজনা ও অভিনয় নিয়েই আলোড়ন হয়েছে বেশী। নাটক শুধু সাহিত্য নয়, প্রযোজনাও তার একটি প্রধান অংশ—একথা ঠিক, কিন্তু কেবলমাত্র প্রযোজনার প্রতি পক্ষপাতিত্ব নিঃসন্দেহে দুর্বলতার পরিচায়ক। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে শ্রেষ্ঠ কাব্যে শব্দ ও অর্থ পরস্পর প্রতিস্পর্ধী। শব্দ ও অর্থের পারস্পারিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেই নিহিত থাকে রসচর্বনার উপাদান। এ সূত্রের অনুসরণ করে বলা যায়, নাটকেও সাহিত্যমূল্য ও প্রযোজনা প্রতিস্পর্ধী এবং এদের মধ্যে তুলনায় যে কোনো একটি দুর্বল হলে রসচর্বনায় ব্যাঘাত হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই সমালোচকেরা যখন একটিকে অবহেলা করে অন্যটি সম্পর্কে অধিক মনোযোগী হন, তখন তার মাধ্যমে মূলতঃ দুর্বলতাই প্রকাশিত হয়। অতুলকৃষ্ণ চৌধুরী নামক জনৈক প্রবন্ধকার ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছেন—'নাটক ও নাট্যকলা যে সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ তাহা আমরা স্বীকার করিতে চাহি না, এমন কি অনেকে মনে করেন, তাহাতে সাহিত্যের শুচিতা নষ্ট হয়। তাই বাঙলা সাহিত্যে এ সম্বন্ধে রীতিমত সমালোচনার অবকাশ নাই।......রচনযুগের পরেই সমালোচন যুগের আগমন, যাহা রচিত হইয়াছে তাহার যথাযোগ্য মূল্য নিরূপণ-করতঃ নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার জন্য এবং পরবর্তী লেখকের সম্মুখে আদর্শের চিত্র জাজ্বল্যমান করিবার জন্য। সুতরাং সমালোচনযুগের পরই রচনযুগের আগমন স্বাভাবিক। বাঙলা নাট্যসাহিত্যে আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যদি গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত রচনযুগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে, তবে তাহা যেন সমালোচনযুগের সূচনা করে। আশা করা যায় এই সমালোচন যুগের রীতিমত সাময়িক সদ্ব্যবহার দ্বারা আমরা উৎকৃষ্ট রচন যুগকে আহ্বান করিয়া আনিতে পারিব।"[৫৩] কিন্তু লেখকের এ আশা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি।

অবশ্য সমকালীন পত্রপত্রিকায় নাটকের এই দুর্বলতা সম্পর্কে আলোচনা অপ্রাপ্য নয়। শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় বি. এস সি রচিত 'দধীচি' নামক দৃশ্যকাব্য সমালোচনায় 'মানসী' পত্রিকা মন্তব্য করছে—"রঙ্গমঞ্চওয়ালারা যাহা খোঁজেন অর্থাৎ ভাল ভাল ম্যাজিক, তাহা ত এ নাটকে যথেষ্টই রহিয়াছে। যথা—

(১) বিশ্বরূপের মস্তকত্রয় ছেদন।

অকস্মাৎ মধ্যমস্তক হইতে বৃত্রাসুর, দক্ষিণ ও বাম মস্তক হইতে যথাক্রমে তরবারি ও কমণ্ডলুর উত্থান (২ পৃ)

(২) অকস্মাৎ নন্দীর সম্মুখে বিল্ববৃক্ষের উত্থান, ধ্যানমগ্ন নন্দী (১৫পৃ)

(৩) অকস্মাৎ নদীবক্ষ হইতে সরস্বতীর উত্থান (২৫পৃ)

(৪) অকস্মাৎ মধ্যগগনে শিবের কমণ্ডলুর আবির্ভাব (২৭পৃ)

এইরূপ রাশি রাশি 'অকস্মাৎ' এই নাটকখানির মধ্যে আছে। মাঝে মাঝে

অপ্সরাগণ, দৈত্যবালাগণ আসিয়া নাচিয়া গাহিয়াও যাইতেছেন। সবই তো আছে—অভাব কিসের? অভাব কেবল অন্নবস্ত্রের, কবিত্বের ও নাট্যকলার।"[৫৪] সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত অন্য একটি নাটক সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে—"আমরা লক্ষ্য করিলাম—স্থানে স্থানে লেখক 'থিয়েটারি' ঢঙের মায়া কাটাইতে পারেন নাই। 'থিয়েটারের নাটকওয়ালা'গণকে আদর্শ না করিয়া বাঙলা সংস্কৃত ইংরেজী উচ্চশ্রেণীর নাট্যসাহিত্যকে যোগেন্দ্রবাবু যদি আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করেন তবে আমাদের বিশ্বাস তাঁহার হস্ত হইতে ক্রমে আমরা যথার্থ ভাল জিনিস পাইতে পারিব।"[৫৫] অর্থাৎ 'থিয়েটারি ঢঙ' ও 'থিয়েটারের নাটকওয়ালা' সম্পর্কে সমকালীন শিক্ষিতরুচির বিশেষ উচ্চধারণা ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'নাট্যভারতী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে[৫৬] কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য লক্ষ্য করা যায়। উক্ত সম্পাদকীয়তে দীর্ঘ আলোচনায় আমাদের দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্য যে "আনন্দ দানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও সমাজের শিক্ষা ও মঙ্গল", কেবলমাত্র অর্থোপার্জন নয় এবং "যুবকমহোদয় যাহাতে নিঃসঙ্কোচে অভিনয় দর্শন করতে পারেন, এরূপ নাটক গীতিনাটকাদির যাহাতে সাধারণ রঙ্গালয়ে বহুল প্রচলন হয়"—এরূপ আশা প্রকাশ করা হয়েছে। এ সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে—"সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে অধুনা যেসকল অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ নাটক গীতিনাটকাদির অভিনয় হইতেছে, সেই সকল গ্রন্থাবলীর অভিনয় বন্ধ করিবার জন্য আলোচনা ও যত্ন করা। এইরূপ শ্রেণীর গ্রন্থসকলের মধ্যে কতকগুলি আবার এরূপ ভয়ানক যে……ইহাতে সর্বসাধারণের ও সমাজের ক্ষতি ও অবনতি অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে জনসাধারণের মতি নীচগামী হয়, রুচি পরিবর্তন এবং উন্নতির আশা সমূলে বিনষ্ট হয়। অতএব এইরূপ শ্রেণীর পুস্তকাবলীর অভিনয় যাহাতে আদৌ না হয়, সেজন্য রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করা এবং এরূপ পুস্তকের বন্ধের নিমিত্ত বিশেষভাবে আলোচনা যত্ন করা। এই কার্য সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত কলিকাতার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইবে এবং মধ্যে মধ্যে এই "নাট্যশাস্ত্র-সংবাদ-পত্রিকা" কার্যালয়ে উক্ত কমিটির অধিবেশন হইবে। উক্ত অধিবেশনে বিখ্যাত বিখ্যাত বক্তাগণ নাট্যপ্রসঙ্গ লইয়া বক্তৃতা করিবেন এবং কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল পুস্তকাবলী যাহাতে জনসমাজে আবির্ভূত হইতে না পারে, সেই সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিবেন।"[৫৭] কিন্তু উক্ত কমিটি গঠিত হয়েছিলো কিনা এবং গঠিত হলেও কারা তার সভ্য ছিলেন জানা যায় না। সম্ভবত 'নাট্যপ্রতিভা'র মনোবাসনা পূর্ণ হয় নি। কিন্তু এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমকালীন শিক্ষিত বাঙালীর নাট্যসাহিত্য ও প্রযোজনা নিয়ে উদ্বেগের প্রমাণ মেলে। 'নাট্যপ্রতিভা'র এ সম্পাদকীয় লেখা হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে। অনতিবিলম্বেই সাধারণ রঙ্গালয়ে

বাঙলা নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে যুগান্তর এসেছিলো সন্দেহ নেই কিন্তু নাটকরচনা বিষয়ে যে বিশেষ পরিবর্তন আসে নি, তা বলা যায়। এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে[৫৮] সমকালীন সাধারণ রঙ্গালয়েরও যে চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে তা আশাব্যঞ্জক নয়। প্রবন্ধকার কোন্ বিশেষ রঙ্গালয় সম্পর্কে লিখেছেন তা উল্লেখ করেন নি। সেখানকার প্রধান অভিনেতা নিজেকে Indian Garrick বলে ঘোষণা করে থাকেন কিন্তু He could not articulate the words properly, he had no idea of stops, he rattled away—his figure was too heavy and his movement too slow for the stage, yet he played the prince and strutted and bellowed on the stage, tearing a passion to tatters, to very rags, to split the ears of the groundlings, who for the most part are capable of nothing but inexplicable dumb show and noise. এ আলোচনার লক্ষ্য কি দানীবাবু? এ প্রবন্ধে অভিনেত্রী ও নর্তকীদের সম্বন্ধেও অনুরূপ কটু মন্তব্য করা হয়েছে। তাছাড়া The new recruits to the Bengali stage are a few B. As anb M. As of Calcutta University অর্থাৎ শিশির ভাদুড়ী প্রমুখদের সম্পর্কেও লেখকের বিতৃষ্ণা প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে তাঁর মন্তব্যগুলো অতিশয়োক্তিপূর্ণ ও উন্নাসিকতার নামান্তর মনে হলেও তিনি যখন লেখেন—"The Bangali stage needs improving. It has to be reformed, reconstructed, renovated and remodelled. It is extremely unfortunate that it has not been given the encouragement and the consideration it deserves. It has been neglected and thus has failed to capture the best talents of society—" তখন তাঁর যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। সে যুগের best talentদের মধ্যে অন্ততঃ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন নি। কেবলমাত্র শরৎচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ জনপ্রিয় হয়েছিল, যতটা না তাদের নাট্যগুণের জন্য, তার চাইতে অনেক বেশী শিশিরকুমারের অভিনয়-চমৎকারিত্বে।

দশ

আসলে গিরিশোত্তর যুগে মৃতপ্রায় মঞ্চকে পুনরুজ্জীবিত করলেন শিশিরকুমার তাঁর প্রয়োগ ও অভিনয় নৈপুণ্যে। কিন্তু বাঙলানাটক পুনরুজ্জীবিত হলো না। সাহিত্য একজনের সৃষ্টি, নাট্যকলা বহুজনের। আমাদের নাট্যকলা যেহেতু বরাবরই মধ্যবিত্তের মুখাপেক্ষী, তাই তার মধ্যে দুর্বলতা আগে থেকেই ছিলো, কেননা "শুধু মধ্যবিত্তের আসরও নাট্যকলা সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত আসর নয়। তাতেও আবার শিশির-কুমার যখন এলেন তখন সেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে ভাঙ্গন ধরেছে—বাঙলার

মধ্যবিত্তদের তখন নিজের শক্তিতেও আস্থা নেই।.........শিশিরকুমারের 'মধ্যবিত্ত' বাঙলা নাট্যকলা সৃষ্টির চেষ্টা—শিক্ষিত ভদ্রবাঙালীর জন্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা খানিকটার বেশি তাই সার্থক হতে পারলো না। কারণ নাট্যকলা অমন একটা সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে সবল ও স্বাভাবিক শ্রীলাভ করতে পারে না—বিশেষত যখন তার আসল সামাজিক পরিবেশ আগেকার মতোই রয়েছে প্রতিকূল, অন্যদিকে নূতনকালের সবাক চিত্র এসে তাকে সকলক্ষেত্রেই কোনঠাসা করেছে।"[৫৯]

বাঙলা নাট্যকলা এই মধ্যবিত্ত গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি পেয়েছিলো গণনাট্যের নতুনতর পটবিন্যাসে। কিন্তু গণনাট্য আমাদের দেশে কোন্ ধরণের নাট্যোন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলো তাতে নাট্য সাহিত্য ও প্রযোজনা কতটা লাভবান হয়েছিলো—সে প্রসঙ্গ বর্তমান প্রবন্ধ সীমার বাইরে।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বহুদিন ধরেই উপলব্ধি করেছিলেন বাঙলার লোকনাট্য ও যাত্রার মধ্যে যে জনসংযোগের সুযোগ আছে তাকে স্বীকরণ করে নিয়ে একটি নতুন ইন্‌টেলেক-চুয়েল নাট্যান্দোলনের প্রয়োজনীয়তা। সমকালীন দর্শকের শিল্পচেতনার অভাব লক্ষ্য করেই সম্ভবতঃ তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন—"স্ত্রৈণ স্বামী যেমন লোকের কাছে উপহাস পায়, নাটক তেমনি যদি অভিনয়ের অপেক্ষা করিয়া আপনাকে নানাদিকে খর্ব করে, তবে সেও সেইরূপ উপহাসের যোগ্য হইয়া উঠে। নাটকের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে, আমার যদি অভিনয় হয় তো হউক, না হয় তো অভিনয়ের পোড়া কপাল—আমার কোনোই ক্ষতি নাই।"[৬০] সাধারণ রঙ্গালয়ের অলীক কুনাট্য রঙ্গ ও দর্শকবৃন্দের রসবোধের অভাব দেখেই রবীন্দ্রনাথ এরূপ উক্তি করেছিলেন, তা নিঃসন্দেহ। কেননা তিনি নিজেও জানতেন যে প্রযোজনার কষ্টিপাথরেই নাটকের নাটকত্ব যাচাই হয়, নাহলে সারা জীবন তিনি নাট্য প্রযোজনা নিয়ে অত চিন্তা ও পরিশ্রম করতেন না। তবে তাঁর লক্ষ্য থাকতো শিল্পরসের প্রতি, সাধারণ দর্শকের রুচি ও চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করে নাট্যকলাকে তিনি অগভীর ও লোকরঞ্জক করে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন না। শুধু তাই নয়, সমকালীন সাধারণ রঙ্গালয়ে শিল্পরীতির ব্যভিচার দেখে তিনি সেকালেই 'লিট্‌ল্ থিয়েটার' আন্দোলন এদেশে চালু করা যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন। 'নাচঘর' পত্রিকায় প্রকাশিত[৬১] এ সম্পর্কে রবীন্দ্রচিন্তন বিশ্লেষণ করলে কতগুলো বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটি যখন প্রকাশিত হয়েছিলো, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের আবির্ভাবের পর দীর্ঘ ছয় বছর তখন কেটে গেছে। সমকালীন সুধীবৃন্দের শিশির প্রশস্তির পাশে রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্য পাঠ করে প্রশ্ন জাগে—তবে কি সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণা শিশির প্রতিভা বিন্দুমাত্র দূর করতে পারে নি? নইলে কি করে লিখলেন "যার মনে রসবোধ ও কলাজ্ঞান আছে" সাধারণ রঙ্গালয় তাঁদের কাছে অগম্য। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ রঙ্গালয়ের নাটকগুলো যেমন 'ললিতকলার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য'বিহীন, তেমনি তার

অভিনেতারা একই নাটকে বার বার অভিনয়ে নামতে বাধ্য থাকেন বলে "প্রকৃত শিল্পীর প্রাণ এই একঘেয়ে জীবনের ভিতর সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।" কাজেই রঙ্গালয়ে কোনো নাটক দীর্ঘ দিন চালানো উচিত নয়। যে ধরণের রঙ্গালয়ের কথা তিনি চিন্তা করেছেন তা "অবশ্য সর্বসাধারণের সাহায্য নিতে পারে না।" তাই অন্ততঃ দুশোজন গুণগ্রাহী রসিকের প্রয়োজন, যাঁদের কাছে মাসে দশ টাকা চাঁদা নিয়ে এ রঙ্গালয়ের কার্য নির্বাহ হবে। তৃতীয়তঃ, এখানে দর্শক হবে নির্বাচিত ব্যক্তি, তাই রঙ্গালয় বিশেষ বড়ো না হলেও চলবে অর্থাৎ "পাশ্চাত্ত্য দেশে 'লিট্‌ল্ থিয়েটার' নামে যে প্রেক্ষাগারগুলি আছে এই অতিরিক্ত রঙ্গালয় সেই আদর্শেই প্রতিষ্ঠিত হবে।" চতুর্থতঃ, সাধারণ দর্শকের মুখাপেক্ষী যেহেতু এ রঙ্গালয় হবে না, সেহেতু "এখানে যে সব নাটক নির্বাচিত হবে, কলারসিকের উন্নত মনে তা ভাবের রেখাপাত করতে পারবে," কেননা, "সর্বসাধারণের উপযোগী নয় বলে যেসব উঁচুদরের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অচল, এখানে অনায়াসেই সেইসব নাটকের অভিনয় সম্ভব হবে।" অর্থাৎ সাধারণ রঙ্গালয়ে যে সকল নাটক অভিনীত হয় তা "উঁচুদরের নয়।" এবং কেবলমাত্র তাহলেই সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে, সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখা ও তার জন্য নাটক লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সে আশা ফলপ্রসূ হয় নি। অথচ শিশিরকুমারের আবির্ভাবের পর সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তাঁকে যথেষ্ট সচেষ্ট হতে দেখা যায়, যা আগের যুগে কখনোই সম্ভব ছিলো না। শিশিরকুমারের ক্ষমতার প্রতি তাঁর আস্থা ছিলো, তাঁকে তিনি স্নেহ করতেন প্রচুর। তাছাড়া 'ষ্টার থিয়েটারে' যখন 'চিরকুমার সভা' ও 'গৃহপ্রবেশ' অভিনীত হয় তিনি তার প্রশংসা করেছিলেন ও সেখানকার অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে প্রযোজনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু তবু তৎকালীন সাধারণ রঙ্গালয় (এবং এখনো) রবীন্দ্র প্রতিভাস্পর্শ থেকে বঞ্চিত থেকে গেছে বলা যায়। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের আদর্শ ও রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট কখনোই এক কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মেলে নি। বিশেষত সমকালীন দর্শক রুচির কাছে রবীন্দ্রমননের গভীরতা, সূক্ষ্মসৌন্দর্য ও কাব্যরস ছিলো অনধিগম্য। তাছাড়া, যে যুগসংকট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জগতে আশঙ্কার ছায়া বিস্তার করেছিলো সে সম্পর্কে তখনকার সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্ত ছিলেন মূলত অজ্ঞ ও নিস্পৃহ। অথচ সেকালীন বাঙলা নাট্য সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্র নাটকেই তার সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটেছিলো। কিন্তু বাঙালী দর্শকের কাছে তা বিশেষ কোনো আবেদন জাগাতে সক্ষম হয় নি। অর্থাৎ উনিশ শতকে মধ্যবিত্ত বাঙালী মানসে যে মূল্যবোধ অর্জন করেছিলো, বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে অনিবার্য কারণেই তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো, পরিবর্তে তখনো কোনো নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে নি, তাই বাঙলা নাটকে কোনো নতুন সুর বেজে ওঠে নি। সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় যা

সম্ভব নাট্যসাহিত্যে তা সর্বদা সম্ভব নয়। কেন না কাব্য উপন্যাসের রচনার মূলে যুগ পরিবেশ কাজ করলেও তা প্রধানত লেখকের একার সৃষ্টি। কিন্তু নাটক সর্বদাই বৃহৎ দর্শক শ্রেণীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগে গড়ে ওঠে, তাকে অস্বীকার করে নাট্যরচনা চলে না। তাই যুগের সবলতা বা দুর্বলতা নাট্য সাহিত্যেই প্রকট হয় সর্বাধিক। তাই যে সংকট ও ভাঙন সমাজে অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছিলো, নাট্যকার ও দর্শকমন তার তাৎপর্য অনুধাবনে অক্ষম হবার ফলে সাধারণ রঙ্গলায়ের কোনো নাটকে তার প্রতিফলন দেখা যায় না। সমকালীন যুগসংকট নিয়ে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি নাটক রচিত হয়েছিলো—নাটকটির নাম 'দেবোত্তর বিশ্বনাট্য', লেখিকা শ্রীসরযূ বালা দাশগুপ্তা। অবশ্য এটিও একটি সাংকেতিক নাটক। এটি কোনো সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হতে দেখি না এবং সম্ভবত অভিনয়যোগ্যও নয়। কিন্তু নাটকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রখ্যাত সমালোচক অজিত কুমার চক্রবর্তী নাটকটির দীর্ঘ আলোচনা করে মন্তব্য করেছিলে—"পৃথিবীতে আজ মানুষের কোনো সমস্যাই কোনো দেশ বিশেষে আবদ্ধ হইয়া নাই; ন্যূনাধিক পরিমাণে সব সমস্যাই সকল দেশে দেখা দিতেছে। বিশ্বমানবকে এখন আর দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে পারি না; সে দেখা সত্য দেখা হয় না। কোনো দেশই একলা বিশ্বমানবের কোনো বড় সমস্যার সমাধান করিতে পারে না, সে সমাধানের জন্য সকল দেশের সহায়তা চাই। ধনী ও শ্রমীর সমস্যা কি কেবল ইউরোপে আছে, ভারতবর্ষে নাই? আমাদের দেশকে যদি বাণিজ্য ব্যাপারে বিশ্বের হাটে মহাজনী করিতে হয়, তবে আমাদের 'বনগাঁ'গুলিও 'নবনগরে' পরিণত হইবে, আমাদের চাষীগুলিকেও শ্রমী হইতে হইবে। তখন জমিদারের সঙ্গে শ্রমীর যে সংঘাত তাহা অবশ্যম্ভাবী। মিল ও কারখানা প্রভৃতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এইসব সমস্যা দেখা দিয়াছে এবং ক্রমশঃ আরও বেশি করিয়া দেখা দিবে। তখন ইউরোপে যে 'কুরুক্ষেত্র' লড়াই বহুকাল ধরিয়া বাঁধিয়াছে এবং আজও চলিতেছে, সেই কুরুক্ষেত্র লড়াই এখানেও বাঁধিবে।...এই নাটকে উদঘাটিত একটি দৃশ্যও তখন অদ্ভুত বা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক বলা চলিবে না।"[৬২] সাহিত্যকর্ম হিসেবে নাটকটি সার্থক হয়েছিলো কিনা অথবা তার অভিনয়যোগ্যতা কতটা ছিলো—সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর, শুধুমাত্র নাট্যকারের সমকালীন যুগসংকটকে নাটকে প্রতিফলিত করবার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকারগণ এধরণের সামান্যতম প্রচেষ্টা থেকে সর্বদাই বিরত ছিলেন। ফলে নাটক কখনোই নতুন যুগোপযোগী হয়ে জনরুচি নির্মাণে সমর্থ হয় নি। সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকারদের পক্ষে তা সম্ভবও ছিলো না। প্রথমত তাঁরা সাধারণত সমকালে বাস করতেন না; দ্বিতীয়ত তাঁদের দর্শক শ্রেণী সমাজের সংকট ও ভাঙন সম্পর্কে ছিলেন অনবহিত। তাই তাঁদের মানস অভিজ্ঞতার বহির্ভূত কোনো নতুন ধরণের নাটক তারা স্বভাবতই বর্জন করতেন। সে কারণেই এ পর্বের নাট্যরচনা গতানুগতিকতা ও অবক্ষয়ে জীর্ণ।

আধুনিক যুগের বিখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায় এ পর্বেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁর রচিত প্রথম নাটক 'মুক্তির ডাক' অভিনীত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। 'মুক্তির ডাক' একহিসেবে রঙ্গালয়ে নতুন যুগের সূচনা করেছিলো। তখন সাধারণত রঙ্গালয়ে নাটক অভিনীত হত পাঁচঘন্টা ধরে। 'মুক্তির ডাক' অভিনয়ে সময় লেগেছিল মাত্র দেড়ঘন্টা এবং সেটি ছিলো একটি একাঙ্ক নাটক। সাধারণ রঙ্গালয়ে তৎকালীন অচলায়তনে এ পরিবর্তন সাধন সামান্য নয়। সমকালীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-রসিকদের কাছে 'মুক্তির ডাক' অভিনন্দিত হয়েছিলো। প্রমথ চৌধুরী নাট্যকারকে লিখেছিলেন—"আপনার নাটকখানির মহাগুণ এই যে এখানি যথার্থই একখানি drama। বাঙলা সাহিত্যে নাটক একরকম নেই বললেই হয়'। আশাকরি, আমাদের সাহিত্যের এ অভাব পূর্ণ করবেন।" কিন্তু মন্মথরায়কেও সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রতিষ্ঠা পেতে 'চাঁদসদাগর', 'দেবাসুর', 'কারাগার' বা 'মহুয়া' 'মীরকাশিমের' শরণাপন্ন হতে হয়েছিলো। কেন না, প্রচলিত পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক জগতের বাইরে পদচারণা তখন সহজ ছিলো না। মন্মথ রায়ের কৃতিত্ব এই যে তিনি প্রচলিত ধারাকে অবলম্বন করেও যুগোপযোগী নতুন রস বিতরণে কিছুটা সক্ষম হয়েছিলেন।

১ কুমুদবন্ধু সেন : গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য (রসচক্র সাহিত্য সংসদ ১৩৪২) পৃ ৭১
২ তদেব : পৃ ৭০
৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড (বিশ্বভারতী ১৩৬৩) পৃ ৬৩৮
৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস পৃ ৮২-৮৩
৫ হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত : ভারতীয় নাট্যমঞ্চ ২য় খণ্ড (গিরিশ নাট্য সংসদ, ১৯৪৭) পৃ ৪৬
৬ Hemendranath Dasgupta : The Indian stage Vol II (1938) P 210
৭ হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত : ভারতীয় নাট্যমঞ্চ ২য় খণ্ড পৃ ৭১
৮ William Digby : Prosperous British India (1903) P. 534 & P. 553
৯ বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (পাঠভবন ১৯৬৮) পৃ ৯০-৯১
১০ সোম প্রকাশ ১৯ ফাল্গুণ ১২৮০ : সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র : বিনয় ঘোষ ৪র্থ খণ্ড (পাঠভবন, ১৯৬৬) পৃ ৬৮৭
১১ বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা পৃ ১৮৭-১৮৮
১২ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : গিরিশচন্দ্র (১৩৩৪) পৃ ২৫৮
১৩ কুমুদবন্ধু সেন : গিরিশচন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য পৃ ১৯
১৪ তদেব : পৃ ২১
১৫ তদেব পৃ ৫১
১৬ A.C. Bradley : Oxford Lectures on Poetry (Macmillan 1965 edn.) P 392
১৭ Louis Harap : Social Roots of Arts (International Publishers 1949) P 43
১৮ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড (সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৬) পৃ ১২
১৯ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস পৃ ৪

২০ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদ পত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩৫৬) পৃ ১৪০-১৪৭
২১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদ পত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড (ঐ ১৩৫৬) পৃ ২৭৯-২৮৭
২২ বিনয় ঘোষ : সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র ৪র্থ খণ্ড পৃ ২৬৩
২৩ .ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য : নাটক ও নাটকের অভিনয় (১৩২৭) পৃ ৭২
২৪ নবকৃষ্ণ ঘোষ : দ্বিজেন্দ্রলাল ২য় সংস্করণ [ভট্টাচার্য এণ্ড সন ১৩৩৬] পৃ ১৩৮
২৫ প্রফুল্ল কুমার সরকার : বঙ্গদর্শন (১৩২০ জ্যৈষ্ঠ)
২৬ কুমুদবন্ধু সেন : গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য পৃ ৭২
২৭ তদেব : পৃ ৩১
২৮ ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় : বঙ্গীয় নাট্যশালা (১৩১৬) পৃ ৬
২৯ বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে সমাজ চিত্র ৪র্থ খণ্ড পৃ ৬১৭-৬২২
৩০ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস পৃ ১৪১
৩১ বিনয় ঘোষ : সাময়িক পত্রে সমাজ চিত্র পৃ ৬৯৩
৩২ হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত : গিরিশচন্দ্র (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৮) পৃ ১১৪
৩৩ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ : বাংলা নাটকের ইতিহাস পৃ ১৫৩ ১৫৪
৩৪ হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত : ভারতীয় নাট্যমঞ্চ ২য় খণ্ড পৃ ১৯৭
৩৫ কুমুদবন্ধু সেন : গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য পৃ ৭২
৩৬ E.C. Pettit : Shakespeare and the Romance Tradition (Staples Press 1949) P 91-92
৩৭ E.C. Pettit : Op. Cit. P 11
৩৮ বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা : পৃ ২১১
৩৯ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস পৃ ৫৯
৪০ গিরিশ রচনাবলী : প্রথম খণ্ড (সাহিত্য সংসদ ১৯৬৯) পৃ ৭৩২
৪১ নবকৃষ্ণ ঘোষ : দ্বিজেন্দ্রলাল পৃ ১০০
৪২ বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলাব সমাজ চিত্র ৪র্থ খণ্ড পৃ ৬৮৫
৪৩ তদেব : পৃ ৬৮৮
৪৪ তদেব : পৃ ৬৯৩
৪৫ Louis Harap : Op Cit. P 43
৪৬ ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ খণ্ড পৃ ২৮৫
৪৭ Eric Bentley : Playwright as Thinker (Meridian Books 1957) P 8-16
৪৮ গোপাল হালদার : সংস্কৃতির রূপান্তর (ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী ১৯৬৫) পৃ ২৪২-২৪৩
৪৯ নাচঘর ১৩ই ভাদ্র ১৩৩১ বহুরূপী ২৬ সংখ্যায় উদ্ধৃত (অক্টোবর ১৯৬৬) পৃ ৮
৫০ মনি বাগচি : শিশিরকুমার ও বাঙলা থিয়েটার (জিজ্ঞাসা ১৯৬০) পৃ ২১১
৫১ সূত্রধর : অথ নট ঘটিত (বসুধারা প্রকাশনী ১৩৬৭) পৃ ১৫২
৫২ J.H. Broomfield : Elite Conflict in Plural Society, Twentieth Century Bengal (University of California Press 1968) P 317
৫৩ মনি বাগচি : শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার পৃ ১৫২
৫৪ মানসী ও মর্মবাণী (ফাল্গুন ১৩২৯) পৃ ৮-১০

৫৫ মানসী (৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—৫ম সংখ্যা, পৌষ ১৩২২) পৃ ৫৯৮

৫৬ মানসী (৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—৫ম সংখ্যা, পৌষ ১৩২২) পৃ ৫৯৭-৫৯৮

৫৭ নাট্য প্রতিভা (১ম বর্ষ ফাল্গুণ ১৩২৫ প্রথম সংখ্যা) পৃ ৩-৭

৫৮ তদেব

৫৯ S. C. Mukherjee : The Bengal Stage—Some Impressions (Modern Review for September 1925)

৬০ গোপাল হালদার : বাঙালী সংস্কৃতির রূপ (অগ্রণী বুক ক্লাব ১ম সংস্করণ ১৩৫৪) পৃ ১৭৯ [উদ্ধৃতাংশ রঙ্গীন হালদারের লেখা]

৬১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রঙ্গমঞ্চ [রবীন্দ্র রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড : পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৩৬৮] পৃ ৭৪৩

৬২ নাচঘর ৩রা জুন ১৯২৭ [গন্ধর্ব রবীন্দ্রনাট্য সংখ্যা ১৯৬১-তে উদ্ধৃত পৃ ৭২-৭৩]

৬৩ অজিতকুমার চক্রবর্তী : দেবোত্তর বিশ্বনাট্য (প্রবাসী ১৩২৩ ভাদ্র) পৃ ৪৮২-৪৮৩

৬৪ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড পৃ ২৪

———

তৃতীয় অধ্যায়

ঐতিহ্য : গ্রহণ ও অর্জন

এক

প্রথম বাঙলা মৌলিক নাটক রচিত হয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। প্রাপ্ত তালিকায়[১] দেখা যায় তার পূর্বে বাঙলা নাটক রচিত হয়েছে মোট ছয়টি। তার মধ্যে একটি ইংরেজী থেকে ও পাঁচটি সংস্কৃত থেকে পূর্ণ বা আংশিক অনুবাদ। একমাত্র নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে অভিনীত 'বিদ্যাসুন্দর' পালাটি কার রচিত জানা যায় নি, কিন্তু তা যে সংস্কৃত বা ইংরেজী থেকে অনূদিত নয় তা স্বতঃসিদ্ধ। কুলীনকুলসর্বস্ব প্রথম অভিনীত মৌলিক বাঙলা নাটক—রচনাকাল ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। তখন পর্যন্ত বাঙলানাটকের সংখ্যা দশ। পূর্বোক্ত ছয়টি ব্যতীত বাকী চারটির মধ্যে দুটি শেকসপীয়র অবলম্বনে রচিত। অর্থাৎ বাঙলা নাটকের সৃষ্টিলগ্নে সংস্কৃত নাট্যাদর্শের প্রভাব ও প্রতাপ লক্ষ্য করার মতো। তাই 'ভদ্রার্জ্জুন' ও 'কীর্তিবিলাস' নাটকের রচয়িতাদ্বয়কে দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিলো নতুন নাট্যাদর্শ অবলম্বনের কারণ দেখিয়ে। তারাচরণ শিকদার লিখেছেন—"এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্যপদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটকসম্মত কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই, যথা প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য এবং বিদূষক ইত্যাদি।"[২] অবশ্য তাঁর পরবর্তী সিদ্ধান্ত—"এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইওরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে"[৩] —গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে লক্ষণীয় এই যে প্রথানুগত্য থেকে সামান্য বিচ্যুতি নাট্যকারদের নিশ্চয়ই চিন্তিত করে তুলেছিলো। বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজেডি রচয়িতা যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্তকে তাই ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী রসসৃজনের প্রাক্কালে দীর্ঘ ভূমিকা[৪] লিখে তাঁর প্রচেষ্টাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিলো। রামনারায়ণ তর্করত্ন সমকালীন সমস্যা নাটকে এনেছিলেন কিন্তু সংস্কৃত নাট্যরীতির মাধ্যমে। অর্থাৎ বাঙলা নাটক কোন্ পন্থানুকারী হবে সে সম্পর্কে প্রথম দিকে নাট্যকারগণ ছিলেন দ্বিধান্বিত। এবং এটিও কম বিশেষত্বপূর্ণ নয় যে ইংরেজী আদর্শে রচিত বা শেকসপীয়র অবলম্বনে লিখিত নাটকগুলো প্রথম পর্যায়ে অভিনীত হয় নি। অর্থাৎ চিন্তার দিক দিয়ে নতুন সম্ভাবনা দেখা গেলেও কর্মপ্রচেষ্টায় তখনো তার বিশেষ প্রতিফলন ঘটে নি। ১৮৫৮/৫৯

খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা নাট্যসাহিত্যে আবির্ভূত হলেন মধুসূদন। তাঁর বজ্রদীপ্ত ঘোষণা—"If I should live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan[৫] মধুসূদনের মাধ্যমে বাঙলা নাটক সর্বপ্রথম প্রতীচ্যরীতিকে সার্থকভাবে আত্মস্থ করতে সক্ষম হলো। অবশ্য এখানে প্রতীচ্যরীতি বলতে প্রধানতঃ এলিজাবেথীয় ও গৌণতঃ গ্রীক নাট্যসাহিত্যকে ধরা হচ্ছে। সমকালীন ইয়োরোপীয় নাট্যসাহিত্যের অগ্রগতি ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বাঙলা নাটকের বিশেষ কোন যোগ ছিলো না।

দুই

সংস্কৃত নাটক রসভাবসমন্বিত দৃশ্যকাব্য। ভরত মুনির ভাষায় "কর্মভাবান্বয়াপেক্ষী নাট্যবেদো ময়াকৃতম্।"[৬] এখানে কর্ম বলতে ইওরোপীয় action বা ক্রিয়া বোঝাচ্ছে না। ধনঞ্জয় তাঁর দশরূপকে নাট্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন—

অবস্থানুকৃতির্নাট্যম্ রূপম দৃশ্যতয়োচ্যতে।
রূপকম্ তৎ সমারোপাদ্ দশধৈব রসাশ্রয়ম ॥[৭]

এসকল সংজ্ঞায় রসের প্রতি মনস্কতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যকে 'রূপক' অভিধায় অভিহিত করার কারণ হিসেবে সাহিত্যদর্পণকার লিখেছেন যে "তদ্ দৃশ্যং কাব্যং নটে রামাদিস্বরূপারোপাদ্ রূপকমিত্যুচ্যতে" অর্থাৎ "দৃশ্যকাব্যকে রূপক বলা হয় এই কারণে যে ইহাতে নটের উপর রাম প্রভৃতির স্বরূপের আরোপ হয়।"[৮] এ ব্যাখ্যা স্বীকার করেও বলা যায় যে নাট্যকারের অন্বিষ্ট অমূর্ত ভাবগুলো অবলম্বিত চরিত্রের মধ্যে রূপ পায় বলেই সম্ভবত সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যকে রূপক বলে অভিহিত করা হয়েছিলো। যাই হোক, সংস্কৃত নাটকে ভাব ও রস প্রধানতম বিষয় এবং সেজন্যই ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে ভাব ও রস সম্পর্কে দীর্ঘ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য ছিলো প্রধানত রাজসভাশ্রিত কঠোর ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুশাসনে তার প্রাণস্পন্দন নিয়ন্ত্রিত। তাই সে বিচিত্রগামী। তরঙ্গমন্দ্রিত বৃহত্তর জনজীবন সেখানে ছিলো উপেক্ষিত, তাই তার মধ্যে গভীরতা থাকলেও ছিলো না ব্যাপকতা। এবং প্রাণহীন প্রথানুসারে তা ক্রমে হয়ে উঠেছিলো কৃত্রিম ও অভিঘাতশূন্য। তাই বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতার পুরোহিত মধুসূদনের নবযুগস্পান্দত প্রতিভা সংস্কৃত নাটকের ম্রিয়মানতায় স্ফূর্তিলাভ করে নি। তাঁর পত্রাবলীর নানাস্থানে তার প্রমাণ রয়েছে। "Look at the splendid Shakespearean Drama. If you leave out the Mid Summer Night's Dream, Romeo and Juliet and perhaps one or two more, what play would deserve the name of Romantic? Romantic in the sense in which Sacoontala is Romantic? In the great European

Drama, you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romamce—[৯] অর্থাৎ সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে ইয়োরোপীয় বিশেষত শেকসপীরীয় নাটকের মূল পার্থক্য কোথায়, মধুসূদনের নাট্যদৃষ্টি তা নির্ভুল নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছিলো। এবং তাঁর মানস প্রবণতা যে শেকসপীয়র অভিমুখী ওপরের উদ্ধৃতিতে তা ব্যক্ত হয়েছে। যোগেন্দ্রচন্দ্র, তারাচরণ বা হরচন্দ্র ঘোষ যে প্রচেষ্টা সুরু করেছিলেন, মধুসূদন তাকে বাস্তব ও ফলপ্রসূ করে তুললেন। সুরু হলো বাঙলা নাটকের প্রতিষ্ঠাপর্ব। অবশ্য মধুসূদনের নাটকে বিশেষতঃ শর্মিষ্ঠায় সংস্কৃত নাট্যরীতির উল্লেখযোগ্য প্রভাব অলক্ষ্য নয়, তবু এ মন্তব্য অসমীচীন হবে না যে সংস্কৃত নাট্যাদর্শ থেকে ইয়োরোপীয় তথা শেকসপীরীয় নাট্যরীতিতে উত্তরণ প্রথম মধুসূদন দ্বারাই সার্থকভাবে সম্ভব হয়েছিলো। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালও প্রতীচ্য নাটক বিশেষ করে শেকসপীয়রের কাছে তাঁদের ঋণের কথা ঘোষণা করেছিলেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথও তাঁর নাট্য-জীবনের প্রথম পর্বে 'মালিনী'র ভূমিকায় জানিয়েছিলেন—"শেকসপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবরের আদর্শ। তার বহু শাখায়িত বৈচিত্র্য ব্যাপ্তি ঘাত-প্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।"

অবশ্য বাঙলা নাটক রচনায় সর্বাংশে শেকসপীয়র অনুসৃতি সম্ভব নয়, সে সম্পর্কে মধুসূদন প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। কেননা—তাঁর ভাষায়—"In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment···The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems."[১০] এবং সে কারণেই তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে সতর্ক করে দিয়ে লিখেছেন—I have certain Dramatic notions of my own, which I follow invariably. Some of my friends—and I fancy you are among them—as soon as they see a Drama of mine, begin to apply the cannons of criticism that have been given forth by the masterpieces of William Shakespeare.[১১] এই সঙ্গে একথাও জানাচ্ছেন—I write under very different circumstances. Our social and moral developments are of a different character.[১২]

শেকসপীরীয় তথা এলিজাবেথীয় নাটকের বিশেষত্ব নিয়ে এখানে সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। এলিজাবেথীয় নাট্যসাহিত্যের সমগ্র বিশেষত্ব চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছিলো শেকসপীয়রের রচনাবলীতে। এলিজাবেথীয় নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে Janet Spens তাঁর Elizabethan Drama গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন।

শেকসপীয়রের নাটককে বিশেষজ্ঞগণ তিনটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকেন—Comedies, Histories and Tragedies। এদের মধ্যে কমেডি সম্পর্কে Janet Spens লিখছেন—It may be suggested that his intent was to present a picture of an harmonious society in which each person's individuality is fully developed and yet is in perfect tune with all the others.[১৩] অতঃপর শেকসপীয়রের ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত—"History plays seem in Shakespeare's hands to represent the compromise of life. They may end in catastrophe or in triumph, but the catastrophe is apt to be undignified and the triumph won at a price. Again, we may say that in the Histories Shakespeare is dealing with the nation as hero. The hero in this case is immortal and his tale cannot be a true tragedy, while on the other hand there can never be true comedy feeling of an established and final harmony Apart from Shakespearean Histories are almost entirely inspired by patriotism, often of a rather rabid type.[১৪]

শেকসপীরীয় প্রতিভা, সমালোচকগণ বলে থাকেন, চরমসীমা স্পর্শ করেছিলো তাঁর ট্র্যাজেডি রচনায়। এই Tragedy-র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে Janet Spens-য়ের মতামত সবশেষে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখছেন—

1. Tragedy must end in some tremendous catastrophe involving in Elizabethan practice the death of the principle character.

2. The catastrophe must not be the result of mere accident, but must be brought about by some essential trait in the character of the hero acting either directly or through its effect on other persons.

3. The hero must nevertheless have in him something which outweighs his defects and interests us in him so that we care for his fate more than for anything else in the play.[১৫]

এ সকল উক্তি অনুধাবন করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় বাঙালী নাট্যকারদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেকসপীরীয় নাট্যরীতি তাঁরা সম্পূর্ণ করায়ত্ব করতে সক্ষম হন নি এবং তা সম্ভবও ছিলো না। এ প্রসঙ্গে মধুসূদনের সতর্কবাণী আবার স্মরণ করা যেতে পারে—Our Social and moral developments are of a different

character. শেকসপীয়রের সঙ্গে বাঙালী সমাজ ও লোকমানসের ছিলো দুস্তর ব্যবধান—কালগত এবং যুগগত। এলিজাবেথীয় রেনেসাঁস ইংরেজ জাতির জীবনে যে বিপুল কর্মোদ্দীপনা ও উল্লাস তরঙ্গ উত্থিত করেছিলো—পূর্বেই বলা হয়েছে—তা জ্ঞানে ও কর্মে উদ্ভাসিত হয়ে এক নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছিলো যার চরমতম প্রকাশ এলিজাবেথীয় নাট্যসাহিত্য। রেনেসাঁসের মানুষ বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করে যে বিমুগ্ধ বিস্ময় অনুভব করেছিলো তার সপ্তবর্ণ-সমারোহ যেন শেকসপীয়রের নাটকে ভাবে ও ভাষায় স্পন্দিত হয়ে উঠেছিলো। বাঙালী জীবনের অর্ধস্ফুট রেনেসাঁসের পক্ষে কখনো সে স্পন্দন স্বীকরণ করা সম্ভব ছিলো না। তাই শেকসপীরীয় প্রভাব বাঙলা নাটকে যতটা বহিরঙ্গ ততটা আভ্যন্তরীণ হয়ে উঠতে পেরেছিলো কি না সন্দেহ। বরং বলা যেতে পারে বঙ্কিম প্রতিভা তাঁর উপন্যাসে শেকসপীয়রকে যতটা আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলো, বাঙলা নাট্যসাহিত্যে তার সমতুল্য সিদ্ধি লক্ষ্য করা যায় না।

তিন

প্রতীচ্য নাট্যরীতি যখন বাঙলা নাটককে সঠিক পথ নির্দেশে দ্বিধান্বিত ঠিক্য সেই সময়ে সুরু হলো হিন্দু পুনরুত্থানবাদের যুগ। মধুসূদন দীনবন্ধু যার জন্ম গিরিগাত্র খননে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, মনোমোহন গিরিশচন্দ্র দেশীয় যাত্রার মধ্যে পেলেন সেই স্রোতস্বিনী। প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, বাহুল্য ভয়ে এখানে তার পুনরুক্তি করা হলো না। পাশ্চাত্ত্য থিয়েটারের সঙ্গে দেশীয় যাত্রা মিলিত হয়ে যে নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠলো তা পূর্ণতা পেলো গিরিশ-চন্দ্রে। অবশ্য যাত্রাই বিবর্তনের পথে আধুনিক থিয়েটারে রূপান্তরিত হয়েছিলো সমালোচক মন্মথমোহন বসুর এ সিদ্ধান্ত[১৬] সঠিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তবু তিনি যখন বলেন—"বিলাতী ধরণের রঙ্গমঞ্চের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্ম তাঁহারা নাটকের বাহ্য গঠণপ্রণালী শেকসপীয়ারাদির রীতি অল্লাধিক পরিমাণে অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নাটকের ভিতরের বস্তু সম্বন্ধে জাতীয় আদর্শ গ্রহণ করাই তাঁহারা শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা বেশ জানিতেন, যে নাটকের সহিত জাতির নাড়ীর সংযোগ নাই, তাহা কখন জনসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না"[১৭]—তখন তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা চলে না। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক প্রবোধচন্দ্র সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য…indigenous drama that fashioned the national mind for centuries could not fail to exercise its influence on the new drama. This influcnce particularly noticeable in the works of the well kown play-

wright and actor, Girish Chandra Ghosh (1844-1912), and can be traced even to the plays of Rabindranath Tagore.[১৮]

সমালোচকের এ উক্তি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। বাঙলা নাট্যজগতের দুই ধারা পেশাদার ও সৌখিন রঙ্গমঞ্চের দুই শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বকীয় পদ্ধতিতে যাত্রার সমীপবর্তী হয়েছিলেন তার তাৎপর্য অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অবশ্য যাত্রা বাঙালী নাট্যকারদের কাছে প্রথম পর্যায়ে প্রিয়তর প্রতিভাত হয়েছিলো প্রধানত তার গীতিবহুলতার জন্য। মনোমোহন বসুর উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে "যাত্রাওয়ালারা সুসিদ্ধ হয়, তাহার কারণ কেবল তাহাদের গান ভিন্ন আর কিছুই না।"[১৯] এ বিষয়ে 'কুপিত কৌশিক' নামক নাট্যগ্রন্থের ভূমিকাটি বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। আর্য ক্ষেমীশ্বর প্রণীত 'চণ্ড কৌশিক' অবলম্বনে নাটকটি রচনা করেছিলেন রামগতি ন্যায়রত্ন। গ্রন্থটির প্রকাশ কাল ১২৮৫ সাল (১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র তখনো নাট্যকার হিসেবে পূর্ণ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেন নি। নামপত্রে নাট্যকার উল্লেখ করেছেন যে নাটকটি "সংস্কৃত হইতে সঙ্কলিত: ৩০টি গীত সমেত।" অতঃপর গ্রন্থের ভূমিকা। সেকালীন একটি বিশেষ মানসের প্রতিফলন প্রমানে ভূমিকাটির দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত হলো: "কোনও স্থলে উপর্য্যুপরি দুই দিন যাত্রা শুনিতে হইয়াছিল। একদিন রামাভিষেক নাটকের যাত্রা—অপরদিন সতী নাটকের যাত্রা।...এ যাত্রা-স্থলে সজ্জিত রঙ্গভূমি ছিল না, এবং মধ্যে মধ্যে গীত ছিল। কিন্তু ঐ গীতগুলি নাটক রচয়িতার স্বরচিত নহে—যাত্রাকারকেরা স্বকার্য্যের সুবিধার জন্য আপনারা রচনা করিয়া লইয়াছেন; এ নিমিত্ত নাটকের সহিত সেগুলির ভালরূপে মিল খায় নাই। তদ্ভিন্ন তাহা সংখ্যাতেও অল্প। এই হেতু গীতপ্রিয় যাত্রা-শ্রোতৃগণের পক্ষে তাদৃশ প্রীতিকর হয় নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল যে, যদি কোনও নাটকে অধিক সংখ্যায় গীত থাকে, তাহা হইলে বোধ হয়, যাত্রা-কারকদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। সেই সুবিধাকরণের অভিপ্রায়েই আর্য্য ক্ষেমীশ্বর-প্রণীত সংস্কৃত চণ্ড কৌশিক নাটক অবলম্বন করিয়া এই কুপিত কৌশিক লিখিত হইল।" (২০) মনোমোহন বসুর রামাভিষেক ও সতী নাটক এমনিতেই যাত্রার লক্ষণাক্রান্ত ও যথেষ্ট সঙ্গীত সম্বলিত কিন্তু যাত্রাকারকেরা তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আরো বেশ কিছু গান "আপনারা রচনা করিয়া লইয়াছেন" এবং কুপিত কৌশিক রচয়িতা রামগতি ন্যায়রত্ন তাতে উৎসাহিত হয়ে সংস্কৃত নাটককে ত্রিশটি গীতসহ যাত্রায় রূপান্তরিত করে একটি বিশেষ যুগলক্ষণ প্রকাশ করেছিলেন। নাট্যকার হিসেবে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের উষালগ্নে এ বৈশিষ্ট্যটিকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে একথাও স্মর্তব্য

যে গীতিবাহুল্য রবীন্দ্রনাটকেরও একটি পরিচিত বৈশিষ্ট্য এবং নাট্যকার রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশও প্রায় সমকালেই সম্পন্ন হয়েছিলো।

চার

এবার বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে কোন্ বিশেষ মনোভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হয়ে গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যাত্রার সমীপবর্তী হয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র বাঙলার জাতীয় নাট্যকার কেননা "তিনি নাট্যরচনার ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর নিজস্ব জাতীয় রস নিবেদন করিয়া বাঙলা নাট্যসাহিত্যকে সর্বপ্রথম যথার্থ জাতীয় গৌরব দান করিলেন।"[২১] এবং "ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম-ধর্ম"—এ ঘোষণা গিরিশচন্দ্রের। ভারতের জাতীয় ধর্মের সন্ধান তিনি যে অনেকাংশে যাত্রাওয়ালাদের কাছ থেকেই অর্জন করেছিলেন এ সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক সত্য। এই ধর্মময়তা পূর্বেই বলা হয়েছে—কেবল তাঁর পৌরাণিক নাটকেই নয়, প্রায় সকল শ্রেণীর নাট্যরসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এবং এই ধর্মময়তা নতুন যুগ প্রভাবিত প্রশ্ন বা সংশয় দ্বারা তাড়িত হয়ে new mythmaking হয়ে ওঠে নি, বরং সকল দ্বিধা দ্বন্দ্বের অতীত এক অগাধ বিশ্বাস সমুদ্রে অবগাহন করে এমন একটি নিজস্ব জগৎ তৈরী করে নিয়েছিলো যা অনেকাংশে যাত্রাদ্বারা অনুপ্রাণিত। সমালোচক এ বৈশিষ্ট্যকেই দেশীয় রস সংস্কার বলেছেন।[২২]

অথচ গিরিশচন্দ্র কিন্তু আঙ্গিকে (technique) যাত্রা দারা বিশেষ অনুপ্রাণিত হন নি। গীতিবহুলতা বা বিদূষক প্রভৃতি কিছু চরিত্র সৃজনে যাত্রার প্রভাব ব্যতীত তাঁর নাটকে প্রধানতঃ শেকসপীরীয় নাট্যরীতির অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। যাত্রায় আরোহ অবরোহ বিশেষ নেই, অভীষ্টরস সৃজনে যাত্রালেখক পর পর কিছু আবেগ সমৃদ্ধ দৃশ্য গ্রন্থন করেন এবং গান তাকে বেষ্টন করে উৎসারিত হয়। প্রসিদ্ধ যাত্রালেখক কৃষ্ণকমল গোস্বামী রচিত বিখ্যাত 'স্বপ্নবিলাস' পালাটি এখানে সামান্য বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বিরহিত ব্রজবাসীর হৃদয় বেদনা নন্দালয়, শ্রীরাধাসদন, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ, কালিন্দী তীরে পরিক্রমা করে শ্রীরাধিকার আকুল ক্রন্দনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এখানে পালার প্রথম পর্বের সমাপ্তি। অতঃপর দ্বিতীয় পর্ব। মথুরার ঐশ্বর্যে অতৃপ্ত রাজা শ্রীকৃষ্ণ "বৃন্দাবনে গমন করিল" এবং তার ফলে বৃন্দাবনবাসীর ভাব সম্মিলন কি বিচিত্র রাগিনীতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো লেখক তার পরিচয় দিয়েছেন নন্দালয়, ব্রজপথ, শ্রীরাধাসদন, সঙ্কেত কানন প্রভৃতি দৃশ্যাবলীর মাধ্যমে। সমাপ্তিতে 'নবদ্বীপের দৃশ্য ভক্তগণের গীতে' রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত চৈতন্য অবতারের বার্তার সঙ্গে দর্শকের পরিচয় করিয়ে পালা রচয়িতা বিদায় নিয়েছেন। পালাটিতে প্রথম থেকেই লেখক যে বিশেষ ভক্তিরসের পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন তা বিভিন্ন চরিত্র ও দৃশ্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে

মাত্র। এ পালাটির আঙ্গিক বিচার প্রসঙ্গে প্রতীচ্য নাটকের অবয়রের তুলনা অবান্তর ও অর্থহীন, এমন কি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের পঞ্চসন্ধি অন্বেষণ করাও অবিধেয়। রসপ্রতীতির দিক দিয়ে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলোর সঙ্গে এই পালাটির মৌল কোনো বিরোধ নেই বলা যায়। কিন্তু অবয়বে বা আঙ্গিকে কোনো দূরান্বয়ী সম্পর্ক উভয়ের মধ্যে স্থাপন করা চলে কিনা সন্দেহ। গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক 'পাণ্ডব গৌরব' বিশ্লেষণ করলে এ সিদ্ধান্ত যথার্থ বলে মনে হবে। পাণ্ডব গৌরব নাটকে সর্বসাকুল্যে পাঁচটি অঙ্ক আছে, তার মধ্যে প্রথম অঙ্কে পাঁচটি গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্কে সাতটি গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্কে পাঁচটি গর্ভাঙ্ক, চতুর্থ অঙ্কে ছয়টি গর্ভাঙ্ক এবং পঞ্চম অঙ্কে সাতটি গর্ভাঙ্ক রয়েছে। তার অপর প্রসিদ্ধ পৌরাণিক 'জনা'তেও অঙ্ক ও গর্ভাঙ্ক বিন্যাস প্রায় অনুরূপ, কেবল বিভিন্ন অঙ্কে গর্ভাঙ্কের সংখ্যা সামান্য কম বেশি এবং পরিশেষে একটি ক্রোড়অঙ্ক যুক্ত করে "অজ্ঞান তিমির বিনাশন। জয় জয় নিত্য নিরঞ্জন।"—এ বাণী প্রচার করা হয়েছে। 'জনা'র এই ক্রোড়অঙ্কটি যেন 'স্বপ্নবিলাসে' শেষ দৃশ্যের সঙ্গে একই উদ্দেশ্যগত ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ। এ ছাড়া 'পাণ্ডব গৌরব' বা 'জনা'র সঙ্গে' 'স্বপ্নবিলাস' বা অন্যান্য প্রচলিত যাত্রার অবয়বগত মিল সামান্য। বরং সমালোচক ব্র্যাড্‌লে কথিত[২৭] শেকস্‌পীরীয় আঙ্গিকের সঙ্গে এ নাটকগুলোর সহজেই তুলনা করা চলে। কেবলমাত্র পঞ্চাঙ্ক বিন্যাস ও দৃশ্য সংস্থাপনায় নয়, শেকসপীরীয় নাটকের অন্যতর কিছু বৈশিষ্ট্যও এদের মধ্যে প্রস্ফুটিত। 'পাণ্ডব গৌরব' বা 'জনা'তেও বলা যায়—নাট্যকার রেখেছেন সে সব State of affairs out of which conflict arises. ব্র্যাড্‌লি সাহেবের মতে এটি নাটকের exposition। অবশ্য শেকস্‌পীরীয় conflict ও গিরিশচন্দ্রের দ্বন্দ্বচেতনা প্রায় বিপরীত প্রান্তবাসী। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে the definite beginning, the growth and the vicissitudes of the conflict. এই অংশটি দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং প্রথম ও পঞ্চম অঙ্কের অনেকাংশ জুড়ে থাকে। জনা, পাণ্ডবগৌরব বা গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য প্রধান নাটকেও তা অলক্ষ্য নয়। অবশেষে final section-এ দেখানো হয়ে থাকে the issue of the conflict in a catastrophe। গিরিশচন্দ্রের নাটকে অনুসৃত এই আরোহ অবরোহ নিঃসন্দেহে শেকস্‌পীরীয় রীতির অনুবর্তন, যাত্রার প্রচলিত রীতির সঙ্গে তার সুদূরতম সম্পর্ক রয়েছে কিনা সন্দেহ।

এ সকল লক্ষণ লক্ষ্য করে প্রখ্যাত গিরিশ-সমালোচক কুমুদবন্ধু সেন যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন: "তাঁহার নাটকের অঙ্কভাগ পাশ্চাত্ত্য নাটকরীতির আদর্শে গঠিত। সংস্কৃত নাটকের পঞ্চসন্ধির মত পাশ্চাত্ত্য নাট্য সাহিত্যেও পঞ্চসন্ধি আছে—যথা (১) Protasis অর্থাৎ নাটকীয় আখ্যানের আরম্ভ, (২) Epitatis বিরুদ্ধগতি, (৩) Catastasis পুষ্টি, (৪) Peri-

pateia বিরাম এবং Catastophe অর্থাৎ পরিসমাপ্তি। এইভাবে অঙ্কবিভাগ করিয়া নাটকের আখ্যানবস্তুকে সাজাইতে হইবে। পাশ্চাত্ত্যেরা তাই তৃতীয় অঙ্ককে নাটকীয় ঘটনার চরম পরিনতি বলিয়া উল্লেখ করে। গিরিশচন্দ্র শেকস্‌পীয়রের রীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন"…[২৪] অবশ্য সমালোচক নির্ধারিত সংস্কৃত ও পাশ্চাত্ত্য পঞ্চসন্ধি প্রকৃতিতে সমশ্রেণীর নয়। সংস্কৃত নাটকের পঞ্চসন্ধিকে বিশেষজ্ঞ নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করেছেন[২৫]—

এক] আরম্ভ+বীজ=মুখসন্ধি

দুই] প্রযত্ন+বিন্দু=প্রতিমুখসন্ধি

তিন] প্রাপ্ত্যাশা+পতাকা=গর্ভসন্ধি

চার] নিয়তাপ্তি+প্রকরী=বিমর্যসন্ধি

পাঁচ] ফলাগম+কার্য=নির্বহণসন্ধি

সংস্কৃত নাটকে 'ফলাগমে' নির্বহণ অতএব ট্র্যাজেডি সেখানে সম্ভব নয়। তাছাড়া এই পঞ্চসন্ধি বহু নাটকে পাঁচটি অঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। সর্বোপরি পাশ্চাত্ত্য নাটকের আরোহ-অবরোহ সংস্কৃত নাটকে সুলভ নয়, কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে—দ্বন্দ্ব নয়, ভাব ও রসই সংস্কৃত নাটকের অন্বিষ্ট। কাজেই পাশ্চাত্ত্য, বিশেষ করে শেকস্‌পীয়রের নাটকের Climax সংস্কৃত নাটকে কখনোই সম্ভব নয়। প্রধানত শেকস্‌পীরীয় নাটক বিশ্লেষণ করেই উনিশ শতকীয় বিখ্যাত জর্মান নাট্যতত্ত্ববিদ্ গুস্তাভ্ ফ্রেতাগ্ তাঁর প্রসিদ্ধ Pyamid structure of drama উদ্ভাবন করেন। পিরামিড চিত্রে যে উর্দ্ধগতি, শীর্ষবিন্দু ও অবনমন বোঝায়, পঞ্চসন্ধির ক্রমাগ্রসরতায় তা বিশেষ আভাষিত হয় না। কাজেই ফ্রেতাগ্ নির্দেশিত five junctures-এর সঙ্গে সংস্কৃত পঞ্চসন্ধিকে সর্বাংশে মিলিয়ে বিচার করা সম্ভবত সঠিক পদ্ধতি নয়। যাই হোক, আমাদের বক্তব্য, গিরিশচন্দ্রের নাটকের বিশেষত পৌরাণিক নাটকের রসব্যঞ্জনায় প্রধানত যাত্রার অভীষ্ট রসই প্রকাশিত হয়েছে। কেননা তাঁর মতে—"ধর্মপ্রাণ হিন্দু ধর্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু—শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জুন, ভীম প্রভৃতিকে চিনে, সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত নায়কই হিন্দুর হৃদয়গ্রাহী হওয়া সম্ভব। যেরূপ বীরচিত্র যুদ্ধপ্রিয় বীরজাতির আদরের, সেইরূপ সহিষ্ণু, আত্মত্যাগী লোক ও ধর্ম্মসম্মানকারী নায়ক, হিন্দু হৃদয়ে স্থান পাইবে।"[২৬] কিন্তু এরকম প্রকাশে তিনি অবলম্বন করেছেন পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতি, শেকস্‌পীরীয় নাট্যাদর্শ। সেজন্যেই কি তিনি বলেছিলেন—"আমি শেকস্‌পীয়রের আদর্শের অনুসরণে নাটক রচনা করেছি। তিনি আমার আদর্শ," নচেৎ তিনি তো সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন যে শেকস্‌পীয়র অনুবর্তন বাঙলা-নাটকে সম্ভব নয় এবং ভিন্ন দেশে "ভিন্ন মস্তিষ্ক-প্রসূত নাটক, ভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।"[২৭]

অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র যখন বাঙলা নাট্যসাহিত্যে আবির্ভূত হলেন তখন নাট্যাঙ্গিকে যাত্রা ও সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের প্রভাব থাকলেও মোটামুটিভাবে ইউরোপীয় প্রধানত শেকস্‌পীরীয় নাট্যরীতিরই আধিপত্য ছিলো। গিরিশচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্বের দুই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মধুসূদন ও দীনবন্ধু সাধারণভাবে পাশ্চাত্ত্য পঞ্চাঙ্ক ও তদনুরূপ আরোহ-অবরোহ যথাসাধ্য মেনে চলেছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁদের প্রদর্শিত সেই রীতিই গ্রহণ করলেন। এবং বাঙালী দর্শকের কাছে সেই রীতি তখন যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছিলো বলা যায়। আবার বিষয়বস্তুতে কখনো ভিন্ন সমতলে বিচরণ করলেও গিরিশচন্দ্র যেখানে স্বস্তি পেতেন সেই পৌরাণিক পরিমণ্ডল ও প্রচলিত ধর্মবোধ তাঁকে বাঙালীর পরিচিত যাত্রাজগতের সঙ্গে গ্রথিত করে দিয়াছিলো। অর্থাৎ বাঙালী দর্শকের অভিজ্ঞতা স্পর্শিত দুটো স্বতন্ত্র ধারা—form ও content-এর ধারা—গিরিশচন্দ্র এক কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিয়েছিলেন এবং সেখানেই নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব।

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথের কাছে বিষয়টি কিন্তু অনুরূপ ছিলো না। মধুসূদন দীনবন্ধু প্রবর্তিত বাঙলা নাটকের অভ্যস্ত পথে রবীন্দ্রনাথ বিচরণ করেছিলেন দীর্ঘদিন। তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'রাজা ও রাণী'তে শেকস্‌পীরীয় রীতিরই অনুবর্তন। দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক 'বিসর্জনে' রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধর্মবোধ ও আদর্শবাদ আধিপত্য বিস্তার করলেও তার নাট্যাঙ্গিক প্রায় 'রাজা ও রাণী'রই অনুরূপ। কিন্তু তার পরেই 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'মালিনী'তে রবীন্দ্রনাথ যেন কিছু ত্রস্ত। ঠিক কোন্ আঙ্গিকে তাঁর প্রতিভা স্ফূর্তিলাভ করবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে যেন দ্বিধান্বিত। 'চিত্রাঙ্গদা' পর পর এগারোটি দৃশ্যে সমাপ্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কোন অঙ্কবিভাগ করেন নি। এ রীতি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য বা শেকস্‌পীয়রের নাটকের সঙ্গে মেলে না এবং তার আরোহণ শীর্ষবিন্দু ও অবরোহণ বাঙালী দর্শকের কাছে অভ্যস্ত ছিলো না। অবশ্য 'মালিনী' নাটকের মধ্যে কোনো কোনো সমালোচক "গ্রীক নাট্যকলার প্রতিরূপ" দেখেছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে সিদ্ধান্ত বিশেষ অনুমোদন করেন নি। তখনো শেকস্‌পীরীয় নাট্যকলার আনুগত্য-ঘোষণায় তিনি নির্দ্বিধ। তবু তিনি যে এরূপ নাট্যপরিবেশে স্বস্তি লাভ করছেন না ক্রমে তা স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'মালিনী' প্রকাশিত হবার পর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম সাংকেতিক নাটক 'শারদোৎসব'এর মধ্যে এই বারো বছর তিনি আর পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন নি। একমাত্র 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নামে ক্ষুদ্র প্রহসনটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'কে ধরে নিলেও প্রায় এগারো বছর রবীন্দ্রনাথ আর নাটক রচনা করেন নি। 'হাস্যকৌতুক' বা 'ব্যঙ্গকৌতুক'কে নিশ্চয়ই পূর্ণাঙ্গ নাটক হিসেবে গ্রহণ করা চলে না। এরূপ দীর্ঘবিরতি রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবনে আর কখনো ঘটে নি এবং এরূপ বিরতি তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক।

'রাজা ও রাণী' থেকে সুরু করে 'মালিনী'র পরিবেশ চিরকালীন—সমকালকে অস্বীকার করেই চিরকালীন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করছিলেন অস্ফুটদ্বন্দ্ব জাতীয় জীবনে অতীত বিহার ক্রমাগত সম্ভব নয়, তাতে নিজেকে অনুকরণের সম্ভাবনাই স্ফীত হয় মাত্র। তাছাড়া, সমকালীন বিশ্বসমস্যা, শ্রেণীসংঘর্ষ, moral ও ethical মূল্যবোধের বিনষ্টি তাঁকে নিরন্তর ব্যথিত ও চিন্তিত করে তুলেছিলো। কিন্তু তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না রূঢ় বাস্তবের ইবসেনী বিক্ষোভ। তাঁর দেশ ও কাল তাঁকে ইউরোপীয় নাট্যধারার ঐতিহ্যের সঙ্গে সমসূত্রে মিলিয়ে দেয় নি এবং তার অনুবর্তন রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন--স্বাভাবিক হতো না। অথচ তাঁকে সমকালীন বিশ্বসমস্যার মধ্যে প্রবেশ করতে হয়েছে। তাই তাঁকে সৃষ্টি করতে হয়েছে এমন একটি জগৎ যে-জগৎ একান্তভাবে আধুনিক। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিজাত আধুনিক শারদোৎসব থেকে 'কালের যাত্রা' পর্যন্ত সেই আধুনিকতার পদধ্বনিতে মুখর। সেই জগৎ সমকালের হয়েও চিরকালের। বাঙলা সাহিত্যে এই সর্বপ্রথম সুরু হলো intellectual drama movement বাঙলা নাটক পদার্পণ করলো বিংশ শতকে।

ছয়

আধুনিক নাটকের চারিত্র্যলক্ষণ—যা উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে প্রকট হয়ে উঠেছে—সমালোচকেরা বলে থাকেন যে তা হলো জিজ্ঞাসার নাটক, তর্কের নাটক, তত্ত্বের নাটক, মতামতের নাটক। আধুনিক নাটক has been truly the museum, forum and market place of opinions, speculations, and aberrations,[২৮]—এ উক্তিটি আধুনিক যুগের প্রখ্যাত তাত্ত্বিক জন গ্যাসনারের। তাই আধুনিক নাটকের উদ্দেশ্য দর্শক বা পাঠককে জাগানো, তাঁকে ভাবানো—তার আবেদন যতটা না আবেগ বা হৃদয়ের কাছে তার চাইতে অনেক বেশি মস্তিষ্কের কাছে। ইবসেন পিরানদেল্লো বা ব্রেখট প্রত্যেকেই স্বকীয় পদ্ধতিতে দর্শক/পাঠককে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। তাই আধুনিক নাট্যকারেরা বিদ্রোহী, তাঁরা মানতে চান না আরিস্তাতলীয় সিদ্ধান্ত যে, নাটক দর্শন করে through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions অর্থাৎ আবেগ মোক্ষণের পর দর্শক a purified man হিসেবে তথাকথিত সৎ ও নিরাপদ নাগরিক হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন। আরিস্তোতলের পক্ষে অনুরূপ তত্ত্ব প্রচার না করে উপায় ছিলো না। কেন না তাঁর গুরু প্লাতো তাঁর কাল্পনিক রাষ্ট্র থেকে সাহিত্যকে নির্বাসনের অভিলাষী ছিলেন এই অজুহাতে যে সাহিত্যিক কিছু অসত্য ও অযথার্থ চিত্রনের মাধ্যমে নাগরিকদের আবেগের অতিচার ঘটিয়ে থাকেন, ফলে সমাজে দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। এই মতেরই প্রতিবাদ হিসেবে আরিস্তোতল তাঁর কালজয়ী সংজ্ঞাটি উদ্ভাবন করেছিলেন এবং প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে সাহিত্যের এই আবেগমোক্ষণা

ক্ষমতা আছে বলেই সৎ নাগরিকদের পক্ষে অতিচারের প্রতিষেধক হিসেবে সাহিত্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ সমাজ মানসে সাহিত্য safety-valve হিসেবে কাজ করে। আরিস্তোতলের এ সিদ্ধান্ত সাহিত্য বা নাটকের ক্ষেত্রে অধিপত্য করে এসেছে এতগুলো শতাব্দী। কিন্তু আধুনিক কালের সংশয়, জিজ্ঞাসা ও বিশ্বাস আরিস্তোতলের মূল প্রতিপাদ্যকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। আধুনিক নাট্যকার চান না পাঠক বা দর্শক কোনো একটি নাটকের অভিজ্ঞতা লাভ করে আবেগের catharsis ঘটিয়ে a purified man হিসেবে গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন। তাই আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়ো তাত্ত্বিক বেরটোল্ট্ ব্রেখ্‌ট নতুন নাট্যকলা উদ্ভাবন করেছেন যার নাম Non-Aristotlean Theatre—এপিক থিয়েটার। ব্রেখ্‌টের এই তত্ত্ব উদ্ভাবন আকস্মিক কিছু নয়। বহু চিন্তা, আন্দোলন ও প্রয়োজনের ফসল। ব্রেখ্‌ট আরিস্তোতলীয় বা dramatic form of theatre-এর সঙ্গে Epic theatre-এর যে তুলনা করেছেন তার বহু লক্ষণের মধ্যে মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা গেল।[২৯]

Dramatic Theatre	Epic Theatre
Implicates the spectator in a stage situation, wears down his capacity for action.	Turns the spectator into an observer. Arouses his capacity for action
Provides him with sensation.	Forces him to take decisions.
The spectator is involved in something.	He is made to face something.
Suggestion	Argument.
He is unalterable.	He is alterable and able to alter.
Thought determines being.	Social being determines thought.
Feeling.	Reason.

আধুনিক নাটকের এই তত্ত্বমনস্কতা ও চিন্তাপ্রাধান্য নাট্যকারদের একটি নতুন সমস্যার সম্মুখীন করেছে। সে সমস্যা communication-এর, সংযোগের। তাই আধুনিক নাটক রচনায় ও প্রয়োগে এত অস্থির। গত একশো বছরে নাট্যরচনারীতি ও প্রয়োগ পদ্ধতিতে এত অধিক ভাঙ্গাগড়া ও আন্দোলন হয়েছে যা সম্ভবত তার পূর্ববর্তী আড়াই হাজার বছরের নাটকের ইতিহাসে কখনো পরিলক্ষিত হয় নি। প্রধানত এই communication সমস্যা থেকেই মঞ্চে ও নাটকে এত ঘন ঘন পরিবর্তন এসেছে। নাট্যরচনায় কখনো realism, কখনো naturalism, এবং symbolism, expression futurism, social realism প্রভৃতি আবির্ভূত হয়েছে। প্রযোজনাতেও অনুরূপ উল্লেখযোগ্য ত্বরিৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকারদের মধ্যে কেউ অবলম্বন করেছেন প্রাচীন গ্রীক নাট্যকলা—অবশ্যই প্রয়োজনীয় আধুনিকীকরণ সম্পন্ন করে, কেউ দ্বারস্থ হয়েছেন প্রাচ্যসমাজের কাছে প্রধানত চীন জাপানের ধ্রুপদীনাটক ও লোকনাট্যের

প্রতি এবং কেউ বা হয়েছেন নিজস্ব দেশের লোক-ঐতিহ্যের অভিমুখী। এলিয়ট যেমন গ্রীক নাট্যকলার অভিমুখী, তেমনি ইয়েটস ও ব্রেখ্‌ট চীনজাপানের দ্বারস্থ এবং সিং (Synge) লোর্‌কা মায়াকোভস্কি স্বদেশী লোক ঐতিহ্যের আশ্রয়ী।

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার কিছু প্রচলিত লোকনাট্যের আঙ্গিক অনুকরণে রচিত হয়েছিলো প্রথম সোভিয়েট নাটক বলে স্বীকৃত মায়াবকাভ্‌স্কির The Mystery Bouffe. Mystery Bouffe নাটকের Sub-title নাট্যকার দিয়েছিলেন—An Heroic Epic and Satiric Representation of our Epoch. ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতির ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হতে সমাজব্যবস্থা বর্তমান যুগের বরণীয় পরিণতিতে উপনীত হয়েছে—Mystery Bouffe সেই বিন্যাসেরই প্রতিফলন। পৌরাণিক যুগে বন্যাবিধ্বস্ত পৃথিবীর জীবকে বাঁচাতে নোআ একটি বিশেষ জলযানে যাত্রা করে বাঞ্ছিত ভূমিতে পৌঁছেছিলেন—Mystery Bouffe তারই আধুনিক রূপায়ণ। খৃষ্টধর্মের পন্থানুসরণে জীবনমুক্তির সাধনাই Mystery play-গুলির প্রতিপাদ্য। কিন্তু ধর্মের ভেতর দিয়ে মানুষের মুক্তি আসতে পারে না, মানুষের মুক্তি আছে সাম্যবাদ সমন্বিত সমাজ ব্যবস্থায়। সাম্যবাদই এ যুগের ধর্ম। তাই Mystery Bouffe নাটকে সাধারণ মানুষের জয়যাত্রা স্বর্গ নরক পরিক্রমা করে বন্দনীয় ভূমিতে এসে থেমেছিলো। নাটকটি রচিত হয়েছিলো ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। তখনো সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়ার সাধারণ মানুষের ধারণা খুব স্পষ্ট ছিলো না। তাই এধরণের কঠিন তত্ত্বচিন্তা যখন মায়াকোভ্‌স্কি তাঁর নাটকে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হলেন, তখন স্বভাবতই অভিজাত সমাজে প্রচলিত নাট্যাঙ্গিকের প্রতি তিনি অনীহা দেখালেন। কেননা নাটকটি জনসাধারণের জন্য রচিত। তাই তিনি এমন একটি আঙ্গিকের প্রতি আকৃষ্ট হলেন যার শেকড় লোক-ঐতিহ্যে প্রোথিত। এগারো শতকের গোড়া থেকেই রুশদের ভেতর ভ্রাম্যমান নাটুকেদল ছিলো, যাদের বহু প্রাচীনকাল থেকেই Skomorokhi বলে অভিহিত করা হতো। নানা ধরণের ছড়া ও প্রবাদ দিয়ে তাঁরা কখনো বিত্তবানদের, কখনো বা যাজকদের ব্যঙ্গ করতেন। গির্জা ও অভিজাতদের নিষেধ ও বাধা সত্ত্বেও তাঁদের উত্তরসূরীরা সমাজের ভেতর টিঁকে ছিলেন বহু বছর। আঠারো উনিশ শতকে এসে তাঁরা আবার আত্মপ্রকাশ করেন—অবশ্যই নতুনরূপে ও নানা নামে, যেমন—Petrushechic (puppeteen), Medvezhatnik (bear-trainer, ded-balagar (gag-granddad) এবং royonik (rayokman) । Lubki ও agitka নামে লোকনাট্য—যার অবলম্বন ছিলো প্রধাণত কৌতুক ও ব্যঙ্গরস—রাশিয়ার লোকসমাজে জনপ্রিয় ছিলো। Agitka সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলেন : A primitive performance, ametuer or semi-ametuer—'self-entertainment' it was called at that time—which was staged on the march, at the plant, in the worker club, or in the peasant

reading hut।[৩০] মায়াকোভ্স্কির তত্ত্বসমৃদ্ধ নাটকটি এই agitka, lubka প্রভৃতির আঙ্গিকে রচিত এবং তাতে rayokman বা grand-dad-এর মতো চরিত্র চিত্রণ অলক্ষ্য নয়। মায়াকোভ্স্কি জটিলতত্ত্ব সমন্বিত নাটকটি প্রচলিত লোক-নাট্যের আঙ্গিকে রচনা করেছিলেন এই কারণে যে নচেৎ form ও content-এর সম্পূর্ণ অপরিচয় হেতু তা জনমানসে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। অর্থাৎ communication বা সংযোগের সমস্যাই মায়াকোভ্স্কিকে উক্ত আঙ্গিকে নাট্য রচনায় বাধ্য করেছিলো।

সাত

প্রধাণত এই communieation এর সমস্যাই রবীন্দ্রনাথকে বাঙালীর লোকনাট্য যাত্রার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিলো এবং মনোমোহন বসু বা গিরিশচন্দ্র যে উদ্দেশ্যে যাত্রার আশ্রয়ী, রবীন্দ্রনাথের মানস-বৈশিষ্ট্য তাঁকে কখনোই সে ভূমিতে স্থাপন করে নি। যাত্রার ভক্তিরস রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট ছিলো না। তবু তাঁকে স্বীয় নাট্য-রচনায় ও প্রযোজনায় বারবার যাত্রার উল্লেখে উন্মুখর দেখা যায়। রবীন্দ্র নাটকে যাত্রার প্রভাব সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে বহু সমালোচক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এখানে সামান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হলো।

গ্রামীণ নাটক নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মুল্ক রাজ আনন্দ্ লিখেছেন—"The relieving grace of a village play is that in it we get a simple survival of the most ancient theatrical principle: the players and the audience are one, forming a unity through the circles in which they sit round the improvised booth of the stage while the actors walk up, to and from the dressing room, through the clearing which the audience obligingly affords as and when necessary।[৩১] শুধু তাই নয় "Often the audience joins in community singing and the illusion is steadily and surely built up by the actors and the audience acting together, and the spectacle is utterly moving in certain moments।[৩২] শিশিরকুমার ভাদুড়ীও যাত্রা ও থিয়েটরের পার্থক্য নির্ধারণ করে লিখেছেন—"এই যে দর্শকের সঙ্গে বোঝা-বুঝি, 'Taking the audience into confidence', এইটে যাত্রাতে সম্ভব হয় তার কারণ, আসরের মধ্যে একেবারে দর্শকের কাছে ঘেঁসে তাঁদের স্থান, দর্শকদের থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন নন।"[৩৩]

অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে এই কলিত সংযোগকে রবীন্দ্রনাথ যাত্রার সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেছেন। তিনি লিখেছেন: "আমাদের দেশের যাত্রা আমার এজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও অনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা

বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া ওঠে।"[৩৪] কেননা তাঁর মতে: "যে দর্শক তোমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে তাহার কি. নিজের সম্বল কানা কড়িও নাই। সে কি শিশু। বিশ্বাস করিয়া তাহার উপরে কি কোনো বিষয়ে নির্ভর করিবার জো নাই।"[৩৫] এখানে 'পরস্পরের বিশ্বাস ও অনুকূল্যের প্রতি নির্ভর' এবং 'সহৃদয়তার সহিত' বাক্যাংশগুলো অত্যন্ত গুরুত্বব্যঞ্জক। এখানে দর্শকের সঙ্গে communication বা সংযোগ ব্যাপারটির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধটি রচিত ১৩০৯ সাল অর্থাৎ ১৯০২/৩ খৃষ্টাব্দে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় ওই সময়ে রবীন্দ্রনাট্যরচনায় দীর্ঘ বিরতিকাল চলেছে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে ১৮৯৬/৯৭ থেকে ১৯০৮ খৃষ্টব্দ পর্যন্ত প্রায় এগারো বারো বছর রবীন্দ্রনাথ পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন নি। অর্থাৎ উনিশ শতকীয় বাঙলা নাট্যাঙ্গিকের যান্ত্রিক অনুবর্তন তিনি আর পছন্দ করছেন না। সমকালীন বাঙালী নাট্যকারদের বিষয়বস্তু ও অভীষ্টরস থেকে তিনি বরাবরই বিপরীত প্রান্তবাসী। তবু তিনি নিশ্চিত তাড়িত হয়েছিলেন এই চিন্তাদ্বারা যে এতদিন নাটকে যে জীবনবাণী তিনি প্রকাশ ক'রে এসেছেন তা সমকালীন নয়। নতুনতর বিষয়—বিশ শতকীয় সমস্যা—নিজের মতো করে প্রকাশের জন্য তিনি ব্যাকুল। কিন্তু কোন্ আঙ্গিকের মাধ্যমে তা সম্পন্ন হতে পারে—সে সমস্যা তাঁকে ভাবিয়েছিলো এবং 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধটি সে চিন্তার প্রতিফলন। ওই প্রবন্ধেই তিনি লিখছেন: "বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য"।[৩৬] 'আপামর সকলের দ্বারের কাছে' পৌছুবার জন্য তাঁর ব্যগ্রতা যদি গিরিশচন্দ্রের মতো যাত্রার ভক্তিরস তাঁর অন্বিষ্ট হতো, তাহলে —এত তীব্র হতো না বা তার সাফল্য সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন তিনি হতেন না, কেননা যাত্রার বিষয় ও রস বাঙালী আপামরের অপরিচিত ছিলো না। তিনি জানতেন, যে বিষয়বস্তু ও অভীষ্টরস নিয়ে তিনি উপস্থিত হতে চান তা বাঙালী দর্শকের পরিচিত নয়। Content যেখানে অভিজ্ঞতা বহির্ভূত, সেখানে form-এর আত্মীয়তা দর্শককে নিশ্চয়ই আশ্বস্ত করবে। কিন্তু তাই বলে যাত্রাঙ্গিকের যান্ত্রিক অনুগামিতা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। নাটকের সামান্য তাল ফিরিয়ে আসরের উন্মুক্ততায় হাজির করা—যেমন সামাজিক কালের যাত্রাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য—তিনি কাম্য মনে করেন নি। এমন কি মায়াকোভ্স্কি প্রচলিত রুশ লোকনাট্যের আঙ্গিক যেমন প্রত্যক্ষভাবে অবলম্বন করেছিলেন,রবীন্দ্রনাথে সে প্রত্যক্ষতাও অপ্রাপ্য। তিনি যাত্রাঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় উর্দ্ধায়ন (Sublimation) ঘটিয়ে স্বকীয় করে নিয়েছিলেন। এখানে লক্ষনীয়, রবীন্দ্রনাটকে যাত্রার প্যাটার্ণ সাংকেতিক বলে চিহ্নিত নাটকগুলিতেই সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট প্রতীয়মান। ঐ নাটকগুলিই রবীন্দ্র নাট্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান। এবং এগুলোর মাধ্যমেই আধুনিক জীবনের জটিলতা ও যুগসমস্যা সর্বপ্রথম বাঙলা

নাট্যসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। এ বৈশিষ্ট্যটি আমাদের প্রতিপাদ্যের পরিপূরক।

আট

অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য একটি প্রবন্ধে[৩৭] যাত্রার কিছু বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করেছেন এবং রবীন্দ্রনাটকে তা কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিশেষত্বগুলো যথাক্রমে 'দৃশ্যপটহীনতা', 'অভিনয় নৈপুণ্যের ওপর গুরুত্ব প্রদান' 'দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সংরক্ষণ' "গীতিযোজনা" এবং 'চরিত্রের একটি বক্তব্যের এক অংশ সংলাপে আর এক অংশ গানে পরিবেষণ করা'। সমালোচকের মতে রবীন্দ্রনাথের নাটকেও যাত্রার এ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে।[৩৮]

শারদোৎসব থেকে সুরু করে ফাল্গুনী পর্যন্ত রবীন্দ্র সাংকেতিক নাটকের প্রবণতায় সমালোচকদের বিভিন্ন প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বলা যায়। কিন্তু মুক্তধারা বা রক্তকরবীর আঙ্গিকে গুরুতর পরিবর্তন প্রকাশিত সে সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ নেই এবং তা সমালোচকদের সিদ্ধান্তসমূহের সম্পূর্ণ অনুপন্থী, এমন কথা অক্লেশে বলা যায় না। কাজেই এখানে সে প্রসঙ্গে সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে।

থিয়েটারের সঙ্গে যাত্রার সর্বাপেক্ষা বড়ো পার্থক্য—এক, থিয়েটারের মতো যাত্রার মঞ্চে প্রোসেনিয়ম নেই; দুই, যাত্রার মঞ্চ চতুর্দিক খোলা বলে সেখানে থিয়েটারের Picture-frame কখনো সম্ভব নয়। প্রোসেনিয়মহীনতার জন্যই যাত্রা হতে পারে—সমালোচকগণ যে বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন—দর্শক ও অভিনেতার একাত্মতা। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এখানে আবার স্মরণ করা যেতে পারে —"যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।" কিন্তু যাত্রার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য Picture-frame-এর অবলুপ্তি —অন্ততঃ মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা অনুধাবনে মনে হয়—রবীন্দ্রনাথের কাম্য ছিলো। থিয়েটারের মঞ্চনাটক—তা এক দৃশ্যে এক অঙ্কেই হোক বা একাধিক দৃশ্যাঙ্কেই হোক—একটি নির্দিষ্ট Picture-frame ব্যতীত কখনো কোনো দৃশ্য উপস্থাপনা সম্ভব হয় না। অথচ উপরোক্ত তিনটি নাটকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সভ্যতার সংকট ও তার ক্রান্তিকাল প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছেন কিন্তু কোনো বিশেষ রূপের মাধ্যমে নয়, নির্বিশেষ অবয়বে। তাই তাঁকে নতুনতর কলাকৌশল উদ্ভাবন করতে হয়েছে যা নির্দিষ্ট সীমায় Picture-frame-কে ভাঙতে সক্ষম। থিয়েটারের মঞ্চ বজায় রেখেই রবীন্দ্রনাথ এই Picture-frame-কে ভাঙতে চেয়েছিলেন।

আধুনিক যুগের নাট্য আন্দোলনের দুটো প্রধান ধারা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে কঠোর বাস্তবানুকরণ—যা Picture-frame-এর মধ্যে বস্তুবিশ্বের বিকল্প রচনা করে। এ ধরণের নাট্য প্রযোজনায় দর্শকের উপস্থিতি আপাত অগ্রাহ্য করা হয়। অর্থাৎ এখানে এমন একটি মঞ্চমায়া সৃষ্ট হয় যার কুশীলব কোনো বাস্তবকল্প ভুবনের অধিবাসী। এরূপ প্রযোজনায় অনুমিত হয় একটি চতুর্থ দেয়াল fourth wall—যার অদৃশ্য উপস্থিতির আড়ালে বসে দর্শক যেন চুরি করে সব দেখে নেয়। স্তানিস্লাভস্কির প্রযোজনায় এ ধারা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিলো বলা যায়। স্তানিস্লাভস্কির প্রযোজিত আন্তন চেকভের নাটকের দৃশ্যগুলোর আলোকচিত্র ও সে সম্পর্কে আলোচনা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় মঞ্চে বাস্তব রূপেব প্রতিফলন কোন্ চরম সীমা স্পর্শ করতে পারে। অন্য একটি ধারা এই Picture-frame ভেঙে মঞ্চমায়া বিলুপ্ত করতে চেয়েছিলো। জর্মানীতে পিস্কাতোর ও ব্রেথট এবং রাশিয়াতে মায়ার হোল্ড ও ভাগতান্গভ এই উদ্দেশ্যেই তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা পরিচালিত করেছিলেন। এ প্রবণতা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিলো আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য আন্দোলন—এপিক থিয়েটার। এপিক থিয়েটারের নাট্যকার ব্রেথট প্রধানত এই Picture-frame-কে ভেঙেই মঞ্চ মায়ার কবল থেকে দর্শককে উদ্ধার করে তাঁদের চিন্তার জগতে উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও—বলা যায়—তাঁর স্বকীয় পদ্ধতিতে এই Picture-frame-কে বিপর্যস্ত করে দর্শকের বুদ্ধিপ্রান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করেছিলেন।

মুক্তধারা নাটকের শুরুতে মঞ্চনির্দেশ: "উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ। সেখানকার উত্তর ভৈরব মন্দিরে যাইবার পথ। দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপরদিকে ভৈরবমন্দির চূড়ার ত্রিশূল।" এই বর্ণনার মাধ্যমে প্রতিভাত হচ্ছে একটি স্থিতিশীল মঞ্চ যা Picture-frame-এর দ্যোতক। কিন্তু এই স্থিতিশীলতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সঞ্চারিত করেছেন এমন এক জঙ্গমতা যা মুক্তধারার প্রতীক। নাটকে পর্দা একবারই সরেছে অথচ সম্পূর্ণ দৃশ্যে এমন কতগুলো দৃশ্য পরিকল্পনার আভাষ আছে যা কখনোই দর্শকের সম্মুখস্থিত দৃষ্টিসীমার পথটুকুতে আবদ্ধ নয়। শুধু যে ভৈরবপন্থীদের গীতসহ প্রবেশ ও প্রস্থানে উত্তরকূটের দীর্ঘপথ পরিক্রমা সূচিত হয়েছে তাই নয়। বটু অম্বা ও বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের প্রয়োজনীয় মঞ্চচারণা একসঙ্গে যেন বহু স্থান ও কাল গ্রথিত করে দিয়েছে। একটি মঞ্চস্থাপত্য বজায় রেখে নাটকে বিভিন্ন তল (Plane) উপস্থাপনা করা picture-frame না ভাঙলে সম্ভব হতো না। মুক্তধারায় যার প্রস্তাবনা, রক্তকরবীতে তারই সার্থকতর প্রয়োগ। রক্তকরবীর সূচনায় মঞ্চ নির্দেশ: "রাজা একটা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটিমাত্র দৃশ্য। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা

ঘটিতেছে।" অর্থাৎ এখানেও মঞ্চে উপস্থাপিত একটিমাত্র দৃশ্য ও জালের আবরণ নির্দিষ্ট পশ্চাদপট রূপে চিহ্নিত হয়েছে কিন্তু নাটকের গতিশীলতা কখনোই দর্শকের দৃষ্টিসীমার স্থান ও কালে সঙ্কুচিত নয়। একই সঙ্গে বহু স্থান ও বহু কালের দ্যোতক রক্তকরবীর পট ক্ষেপণ থিয়েটারের প্রচলিত Picture-frame কে নিঃসন্দেহে অগ্রাহ্য করেছে। কখনো সন্ধ্যা কখনো সকাল, কোথাও রাজদ্বার কোথাও শ্রমিক বসতি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান ও কাল অত্যন্ত সাবলীল সঞ্চরণে উপস্থিত হয়েছে নাটকের একটিমাত্র দৃশ্যে এবং সে দৃশ্যটিও নাট্যকার দ্বারা সুস্থির মঞ্চলক্ষণে চিহ্নিত। থিয়েটারের Picture-frame ভেঙে যাত্রার সাবলীলতা এভাবেই রবীন্দ্রনাথ আনতে চেয়েছিলেন নাটকে। তাই তাঁর কাছে যাত্রা একটি জৈবিক প্রেরণা এবং এভাবেই যাত্রার form বা আঙ্গিক হয়ে উঠেছে আধুনিক ও যুগোপযোগী। নইলে কেবলমাত্র গীতি বহুলতা, বিবেকাশ্রয়ী চরিত্র কিংবা অন্যতর কিছু যান্ত্রিক লক্ষণ মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথে যাত্রার প্রভাব নির্ণয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয় না। রবীন্দ্রনাথ যখন বার বার আমাদের স্মরণ করিয়েছেন, যাত্রাকে স্বীকরণের মধ্যেই আছে বাঙলা নাটকের মুক্তি, তখন সে ঘোষণাকে শুধুমাত্র ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধাশীলতার নিস্ফল প্রকাশ মাত্র মনে করা সঠিক হবে না এবং সেজন্যই তার গতিশীল উত্তরণ সম্পর্কে সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালী নাট্যকর্মীর সচেতন হওয়া বিধেয়।

নয়

বক্ষ্যমান প্রবন্ধে প্রতিভাত হবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রভাবের স্বরূপ প্রধানতঃ মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নাটক অবলম্বনেই বিশ্লেষিত হয়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট কারণে এ ত্রয়ীনাট্যকারকে নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রথম মৌলিক বাঙলা নাট্য রচনা কাল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশন্যাল থিয়েটার স্থাপনার অন্তর্বর্তী সময়ে মধুসূদনই বাঙলা নাট্যসাহিত্যের অবিসংবাদী প্রতিনিধি। ন্যাশন্যাল থিয়েটার স্থাপনার পর বাঙলা নাট্যজগত—রচনা ও প্রযোজনায়—গিরিশচন্দ্রের আধিপত্য উন্মুখর এবং সাধারণ রঙ্গালয়ের সমান্তরালে যে নাট্য আন্দোলন অব্যাহত ছিলো, তার একক প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ। তাই তিনটি বিভিন্ন ধারার ত্রয়ী প্রতিনিধিকেই আলোচনার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং অন্যান্য খ্যাতিমান ও শক্তিসম্পন্ন নাট্যকারগণ এঁদের নির্ধারিত পথেই চংক্রমণ করেছেন প্রধানত মধুসূদন ও গিরিশচন্দ্রের অনুগামী রূপে, কেননা রবীন্দ্রানুসরণ বাঙলা নাট্যসাহিত্যে কখনো সম্ভব হয় নি। মধুসূদন যুগে দীনবন্ধু মিত্র এবং সাধারণ রঙ্গালয়পর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ নাট্যপ্রতিভার উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখেছেন। এঁদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রের রচনায় ইংরেজী comedy of manners ও অমৃতলালের ফরাসী প্রহসনের সামান্য প্রভাব ব্যতীত প্রধানত শেকস্পীরীয় রীতিই অনুসৃত হয়েছে, বলা যায়। একমাত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথে প্রভাবের প্রকৃতি একটু

বিচিত্র। সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হচ্ছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদে শেকস্‌পীরীয় অনুবর্তন নিঃসন্দেহে প্রাধান্য পেয়েছে। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালে গানের আধিক্য দেখে কোনো কোন সমালোচক যাত্রার প্রভাব অনুমান করেছেন কিন্তু ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে গানের ব্যাপক প্রয়োগ যাত্রা থেকে আসে নি, এ বৈশিষ্ট্য তাঁদের গান রচনার প্রতিভা থেকে এসেছে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার দুজনেই গীতিকার ও সুরকার হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। [৩৯]

রথীন্দ্রনাথ রায়ের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য—"দ্বিজেন্দ্রলাল দীর্ঘকাল ধরে শেকস্‌পীরীয় নাট্যশিল্পকে আয়ত্ব করার চেষ্টা করেছেন।" [৪০] দ্বিজেন্দ্রলালের এ বৈশিষ্ট্য ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের প্রতিও সাধারণভাবে প্রয়োগ করা চলে।

১ দীনবন্ধু রচনাবলী : ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত (সা হত্য সংসদ : ১৯৬৭) পৃষ্ঠা ভূমিকা—৬৬
২ তারাচরণ শীকদার : 'ভদ্রার্জুন' (বুকল্যাণ্ড : ১৯৪৯) পৃ ১
৩ তদেব : পৃ ১
৪ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) পৃ ১৩১-১৩২
৫ ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত : কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী (গ্রন্থ নিলয় : ১৩৭০) পৃ ১৩১
৬ শ্রীভরতমুনি প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্রম' (কাশী সংস্কৃত সিরিজ) পৃ ৮
৭ ধনঞ্জয় : দশরূপক [মতিলাল বারাণসী দাস : ১৯৬২] পৃ ৩৪
৮ বিশ্বনাথ কবিরাজ : সাহিত্যদর্পণ—[অনুঃ ডঃ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় : পুস্তকশ্রী ১৩৭৬] পৃ ৩৬৭
৯ ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত : কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী—পৃ ১৬৬
১০ তদেব —পৃ ১৬৬
১১ তদেব —পৃ ১৫৪
১২ তদেব —পৃ ১৫৪
১৩ Janet Spens : Elizabethan Drama (Methuen & Co Ltd 1922) P. 32
১৪ Op. Cit : P 30
১৫ Op. Cit : P 29
১৬ মন্মথমোহন বসু : বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৫৯) পৃ ৮৯। ডঃ পি. গুহঠাকুরতা আবার যাত্রার প্রভাব একেবারে অস্বীকার করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর রচিত গ্রন্থ 'The Bengali Drama'-তে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। অবশ্য ডঃ গুহঠাকুরতার মতও একদেশদর্শী।
১৭ তদেব—পৃ ৮৩
১৮ Probodh C. Sen : Bengali Drama and Stage—an article published in the book 'Indian Drama' : [The Publication Division 1956] P. 43
১৯ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : মনোমোহন বসু [১৩৫২] পৃ ৯৮
২০ রামগতি ন্যায়রত্ন : কুপিত কৌশিক নাটক (হুগলী : ১৮৭৮), বিজ্ঞাপন
২১ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : তদেব—পৃ ৫৪
২২ তদেব—পৃ ৫৪

২৩ A.C. Bradley : Shakespearean Tragedy (Macmillan & Co Ltd. 1961)—P 30

২৪ শ্রীকুমুদবন্ধু সেন : গিরিশচন্দ্র (জেনারেল প্রিণ্টার্স : ২য় সং, ১৩৬৩), পৃ ১৫১

২৫ S. N Shastri : The Laws and Practice of Sanskrit Drama (Chowkhamba : 1961) P. 90

২৬ গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড (সাহিত্য সংসদ : ১৯৬৯), পৃ ৭৪৭

২৭ তদেব, পৃ ৭৪৭

২৮ John Gassner : Form aud Idea in Modern Theatre (The Dryden Press : 1956) P. 11

২৯ Brecht On Theatre : translated by, John Willett (Mathuen & Co Ltd. : 1964) P. 37

৩০ Peter Yershov : Comedy in the Soviet Theatre (Atlantic Press : 1957) Passim

৩১ Mulk Raj Anand : The Indian Theatre P. 12

৩২ Op. Cit. P. 12

৩৩ মনি বাগচী : শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার (জিজ্ঞাসা : ১৯৬০) পৃ ৩৭১

৩৪ রবীন্দ্র বচনাবলী ১৪শ খণ্ড [পশ্চিমবঙ্গ সরকাব : ১৩৬৮], পৃ ৭৪৪

৩৫ তদেব, পৃ ৭৪৪

৩৬ তদেব, পৃ ৭৪৫

৩৭ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, ১০ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : ১৩৭৯, পৃ ১৪০-১৫০

৩৮ তদেব—পৃ ১৪১-৪২

৩৯ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রনাট্যধারা (সংস্কৃতি প্রকাশন—১৯৬৬), পৃ ৬৬

৪০ রথীন্দ্রনাথ রায় : দ্বিজেন্দ্রলাল, কবি ও নাট্যকার (সুপ্রকাশ—১৯৬০) পৃ ৩১৩

———

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বন্দ্বচেতনা

এক

দ্বন্দ্ব নাটকের প্রাণ। নাটকের দ্বন্দ্বচেতনা সমকালীন যুগের দ্বন্দ্বের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। যে যুগ নিস্তরঙ্গ, যে জাতির জীবনে উত্থান-পতন তীব্র নয়, সেখানে দ্বন্দ্বসমন্বিত নাট্যরচনা বিশেষ সম্ভব হয় না। সমালোচক কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষায়—"মানসিক আবেগের বা অন্তঃপ্রকৃতির উচ্ছ্বলিত তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতই নাটকের জীবন।"[১] এই 'মানসিক আবেগ' বা অন্ত.প্রকৃতির উচ্ছ্বলিত তরঙ্গ'—পূর্বেই বলা হয়েছে—একটি জাতি তখনই অনুভব করতে সক্ষম, যখন বিপুল কর্মপ্রবাহ তাকে প্রাণচঞ্চল করে তোলে। জাতীয় জীবনের কর্মপ্রবাহ ও প্রাণচাঞ্চল্য নাটকে ক্রিয়া ও দ্বন্দ্বের সঞ্চার করে থাকে। দ্বন্দ্ব বিহীন নাটক প্রায় অসম্ভব। অবশ্য জাতি ও যুগ পরিবেশের তারতম্যে দ্বন্দ্বের স্বরূপ বিভিন্ন দেশে ও কালে পৃথক হতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর বিখ্যাত 'কালিদাস ও ভবভূতি নামক প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করে মন্তব্য করেছেন—অন্তর্দ্বন্দ্ব যে নাটকে দেখান হয়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক, যেমন—হ্যামলেট্ বা কিং লিয়র। বহির্ঘটনার সহিত যুদ্ধ তদপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর নাটকের উপাদান,......এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সব মহানাটকে আছেই আছে। প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সংঘাতে তরঙ্গ না উঠাইতে পারিলে, বিপরীত বায়ুর সংঘাতে ঘূর্ণী ঝটিকা না উঠাইতে পারিলে কবি জমকালো রকম নাটকের সৃষ্টি করিতে পারেন না।...

"যে নাটক বৃত্তি সমূহের যুদ্ধ দেখায়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক।"[২]

কিন্তু উনিশ শতকীয় বাঙলার নব জাগৃতির যুগে বাঙালীর কর্মে অধিকার ছিলো না। এ সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। কাজেই পুনরুক্তির বাহুল্য বর্জন করে সংক্ষেপে বলা যায়, সমকালীন যুগ পরিবেশ উনিশ শতকীয় বাঙালীকে দ্বন্দ্ব সংঘাতের তরঙ্গে বিশেষ আন্দোলিত করে নি। কাজেই ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় যখন লেখেন—"নাটক কর্মশরীরী, কর্মাত্মক, কর্মমূলক। নাটক কর্মের সম্পাদন ও সম্প্রসারণ ; কর্মের একতা ও পূর্ণতা—"[৩] তখন তা সমর্থনযোগ্য, কিন্তু এই কর্মের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যখন মন্তব্য করেন—"আপাতত আমাদের মধ্যে সংঘর্ষ সংঘাত, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কিছুমাত্র অভাব নাই। নাটকীয়

পরিভাষায় ইংরেজীতে যাহাকে 'কলিসন' 'আকসন' ও'রি-আকসন' কহে তাহার ত অভাব দেখি না"[৪] —তা মেনে নেওয়া সহজসাধ্য হয় না। এ বিষয়ে সমালোচকের দৃষ্টিও যে খুব একটা স্বচ্ছ নয় তার প্রমাণ তিনি নাটকীয় কর্ম আলোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় কর্মবাদের জটিল দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন। নাটকীয় কর্ম বা ক্রিয়া ও ভারতীয় কর্মবাদ নিঃসন্দেহে সমার্থক নয়। বরং এ সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন ঘোষের সিদ্ধান্তই সঠিক বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন— "এখন আর আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির প্রকৃত আবেগ নাই। মানসিক হ্রদে সামান্য কুলকুলি আছে, কিন্তু গভীর প্রপাতের কল্লোল নাই। আমরা এখন বাতুলের মত হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলি, কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া ফেলি। সুতরাং আমাদের মধ্যে এখন উৎকৃষ্ট নাটকের প্রত্যাশাও করা যাইতে পারে না। ভাল নাটক যে হয় না, সে এখন আমাদের জাতীয় প্রকৃতির বৈগুণ্য হেতু; কেবল গ্রন্থকারগণের দোষে নহে।"[৫] প্রবন্ধটি কালীপ্রসন্ন ঘোষ লিখেছিলেন ১২৮৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে। তখন গিরিশচন্দ্র নাট্যকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ না করলেও মধুসূদন ও দীনবন্ধুর অমর নাট্যসম্পদ তখন প্রকাশিত ও বাঙালী চিত্তে প্রতিষ্ঠিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচকের সিদ্ধান্তটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর অর্থবহ।

দুই

পূর্বেই বলা হয়েছে, বাঙলা নাটকের সূচনাপর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিস্তৃত কালসীমায় বাঙলাদেশের যুগপরিবেশ ও জীবনের মূল্যবোধ সরল রেখায় প্রবাহিত হয় নি। বিশিষ্ট নাট্যকারদের দ্বন্দ্বচেতনা বিভিন্ন পর্বের বিচিত্র মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। মধুসূদন পূর্ববর্তী নাট্যকারদের দ্বন্দ্ব চেতনা ছিলো অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অবগুণ্ঠিত, কেননা তখনো নবজাগৃতির প্রাণস্পন্দন বাঙলা নাটকে প্রস্ফুটিত হয় নি। নবজাগৃতি যুগের প্রথম সার্থক নাট্যকার মধুসূদন। তাই নবজাগৃতির দীপ্ত মানবতাবোধ বা মানবিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রথানুগত্য-বিরোধিতা মধুসূদনে মূর্ত হয়ে উঠেছিলো। মধুসূদনের জীবনদর্শন নবজাগৃতি যুগের "মানবিকতার মূল্যবোধে মহীয়ান।"[৬] তাঁর কাছে জীবনের যে সকল সমস্যা প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিলো, তা মূলত মানবিকতার। তাই জীবননিষ্ঠ প্রেম ও তার জটিলতা তাঁর কবি মানসে তরঙ্গ তুলেছে অধিক। সেই প্রেমের বিচিত্র ও বিভিন্নমুখী প্রকাশ ঘটেছে শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণ কুমারী ও সর্বোপরি বিলাসবতীর চরিত্রে। মধুসূদনের এই জীবনবোধ ও দ্বন্দ্বচেতনা প্রচলিত কোনো ধর্ম বা নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। তাঁর নাটকে কোনো ধর্ম বা নীতি যদি প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে তা জীবন বা যৌবনধর্ম ও মানবনীতি।

নাট্য—৬

মধুসূদন সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করা হলো, এই যুগের অপর প্রধান নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের প্রতি সাধারণভাবে তা প্রয়োগ করা চলে। পার্থক্যের মধ্যে, মধুসূদনে প্রকাশিত সমস্যা আপাত দৃষ্টিতে সমকালীন সমাজগত নয়, তা যেন চিরকালীন মানবতার সত্য, আর দীনবন্ধুতে সে সমস্যা তাঁর কালের জীবনদ্বন্দ্বে নিক্ষিপ্ত। তাই মধুসূদনে সমকালীন সমস্যা যেন দেশ-কাল-অনালিপ্ত হয়ে সর্বজনীন রূপলাভে সমর্থ হয়েছে, কিন্তু দীনবন্ধুর নাট্যচেতনা প্রবল ভাবে সমা-সাময়িকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবু একথা বলা চলে যে, প্রায় একই জীবনোপলব্ধি ও মূল্যবোধের দুই বিপরীত প্রান্তবাসী প্রকাশ ঘটেছে মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাট্যরচনায়। এই জীবনোপলব্ধি ও মূল্যবোধের পার্থক্য গুণগত নয়, পরিমাণ গত। "মানুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাই না"—বঙ্কিমচন্দ্রের এ বিখ্যাত উক্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ সুশীল কুমার দে মন্তব্য করেছেন—"ইহাই ছিল নবযুগেব ও নবসাহিত্যের মানবীয় সাধনার "প্রাণধর্ম।"[৭] মধুসূদন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক তাই বলেছেন—"তাঁহার কবিমানসের একদিকে ছিল নবযুগের ভাবজগৎ ও নব মানবতার আদর্শ, অন্যদিকে ছিল বাঙালীর সংস্কারগত একান্ত সুকুমার ভাব প্রবণতা।"[৮] দীনবন্ধু সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত দীনবন্ধুর নাটকে প্রহসনে যে অপূর্ব চিত্তপ্রসন্নতা ও রসসৃষ্টি রহিয়াছে তাহাও এই অকৃত্রিম জীবনপ্রীতির অপর একটি বিকাশ। প্রতিদিনের ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনাগুলির মধ্যে যে সহজরস রহিয়াছে, যাহা এককালে মুখে হাসি ও চোখে জল লইয়া আসে, যাহা কেবল জীবনরস-রসিকেরই দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, তাহাই দীনবন্ধুর অনুভূতি ও সমবেদনায় নূতন করিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর ও মর্মস্পর্শী হইয়াছে।"[৯] নবযুগের প্রাণধর্ম প্রকাশক এই মানবতাবোধ ও জীবনরস-রসিকতা মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাট্যরচনার মূল প্রেরনা ছিলো। সমালোচক যখন বলেন দীনবন্ধু "নীতি ও পাপ-পুণ্য বোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন নি"[১০] তখন তা মধুসূদন সম্পর্কেও সত্য হয়ে ওঠে। তাই মধুসূদন দীনবন্ধুর নাটকে উপস্থাপিত দ্বন্দ্ববোধ মূলত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মানবতাবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই দ্বন্দ্ববোধ থেকেই উৎসারিত হয়েছে তাঁদের বিশিষ্ট ট্র্যাজিক দৃষ্টি (tragic vision) ও কমেডি বোধ (Comic sense)।

তিন

মধুসূদন-দীনবন্ধু যুগের মূল্যবোধ—পূর্বেই আলোচিত হয়েছে—ষাটের দশকের পর থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছিলো। তাই নবজাগৃতি যুগের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী মধুসূদন-দীনবন্ধুকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো, পটভূমি পরিবর্তনের সঙ্গে সেই মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীরও বদল হলো। বাঙালী নাট্যকারগণ মানবিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত

হলেন না ঠিকই, কিন্তু তা আর তাঁদের কাছে প্রধানতম হয়ে রইলো না। তাঁদের মানবিকতাবোধ ছাপিয়ে অভ্রভেদী হয়ে উঠলো 'নীতি ও পাপপুণ্য বোধ।' গিরিশচন্দ্রের ভাষায়—"এদেশের হৃদয়গ্রাহী মৌলিকত্ব ধর্মপ্রসূত হইবে।"[১১] গিরিশচন্দ্রের নাট্যচেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে ধর্ম। তাই বিভিন্ন শ্রেণীর নাটক সম্পর্কে আলোচনা করে তিনি মন্তব্য করেছেন—"এইরূপ হীন কল্পনা প্রসূত বিয়োগান্ত নাটকে কতকগুলি অস্বাভাবিক পাপের ছবি প্রদর্শিত হয়, শেষে কতকগুলি খুনাখুনি—সেই নিমিত্তই তাদের বিয়োগান্ত নাম। হীন কল্পনাপ্রসূত মিলনান্ত নাটক তাহা অপেক্ষাও ঘৃণিত হইয়া উঠে। পাপের ছবি তাহাতে আরও উজ্জ্বলরূপে প্রদর্শিত হয়। পাপের প্রতি ঘৃণা না, পাপ আরও আদরের হইয়া ওঠে।—উন্নত রুচি রঙ্গালয়ে এসকল নাটককারের স্থান নাই।"[১২] যে নাট্যকারের পাপপুণ্যবোধ এত প্রখর, রঙ্গশালাকে যিনি ধর্মশালা ভাবেন, তাঁর কাছে নাট্যকারের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় নিরপেক্ষতা আশা করা যায় না। ধর্ম বা নীতি সাহিত্যিকের অবশ্যই অন্বিষ্ট কিন্তু তা স্বয়ংপ্রধান হয়ে মানবিক মূল্যবোধকে আচ্ছন্ন করে দিলে রচনা দুর্বল হয়ে পড়ে। গিরিশচন্দ্রের যুগে 'হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান' নিঃসন্দেহে অন্যতম প্রধান ব্যাপার ছিলো। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভক্তিপ্রবণ সাধারণ বাঙালীর চিন্তা জগতে বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের তুলনায় অবশ্যই প্রবলতর প্রভাব বলে পরিগণিত হয়েছিলেন এবং গিরিশচন্দ্র যখন যুগের প্রবণতাকে নাট্যরূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তখন তা অভিনন্দনযোগ্য, কেননা—"Ideas are always coming into being in opposition to older ideas or maintaining themselves in opposition to newer ones. The creative artist chooses from among the great diversity of his age's ideas according to his intellectual bent.[১৩] যুগের মতাদর্শ বা age's idea থেকে প্রয়োজন মতো গ্রহণ করেছিলেন গিরিশচন্দ্র। যেমন করেছিলেন শেকস্‌পীয়র। কিন্তু The intellectual content of a Shakespearean tragedy, however, involves not the mere statement of ideas, Elizabethan or otherwise, but the exploration of ideas, examination both of ideas and their contraries in terms of human life[১৪]। অর্থাৎ শেক্সপীয়রের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের প্রভেদ দুস্তর। গিরিশচন্দ্রে রয়েছে mere statement of ideas, প্রচলিত ধর্মমতকে পরীক্ষা নিরীক্ষা বা তার ওপর নব যুগোপযোগী তাৎপর্য আরোপ করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন নিস্পৃহ এবং যেটি গিরিশচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বড়ো বৈশিষ্ট্য, তিনি যুগের idea-কে in terms of human life প্রকাশ করেন নি। গিরিশচন্দ্রের নাটকে তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মমত ও পাপপুণ্য বোধ নাট্যকারের নৈর্ব্যক্তিকতাকে নিদারুণভাবে ক্ষুণ্ন করেছে।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে দ্বন্দ্বচেতনা এই ব্যক্তিগত ধর্মমত ও পাপপুণ্য বোধের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। সে কারণেই তাঁর নাট্যদ্বন্দ্ব অধিকাংশ স্থলেই human হয়ে

উঠতে পারে নি। কেননা সংগ্রাম নয়, আত্মসমর্পণই ভক্তিরসের মূলকথা এবং আত্মসমর্পণে কোনোরূপ দ্বন্দ্বের অনুপ্রবেশ প্রায় অসম্ভব। সমালোচকের ভাষায়—"মানুষ সংসার-সংগ্রামে বিধ্বস্ত হইয়া যখন শক্তিহীন হইয়া পড়ে, শত চেষ্টা করিয়াও যখন তাহার মানুষী-শক্তি অদৃষ্টশক্তির কাছে পরাভূত হয়, কেবলমাত্র দৈবীশক্তির আশ্রয়লাভ ভিন্ন যখন তাহার আর গত্যন্তর থাকে না, তখন আত্মশক্তিবিশ্বাসী মানুষ, হয় এই ত্রিতাপতপ্ত সংসার সাগরোর্মির প্রচণ্ডাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ সংসার-জলধির ক্রোড়েই আত্মবিসর্জন করে, নতুবা ঐ ভৈরবী প্রকৃতির মধ্যে রণচামুণ্ডার মূর্তি দেখিয়া তাঁহারই আশীর্বাদে বিজয়ী হইয়া উঠে। এই প্রকার জয় পরাজয় লইয়া মানুষের জীবন অহরহ কাটিতেছে। গিরিশচন্দ্রের নাট্যচরিত্রগুলি যখনই এরূপ কোন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, তখনই তিনি তাহাদের জীবনেব গতি, হয় এক অভাবনীয় উপায়ে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া দিয়াছেন, না হয় ঘটনাব সাংসিদ্ধিক পরিণতির মধ্যে তাহাদের ডুবাইয়া দিয়াছেন।"[১৫]

অথচ গিরিশচন্দ্র মনে করতেন দ্বন্দ্ব বা ঘাত-প্রতিঘাত ছাড়া নাটক হতে পারে না। সেকালে শিক্ষিত বাঙালীর কাছে নাটকের আদর্শ ছিলো শেক্সপীয়রের রচনা এবং দ্বন্দ্ব শেক্সপীরীয় নাটকের প্রাণ। তাই গিরিশচন্দ্রকে সমতল নাট্যভূমিতে অন্য উপায়ে দ্বন্দ্বের বন্ধুরতা সৃজন করতে হয়েছে। কুমুদবন্ধু সেনের সঙ্গে কথোপকথন কালে তিনি ব্যক্ত করেছেন যে, এমন নাটক তিনি লিখতে চান যাতে থাকবে শুধু internal facts and internal struggle'। তাঁর মতে—"যীশুখৃষ্ট, চৈতন্য, বুদ্ধ, শঙ্কর, কুমারিল ভট্টের জীবনের বাইরে dramatic events কিছুই নেই বললে চলে। কিন্তু এঁদের ভিতরের জীবন full of dramatic events" যা নিয়ে জগৎ ভুলে আছে—যে কর্মসাধনে জগৎ নিয়ত দৌড়োচ্ছে—এই মহাপুরুষেরা—তা তুচ্ছ মনে করে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর কঠোর কর্মসাধনায় প্রবল সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে জগতের আদর্শরূপে দাঁড়ান—তা কম dramatic নয়। এই যে ভিতরের দ্বন্দ্ব internal dramatic action—যা সামান্য স্থূলভাবে বাইরে প্রকাশ পায়, সেই internal action এঁকে দেখানোই best literary art।"[১৬] তাই তাঁর ঘোষণা—"যে সাধনার বাইরের রূপ স্নিগ্ধ—গভীর নিষ্কম্প দীপশিখার মত কিন্তু ভিতরের রূপ অনন্ত ক্রিয়াশীল,—তাই দেখাতে হবে। যে বীরত্বের কাছে নেপোলিয়নের বীরত্ব তুচ্ছ, যে রাজ্য মরজগতে অমরত্ব স্থাপন করে, যে প্রেম ভালবাসা সমুদ্রের ন্যায় গভীর ও প্রশান্ত তাই drama-তে দেখাতে হবে।"[১৭] কিন্তু "যে ভিতরের দ্বন্দ্ব সামান্য স্থূলভাবে বাইরে প্রকাশ পায়," তাকে অবলম্বন করে নাটকরচনা কতটা সম্ভব এবং গিরিশচন্দ্র তাতে কিরূপ সাফল্য লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে স্বভাবতঃই প্রশ্ন থেকে যায়।

এরূপ দ্বন্দ্ব সৃজন নাটকে প্রায় অনায়ত্ত জেনেই সম্ভবত গিরিশচন্দ্র নাট্যরচনায় অপর একটি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর কোনো কোনো নাটকে দেখা যায় কিছু চরিত্র প্রচ্ছন্ন ভক্ত অর্থাৎ বাইরে বিদ্রোহী, নাস্তিক বা সন্দেহবাদী কিন্তু অন্তরে ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ। বাঙালী ভক্তি ঐতিহ্যে যে 'মিত্রভাবে ভজনায় সাত জন্মে' ও 'শত্রুভাবে ভজনায় তিনজন্মে' উদ্ধারের ব্যবস্থা আছে, এক্ষেত্রেও গিরিশচন্দ্র অনুরূপ ঐতিহ্যের অনুসারী হয়েছিলেন। ফলে সীমাবদ্ধ ভাবে হলেও তিনি কোন কোনো ক্ষেত্রে কিছু বৈপরীত্যের মাধ্যমে নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃজনে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর বহু নাটকেই এ ধরণের চরিত্র আছে, কিন্তু সম্ভবত তাদের মধ্যে সর্বপেক্ষা পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়েছিলো 'জনা' নাটকের বিদূষক। উদ্ধৃতি—

"বিদূষক।···যার বড় বুকের পাটা, তিনিই গিয়ে ভক্ত হোন; আমার অত সখ নেই। বিপদভঞ্জন তো নন, বিপদের ভার ঢেলে দিন।"

নীল। ছিঃ সখা, তুমি এমন কথা বল?

বিদূ। আরে বলি সাধে? এ যে চাক্ষুষ। বিপদভঞ্জন আঠার দিন ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘুরলেন—অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী কাত! মাহিষ্মতীপুরী প্রবেশ করলেন—যুবরাজের মোক্ষলাভ, রাণী পাগল, আর মহারাজকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি, হাজার হাজার বিধবা অগ্নি ছুঁয়ে শুদ্ধ হলো।·····

অগ্নি। আর ঠাকুর, যদি হরি এসে পড়ে।

বিদূ। তাতে কান খাড়া রেখেছি। শ্রীমধুসূদন নগরদ্বারে এলেই অন্ততঃ দুশো ব্যাটা চেঁচিয়ে মুখে রক্ত তুলে মরত, কম ত কম, দু-পাঁচ হাজার রথের চাকায় বৈকুণ্ঠলাভ করত, আর চারদিকে উঠত 'বল হরি—হরি বোল্'—যেন দুলাখ মড়া বেরিয়েছে।···আমি তো সটকাই। রাজা আমার বাঁচার আশা রইল, হরিদর্শনের পর যদি টেঁকে যাও, তবে দেখা হবে, নইলে এই শেষ দেখা।" [৪র্থ অঙ্ক "৩য় গর্ভাঙ্ক]

বিদূষকের প্রস্থানের পর তাই নীলধ্বজ যখন বলেন "এ ব্রাহ্মণের যথার্থ বিশ্বাস" এবং তাঁর জামাতা অগ্নির উচ্ছ্বাস—"এ দ্বিজরাজের চরণধুলির আমি প্রার্থী"—তখন নাট্যকারের অভিপ্রায় সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না। তাই এরূপ অবিশ্বাসী (!) ভক্তকে শ্রীকৃষ্ণ দেখা না দিয়ে পারেন না। উভয়ের সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ—শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রাহ্মণ, তুমি আমায় ভয় কর কেন?

বিদূ। যখন এসে দাঁড়িয়েছ, সে সব ত চুকে গিয়েছে। কিন্তু সাফ বলছি, যেথায় নিয়ে যাও, তুমি যে চাবুক হাতে করে, কি শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ধরে এসে সামনে দাঁড়াবে, আমি তাতে চোখ খুলছি নে; যদি দেখা দেবে বাঁশী ধরে, তোমার রাধিকাকে ডেকে সামনে দাঁড়াও, আমি চোখের কাপড় খুলছি।

শ্রীকৃষ্ণ। ঠাকুর, আমি ব্রজ ছাড়া অনেকদিন, সেরূপ কি করে ধরব ?

বিদু। চেপে যাও না। যে না জানে, তার কাছে ভিরকুটি কোরো। পাণ্ডবেরও ঘোড়া হাঁকাও, আর রাধার কুঞ্জে গিয়ে শোও, এ আমি পাকা জানি। তা না হলে বেদ মিথ্যা হবে। ভাবছ বুঝি—বোকা বামুন খবর রাখে না ? খবর না রাখলে তোমায় অত ভয় কর্তেম না।

শ্রীকৃষ্ণ। দ্বিজোত্তম তোমার অসীম ভক্তি ; দেখ, তোমার পাদস্পর্শে আমার অশ্বত্থদেহ পল্লবিত হয়েছে, তুমি ধন্য—তোমার বিশ্বাস ধন্য।

বিদু। ধন্য ধন্য তো কচ্ছ, যা বল্লুম তা কর না। তা নইলে আমি চোখ খুলছি নে কালাচাঁদ। ঐ যে বুড়ো থুথ্‌থুড়ে বৃষকেতুখেগো রূপে এসে দেখা দেবে তাতে আমি রাজী নই। মুরলীধর হও তো হও, নইলে সোজা পথ আছে—চলে যাও। আর চতুর্ভুজ কর, তার আর চারা কি, কিন্তু চোখের কাপড় খুলছি নে”। [৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]।

এরপরে শ্রীকৃষ্ণের আর ভক্তসন্দর্শনে বাধা থাকেনা এবং গিরিশচন্দ্রের অভিপ্রায়ও ব্যর্থ হয় না।

‘পাণ্ডবগৌরব’ নাটকেও গিরিশচন্দ্র অনুরূপ কৌশলে দ্বন্দ্ব সৃজনের প্রয়াস পেয়েছেন। পাণ্ডব সখা শ্রীকৃষ্ণ। হর্ত্তা কর্ত্তা ত্রাতা জগন্নাথের প্রতি সুগভীর আস্থা ও আত্মসমর্পণ পাণ্ডবচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বাঙলা মহাভাবতের এই ভক্তিপ্রাণতা প্রায় সকল নাটকেই গিরিশচন্দ্র বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। এই ভক্তিপ্রাণতা ও আত্মসমর্পণে নাটকীয় দ্বন্দ্বের বিশেষ কোনো সুযোগ ছিলো না। কিন্তু ‘পাণ্ডবগৌরব’ নাটকে নাট্যকার ভীমচরিত্রের মাধ্যমে একটি নতুন ধরণের দ্বন্দ্ব সৃজন করেছেন শ্রীকৃষ্ণবিরোধী দণ্ডীরাজকে ভীম আশ্রয় দেবাব পক্ষপাতী। তাতে শ্রীকৃষ্ণের বিরক্তি ও শত্রুতা অর্জনেও তাঁব দ্বিধা নেই।

কুন্তী।······শুনি, বৃকোদর করিয়াছে পণ,—
সুভদ্রার অনুরোধে,
যুঝিবে কৃষ্ণের সনে, দণ্ডীব রক্ষণে
দ্বন্দ্ব কৃষ্ণসনে, সন্দ হয় মনে,
পাণ্ডুকুল হইবে নির্মূল,
প্রতিকূল বিধি, তাই এত বিড়ম্বনা।·· [২য় অঙ্ক ; ২য় গর্ভাঙ্ক]

কুন্তীকে আশ্বস্ত করে যুধিষ্টির বলেছেন এ বিরোধিতা ‘নিশ্চয় কৃষ্ণের ছল জেন গো জননী।’ কিন্তু কুন্তী উদ্বিগ্ন, ভীমকে অনুবোধ করেছেন তিনি—

কুন্তী। বৃকোদর,
এ বৃদ্ধ বয়সে ব্যথা দিও না মায়েবে।

ইন্দ্রসম অরি দুর্যোধন,
উপস্থিত রণ,
হরিমাত্র পাণ্ডব সহায় ;—
রণে বনে, দুর্গমে-সঙ্কটে,
পাইয়াছ পরিত্রাণ যাহার কৃপায়,
দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ,
দুর্বাসা পারণে ত্রাতা শ্রীমধুসূদন,
পাণ্ডব-বান্ধব নাম।
তুচ্ছ দণ্ডীহেতু, কর দ্বন্দ্ব তার সনে? [২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

কিন্তু ভীম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাঁর যুক্তি ধর্মবলেই যেহেতু পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের সখ্যতা অর্জন করেছে, অতএব ধর্মের রক্ষণেই কৃষ্ণবিরোধিতা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। যুধিষ্ঠির উদ্বেগ ভরে প্রশ্ন করেছেন—

কেবা কবে পাইয়াছে ত্রাণ,
শত্রু কবি ভগবানে?—

ভীমের উত্তর—"শুনেছি শ্রীমুখে বার বার
হরি কভু শত্রু নহে কার,
মিত্রভাব, শত্রুভাব—তারণ কারণ।...

যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য,"শত্রুভাবে নহে ভাই আমার সাধন। তবে কেন শত্রুভাবে আজি জনার্দন" —ইত্যাদি।

ভীমের মতো গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস করেন—'মিত্রভাব, শত্রুভাব তারণ চারণ', তবু শত্রুভাব কেন? কারণ তার মাধ্যমে কিছু নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃজনের সম্ভাবনা আছে, যা সাধারণভাবে ভক্তি রসাশ্রিত নাটকে সম্ভব নয়। গিরিশচন্দ্রের এই বৈশিষ্ট্য তৎকালীন বাঙালী মানসের নির্ভুল অভিব্যক্তি। বাঙালী জীবনে, পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, দ্বন্দ্বের বিশেষ সুযোগ ছিলো না, তার নবজাগৃতি প্রায় পুরোটাই ঘটেছে মনোজগতে, সমকালীন কর্মজগতে নয়, তাই তাকে কর্মের জগতে ভাবদ্বন্দ্ব আরোপ করতে হয়েছে—কখনো বা কৃত্রিম উপায়ে। গিরিশচন্দ্রের এই নতুন ধরণের দ্বন্দ্ব সৃজনও নাট্যকারের আরোপিত, কৃত্রিম বিরোধের মাধ্যমে নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টির প্রচেষ্টা মাত্র।

চার

জগৎ ও জীবনের সমস্যা ও দ্বন্দ্ব গিরিশচন্দ্রের কাছে প্রধানত ধর্মীয় (religious)। দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে নৈতিক (moral)। 'কাব্যে নীতি' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক সমালোচনা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে সকল

মন্তব্য করেছিলেন, সে আদর্শকেই তাঁর সাহিত্য জীবনের ধ্রুবপদ বলা চলে। অতএব দ্বিজেন্দ্র মানস গঠন বিচারে উক্ত প্রবন্ধ থেকে বিশেষ বিশেষ অংশউদ্ধৃত হলো।

১. "দুর্নীতি কাব্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। যাহারা ধর্ম ও নীতির দিকে, তাহারা আমার সহায় হউন।"[১৮]

২."…অশ্লীলতা ঘৃণার্হ বটে কিন্তু অধর্ম ভয়ানক। ঘরে ঘরে বিদ্যা হইলে সংসার আস্তাকুড় হয়; কিন্তু ঘরে ঘরে এই চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়। সুরুচি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সুনীতি অপরিহার্য।"[১৯]

৩ "যাহার মূলে দুর্নীতি তাহা কাব্য হয় না। আর যে কাব্য পড়িয়া কোনও উচ্চ প্রবৃত্তির উত্তেজনা না হয়, যাহা পড়িয়া কেহ নিজেকে মহত্তর ও পবিত্রতর বিবেচনা না করে তাহা উচ্চ কাব্য হয় না। দুর্নীতি সত্ত্বেও কাব্য চমৎকার হয় না।"[২০]

উক্ত মন্তব্যগুলো রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদার' প্রতি সুপ্রযুক্ত কিনা অথবা সামগ্রিকভাবে সাহিত্য বিচারে উক্ত মানদণ্ড কতটুকু গ্রহণযোগ্য সে প্রসঙ্গ পৃথক, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রমানস এ উক্তিগুলোর মাধ্যমে নির্ভুলভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। জগৎ ও জীবনব্যাপারে তাঁর এই একান্ত ব্যক্তিগত নীতিবোধ তার নাট্যরচনাকে গভীরভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই নীতিবোধ কখনো এসেছে স্বদেশ প্রেমের রূপ ধরে, (প্রতাপ-সিংহ, দুর্গাদাস নাটকে), কখনো বিশ্বপ্রেমের বেশে (মেবারপতন নাটকে), আবার কখনো বা স্বামী-স্ত্রীর সামাজিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে (বঙ্গনারী পরপারে নাটকে)। সাহিত্য তথা নাটক নীতিবোধ অবলম্বন করে রচিত হতে পারে, কিন্তু তা প্রধানতম বা একমাত্র বলে বিবেচিত হতে পারে না। বিশেষত নীতিবোধ দেশ বা কালভেদে বিভিন্ন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সর্বজনীন, সর্বকালীন। কাজেই কোনো প্রচলিত নীতিবোধের মানদণ্ডে সাহিত্য বিচারে প্রবৃত্ত হলে পূর্ণচন্দ্র বসুর মতো 'সাহিত্যে খুন' জাতীয় প্রমাদে পতনের সম্ভাবনা থেকে যায়। তাছাড়া, নীতিবোধ যদি নাটকীয় চরিত্রের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্ব থেকে স্বতোৎসারিত না হয়, নাট্যকারের বিশেষ প্রবণতা যদি বাইরে থেকে তা চাপিয়ে দেবার পদ্ধতি গ্রহণ করে, তবে রচনাহিসেবে তা দুর্বল হতে পারে। কেননা নাটকীয় দ্বন্দ্ব সেক্ষেত্রে কৃত্রিম ও বর্ণহীন হয়ে পড়ে। সম্ভবত সে কারণেই দ্বিজেন্দ্রনাটক সম্পর্কে সমালোচক মন্তব্য করেছেন— "নাটকের মধ্যে ভাবদ্বন্দ্ব ও সূক্ষ্ম সংঘাত অনিবার চেষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্বত্র কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।"[২১]

নীতিবোধ ব্যতীত অপর যে প্রবণতা দ্বিজেন্দ্রনাটককে—বিশেষত 'সাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' অর্থাৎ তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল বলে স্বীকৃত নাটকদ্বয়কে— প্রভাবিত করেছে, তা হলো পিতামাতা ও সন্তান সম্পর্ক (Parents-children relation), সাধারণ ভাবে বাৎসল্যরস। সাজাহানে তিনি যতোই বিপরীত

প্রবৃত্তির সংগ্রাম দেখাতে চান না কেন, শেষ পর্যন্ত পিতাপুত্র—সম্পর্ক বিশেষত অকৃতজ্ঞ পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ ও ক্ষমা প্রধান স্থান গ্রহণ করে, ফলে নাটকের ভারসাম্য বিচলিত হয়ে রস প্রতীতিতে বিঘ্ন সম্পাদন করে। সাজাহান অপেক্ষাও এই বৈশিষ্ট্যটি আরো উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে চন্দ্রগুপ্ত নাটকে। চন্দ্রগুপ্ত নাটকে সর্বসাকুল্যে পাঁচটি কাহিনীধারা আছে, যথা - এক, চন্দ্রগুপ্তের মূল কাহিনী অর্থাৎ চাণক্যের সাহায্যে নন্দ বংশ ধ্বংস করে মৌর্য বংশ স্থাপন; দুই, চন্দ্রগুপ্ত-ছায়া; তিন, চন্দ্রগুপ্ত-হেলেন আন্টিগোনাস; চার আন্টিগোনাস সেলুকস আন্টিগোনাসের মাতা; পাঁচ, চাণক্য ও তাঁর কন্যা। এই পাঁচটি কাহিনীধারা সুসংহত হয়ে একটি জৈব সমগ্রতা লাভে ব্যর্থ হয়েছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে ছায়া ও হেলেন কাহিনীকে তবু মেলানো চলে, কিন্তু আন্টিগোনাস ও তার মাতার সম্পর্ক এবং চাণক্যের কন্যা নাটকে একেবারেই অনাবশ্যক। তারা এসেছে একান্তভাবেই, নাট্যকারের বাৎসল্যরস প্রীতির সূত্র ধরে, অনিবার্য নাটকীয় প্রয়োজনে নয়। অবশ্য চাণক্যের কন্যা আত্রেয়ীকে নিয়ে এখানে সন্দেহ হতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে, আত্রেয়ীর অবতারণা ব্যতীত চাণক্যের হৃদয় পরিবর্তন সম্ভব হতো কি? বিশেষত calamity থেকে divinityতে উত্তরণই তো শ্রেষ্ঠ নাটকীয় চরিত্রের লক্ষণ। চাণক্যের চরিত্রে এ উত্তরণ সঙ্গত ও স্বাভাবিকভাবে হয়েছে কিনা, কিংবা নাট্যকার জোর করে তা বাইরে থেকে চাপিয়ে দিয়েছেন সে কূট তর্কে না গিয়েও বলা যায় নাটকে চাণক্য চরিত্রের পরিবর্তন দেখানো নাট্যকারের প্রাথমিক ও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো না, কেন না আপন বাহুবলে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য স্থাপন অর্থাৎ হিন্দু জাতির বীরত্ব প্রদর্শনই নাটকের প্রধান বিষয়। অন্তত নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার সেই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করেছেন। বাহুবলের সঙ্গে প্রয়োজন রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি—ভারতীয় 'মেকিয়াভেলী' চাণক্য নাট্যকারের কাছে সেই বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। নাটকের নায়ক চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য নয় এবং নামকরণের মাধ্যমেও নাট্যকারের সেই উদ্দেশ্য প্রকাশিত। কাজেই চাণক্য চরিত্রের পরিবর্তন ও উত্তরণ নাটকে অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। সেই হিসেবে চাণক্যের ব্যক্তিগত জীবন অতিরিক্ত প্রাধান্য পাওয়ায় নাট্যকারের fixity of purpose বিনষ্ট হয়েছে। এই fixtty of purpose বিনষ্ট হবার মূলে নাট্যকারের ব্যক্তিগত জীবনের বাৎসল্য রসপ্রীতি। "সাধ্বী পত্নীর আকস্মিক অন্তর্ধানে যখন তাঁহার শিরে অশনিসম্পাত হইল তখন অসহায় দ্বিজেন্দ্রলাল এই অজ্ঞান শিশু দুটিকে অনন্ত অবলম্বন বোধে সেই-যে বাহু বেষ্টনে, অসীম আগ্রহে আপন বক্ষতলে আঁকড়িয়া ধরিলেন,—জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তাহারাই এ সংসারে তাঁহার একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা ও আশ্রয় হইয়া রহিল।··· সাজাহান চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি নাটকের পত্রে-পত্রে ও ছত্রে-ছত্রে হৃদয়ের শোনিত বিন্দু দিয়া তিনি বাৎসল্য

স্নেহের যে সকল মর্মভেদী করুণ দৃশ্য অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখিলে, অদম্য অশ্রুবেগ সংবরণ করা দুষ্কর হইয়া ওঠে। ঐ সব রচনা, ঐ সব চিত্র বাৎসল্য প্রাণ দ্বিজেন্দ্রলালের উচ্ছ্বাসিত পিতৃহৃদয়ের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অবিকৃত অভিব্যক্তি মাত্র;—উহাতে চেষ্টা বা কষ্ট কল্পনার তিলার্ধ সংস্রব নাই।"২২ সমালোচকের এ বিশ্লেষণ দ্বিজেন্দ্রলালের মানস প্রকৃতির ওপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করেছে বলা যায়। অবশ্য এর ফলে নাটকের কেন্দ্রীয় ঐক্য বিপর্যস্ত কিংবা নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে কিনা সে প্রসঙ্গ সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

বাৎসল্যরসের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের এই অতিমনস্কতা তাঁর ব্যবহারিক নীতিবোধের সূত্র ধরেই এসেছে। ব্যবহারিক নীতিবোধ কতকগুলো উচিত অনুচিতের বিধি নিষেধে আবদ্ধ। ভারতীয় পরিবারে পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও সন্তান স্নেহ অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই কর্তব্যের প্রতি দর্শক ও পাঠককে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ সাংসারিক পাপপুণ্য বোধ দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যচেতনাকেও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় যে আদর্শ প্রকাশিত, তা নাটকের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও চরিত্রগত সংঘর্ষের অনিবার্য পরিণতি নয়, তা অনেক সময় নাট্যকারের আরোপিত প্রবণতা ও বিশ্বাসের ফসল। বিল্বমঙ্গল নাটক সমালোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যে মন্তব্য করেছেন, তা সাধারণভাবে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রধান নাটকগুলোর প্রতি প্রয়োগ করা চলে। তিনি লিখেছেন--"বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবনে প্রকৃত নাটিক উপাদানের অভাব ছিলো না, কিন্তু নাট্যকার বিশেষ আদর্শ প্রণোদিত হইয়া এই নাটকগুলি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া সেই সকল উপাদান কোন উচ্চাঙ্গ নাট্যরচনায় নিয়োজিত না করিয়া আদর্শ সেবাতেই নিয়োজিত করিয়াছেন।"২৩

গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে এ পদ্ধতি অবলম্বন ব্যতীত উপায় ছিলো না। কেন না তাঁরা উভয়েই ছিলেন একান্ত স্বকাল ও স্বদেশে সীমাবদ্ধ। বিশেষত সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকদের প্রবণতার ওপর তাঁদের নির্ভর করতে হয়েছে অধিক। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সমকালীন শিক্ষিতরুচিদর্শক নাটকে তখন কি প্রত্যাশা করতেন তার বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে অতএব আর না প্রবেশ করে একটি উদ্ধৃতি দিয়েই এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটানো যেতে পারে। 'আর্যদর্শন' উনবিংশ শতাব্দীর একটি বিখ্যাত সাহিত্য পত্র। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত 'দৃশ্য কাব্য বা নাটক' নামক প্রবন্ধে জনৈক লেখক লিখেছেন—"প্রকৃত পক্ষে,—মানুষ প্রকৃতির মহত্ত্ব প্রদর্শন করাই নাটকের জীবন। একজনের মহত্ত্ব প্রদর্শন করিতে হইলেই অপরের নীচত্ব দেখান চাই। ...যে কবি দৃশ্য-কাব্যে কুশল তিনি ঘটনার সার প্রদর্শন করিবেন। সামান্য অসার ক্ষুদ্র ঘটনা সকল পরিত্যাগ করিবেন। তিনি ভক্তি, প্রেম, সরলতা,

উদারতা, স্নেহ প্রভৃতি উন্নত বৃত্তিসকল এবং লোভ, কুটিলতা স্বার্থপরতা প্রভৃতি নীচবৃত্তি সকলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবেন।"[২৪] এ অভিমতের মাধ্যমে সমকালীন নাট্যরসিক বাঙালীর মানসিক প্রবণতা অভিব্যক্তি লাভ করেছে বলা যায়। এবং এই প্রবণতার সূত্র ধরেই বাংলা নাটকে এসেছে আদর্শের আধিপত্য। কাজেই উক্ত প্রবন্ধ লেখক যখন সিদ্ধান্ত করেন—"যিনি ইহাতে অশক্ত, দৃশ্যকাব্যে হস্তক্ষেপণ করা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা"—তখন নাট্যকার হিসেবে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল অন্যসকলের অপেক্ষা কেন শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হলেন, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

পাঁচ

মধুসূদন দীনবন্ধুর মানবমুখীনতা ও গিরিশ-দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শকেন্দ্রিকতার উভয়মুখী ধারার কোনো এক মধ্যস্থলে রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পর্যায়ের অবস্থান। অবশ্য মধুসূদন-দীনবন্ধুর মানবমুখীনতা প্রধাণত ছিলো ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রতিষ্ঠা ও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শ কেন্দ্রিকতা ছিলো মূলত ব্যবহারিক পাপপুণ্য বোধের সঙ্গে জড়িত। মধুসূদন-দীনবন্ধুর মানবমুখীনতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাধর্ম থাকলেও তাঁর আদর্শচেতনা গিরিশ-দ্বিজেন্দ্রলালের পাপপুণ্য বোধ সমন্বিত আদর্শ জগৎ থেকে প্রায় বিপরীত প্রান্তবাসী। গিরিশ-দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শবোধ যেখানে ধর্ম ও নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, রবীন্দ্রনাথের আদর্শবোধ সেখানে আত্মিক (spiritual) সুষমায় মণ্ডিত।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'রাজা ও রাণী'র দ্বন্দ্ব মূলত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দ্বন্দ্ব। বিক্রম ও সুমিত্রা উভয়েই নিজস্ব প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা উভয়কে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট এবং উভয়ের এই প্রবল ইচ্ছাশক্তি অহংবোধের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত যে কোনো এক সাধারণ কেন্দ্রবিন্দুতে তাদের মিলন প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রন্ধ্রপথেই রোপিত হয়েছে ধ্বংসের বীজ। 'রাজা ও রাণী' নাটকের এই সমস্যা মূলত মানবিক সমস্যা, আসক্তি ও প্রবৃত্তির প্রবল আবেগে আন্দোলিত। এই নাটকের জীবনাদর্শ সাংসারিক কোনো পাপপুণ্য বোধের দ্বারা আক্রান্ত নয়। এই রীতি, সাধারণভাবে বলা যায়, শেকস্‌পীরীয় রীতি। শেকস্‌পীয়রের নাটকেও moral ও ethical problem-গুলো প্রচণ্ডভাবে এসেছে, কিন্তু তা সর্বদাই চরিত্রের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকে স্বতোৎসারিত হয়েছে, নাট্যকারের মানসপ্রবণতা তাকে নিয়ন্ত্রিত করে নি। সমালোচকের মতে তাই শেকস্‌পীয়র এমন একজন নাট্যকার for whom the ethical can never be isolated…from the sensuous and emotional life of the people involved [২৫] এবং সেজন্যই his characters are living men and women [২৬] অর্থাৎ নাট্যকারের হাতের পুতুল নয়।

পরবর্তী নাটক 'বিসর্জনে' রবীন্দ্রনাথ এই নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হন নি।

অবশ্য 'রাজা ও রাণী' নাটকে বিক্রমদেবের শেষ . সংলাপেই নাট্যকারের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু 'বিসর্জনে' তার আত্মপ্রকাশ নিঃসন্দেহে পৃথক বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক। রঘুপতির তুলনায় গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্ব স্পষ্টতই তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আদর্শের প্রতিফলন। নচেৎ নাটকের প্রারম্ভে বিরোধী শক্তি হিসেবে রঘুপতি যে মহিমা ও যুক্তিসহ আবির্ভূত হয়েছে, তা কোনো অংশেই গোবিন্দ মাণিক্যের তুলনায় হীনপ্রভ ও অনুজ্জ্বল ছিলো না। বরং গোবিন্দমাণিক্য অপেক্ষা রঘুপতি অনেক বেশী human, নাটকীয় চরিত্র। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য থেকেই রঘুপতির পতন আরম্ভ হয়েছে। যে চরিত্র প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে রাজার সঙ্গে বিরোধিতায় বৃদ্ধ সেনাপতি নয়নপালকে উত্তেজিত করে ব্যর্থ হয়েও তাকে 'ধন্য বটে ধন্য তুমি' বলে অভিনন্দন জানিয়েছে, সেই রঘুপতিই. মাত্র কয়েকটি দৃশ্য পরে নক্ষত্র রায়ের সঙ্গে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এবং তঞ্চকতার দ্বারা জনমানসকে প্রতাড়িত করতে চেয়েছে। রঘুপতির এই পরিবর্তন যতটা না চরিত্রের আভ্যন্তরীণ বিকাশের ফলে সম্ভব হয়েছে, তার চাইতে অনেক বেশী হয়েছে নাট্যকারের নির্দিষ্ট পক্ষাবলম্বনের ফলে। এই পক্ষাবলম্বন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ ও নীতিবোধের প্রকাশ ব্যতীত কিছু নয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও নীতিবোধকে গিরিশচন্দ্রের মতো ধর্মীয় বা দ্বিজেন্দ্রলালের মতো ব্যবহারিক নীতিবোধের সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত করা চলে না। কিন্তু তবু তা জগতের পাপপুণ্যবোধের সঙ্গে জড়িত। তাই রঘুপতি যখন জয়সিংহকে উপদেশ দেয়—"পাপপুণ্য কিছু নাই" [১ম অঙ্ক ২য় দৃশ্য] তখন স্পষ্টতই এ প্রতিপাদ্যের প্রতি রবীন্দ্র মানসের বিরোধিতা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাটকদ্বয় 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'মালিনী'তে যথাক্রমে অনুরূপ মানবিক ও আদর্শগত সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছে। অবশ্য মালিনীতে রবীন্দ্রনাথ এই উভয় সমস্যাকে একসঙ্গে মিলিয়ে একটি নতুন মূল্যমানের সৃষ্টি করেছেন। ক্ষেমঙ্কর ও মালিনীর দ্বন্দ্ব আদর্শের দ্বন্দ্ব —দুই বিপরীত জীবনবোধের দ্বন্দ্ব। যেমন, গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতির দ্বন্দ্ব। কিন্তু সুপ্রিয়-মালিনী ক্ষেমঙ্করের হৃদয়গত সম্পর্ক এই নির্জীব দ্বন্দ্বের মধ্যে মানবিক মাত্রা এনে দিয়েছে। তাই সুপ্রিয়কে হত্যা করে বন্দী ক্ষেমঙ্কর যখন ঘাতককে আহ্বান জানিয়েছে তখন মালিনীর 'মহারাজ' ক্ষম ক্ষেমঙ্করে' (চতুর্থ দৃশ্য) উক্তি ও মূর্চ্ছা তাকে গোবিন্দ মাণিক্যের মতো নিষ্প্রাণ আদর্শের প্রতীক করে রাখে নি। ক্ষেমঙ্করের প্রতিই আসলে মালিনী অনুরক্ত ছিলো কি না সে প্রশ্নে প্রবেশ না করেও বলা যায় তার সমাপ্তিকালীন অনুভাব মানুষী-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। অথচ প্রিয়পাত্র জয়সিংহের অপ্রত্যাশিত মৃতদেহ গোবিন্দমাণিক্যকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে নি, মহাদেবীর জন্য আনীত পুষ্পার্ঘ তিনি অক্লেশে জয়সিংহকে অর্পণ করেছেন। ফলে তাঁর চরিত্র যথার্থ human হয়ে উঠতে পারে নি।

অর্থাৎ মানবমুখীনতা ও আদর্শপ্রাণতা—এই উভয়বিধ মূল্যবোধের টানাপোড়েনে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের নাটক বিধাম্বিত। এই উভয়মুখী সমস্যার একটি রাবীন্দ্রিক সমাধান সন্তোষজনক ভাবে তাঁর প্রথম পর্বের নাট্যজীবনে সম্পন্ন হয়েছিলো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন 'পুরোনো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা কেনা, আর চলিবে না। আমাদের স্বল্পবিত্ত জাতীয় জীবনে এমন কিছু কর্মকাণ্ড নেই যাকে কেন্দ্র করে প্রবল ভাবদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে। নবজাগৃতি যুগের যে সমাজ বিন্যাসের পটভূমিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত প্রবলভাবে হতে পারে, সে-বিন্যাস ঐতিহাসিক কারণেই আমাদের পক্ষে অধিকার করা সম্ভব হয় নি। তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব বাঙলা নাটকে সার্থকভাবে কখনো সৃষ্ট হতে পারে নি। উপরন্তু আর্থ-রাজনৈতিক বিষয়ে আমাদের প্রবেশ কুণ্ঠিত ও বাধাগ্রস্থ ছিলো বলে ধর্মীয় সামাজিক পরিমণ্ডলে সহজ সঞ্চরণে বাধ্য হয়েছি। সে কারণেই নাটকেও ধর্মীয় ও নীতিগত আদর্শ প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যজীবনের সূচনাপর্বে এই উভয়বিধ ধারাতেই বিহার করেছেন কিন্তু কোথাও স্বচ্ছন্দ হতে পারেন নি। এই পর্বের অন্তিমলগ্নে তিনি সম্ভবত উপলব্ধি করেছেন অতিরিক্ত আদর্শপ্রাণতা তাকে ব্যবহারিক পাপপুণ্যের জগতে নিয়ে যাবে এবং ফলে নাট্যরচনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেন না নাটকে তাঁর অবলম্বিত জগৎ কখনই গিরিশ-দ্বিজেন্দ্রলালের সমতুল্য হোক তিনি তা চান নি। পেশাদার রঙ্গালয়াশ্রয়ী নাট্যসাহিত্যের প্রতি তাঁর আত্যন্তিক বীতরাগ শুধুমাত্র রুচিগত বিভেদের জন্য নয়, এই অনীহা দুই বিপরীত জীবনবোধের গভীরে নিহিত।

ছয়

মধুসূদন-দীনবন্ধুর মানবতাবাদ, গিরিশ-দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শমুখ্যতা, এমন কি রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের নাটকে প্রকাশিত যে জীবনদর্শন তা মূলত নবজাগৃতিযুগের নির্দিষ্ট মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তা বিশেষ করে উনিশ শতকীয় বাঙালীব চিন্তাজগতে সীমাবদ্ধ। এই মূল্যবোধ নব অর্জিত জাতীয়তাবোধের সঙ্গে ছিলো গভীরভাবে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী পর্যায়ের নাটক -তাঁর সাংকেতিক নাটক—বাঙালীর নাট্যচেতনাকে জাতীয়তাবোধ থেকে আন্তর্জাতিকতায় উপনীত কবে দিলো। বাঙলা নাটক পদার্পণ করলো বিংশ শতাব্দীতে।

রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ শারদোৎসব রাজা ও ডাকঘর নাটকে মূলদ্বন্দ্ব প্রধানত আত্মিক (spiritual)। এ সকল নাটকের জগৎ গিরিশ-চন্দ্রের ধর্মীয় (religious) অথবা দ্বিজেন্দ্রলালের নৈতিক (moral) জগৎ থেকে নিঃসন্দেহে ভিন্ন প্রান্তবাসী। এমন কি তা রবীন্দ্রনাথেরই পূর্ববর্তী পর্যায়ের আদর্শ-বাদের সমশ্রেণীক নয়। উভয়ের মধ্যে একটিমাত্র সাধারণ সাদৃশ্য আছে, যার মূল নিশ্চয়ই খুব গভীরে নিহিত নয়। উনিশ শতকে, সম্ভবতঃ নীলদর্পণ ও অন্য দু'একটি

নাটক ব্যতীত নাটকে যে দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে তা মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এই সকল নাটকে নাটকীয় ভাবের তরঙ্গ বিক্ষোভ, তার ক্রিয়ার উত্থান-পতন ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। অবশ্য একই নাটকে কখনো কখনো একাধিক চরিত্র এই আবর্তে এসে পড়েছে কিন্তু তবু তাকে সমষ্টি লক্ষণে চিহ্নিত করা চলে না। অর্থাৎ সেই সমস্যা বা দ্বন্দ্ব একটি বিশেষ শ্রেণীর সমস্যা বা দ্বন্দ্ব নয়। কেন না একাধিক ব্যক্তি একত্র হলেই একটি শ্রেণী হয় না যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত সাংকেতিক নাটকত্রয়তেও মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা ও দ্বন্দ্বই প্রাধান্য লাভ করেছে। ডাকঘরের সমস্যা বা ভাবদ্বন্দ্ব অমলকে কেন্দ্র করে তো বটেই, এমন কি শারদোৎসব ও রাজার সমস্যাও মূলত উপনন্দ ও সুদর্শনার সমস্যা। এরা উভয়েই বিশেষ ব্যক্তিলক্ষণে চিহ্নিত। যদিও তাদের মধ্যে প্রতীকী তাৎপর্য অলক্ষ্য নয়। অবশ্য শেষোক্ত নাটকদ্বয়তে সমষ্টির প্রাধান্য অস্পষ্ট থাকেনি, তবু তাবা সর্বদা নাটকীয় সমস্যার কেন্দ্রে আবর্তিত হয় নি।

কিন্তু অচলায়তন থেকে সুরু করে কালের যাত্রা পর্যন্ত রবীন্দ্র নাথের সাংকেতিক নাটকের উত্তরপর্বে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা আর প্রধান স্থান অধিকার করে রইলো না। এ সকল নাটকে যে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব তা ব্যক্তিহৃদয়ের গভীরে প্রোথিত নয়, তা সমষ্টির সুখদুঃখ বা ভালোমন্দের সঙ্গে জড়িত। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, এখানে শ্রেণীগত সমস্যাই প্রাধান্য পেয়েছে। ফাল্গুনী নাটকটি যদিও এপর্যায়ের অপর নাটকগুলো থেকে প্রকৃতিতে পৃথক তবু তার মধ্যেও এই সমষ্টি বোধই কার্যকরী হয়েছে। সমালোচকের মতে "Modern drama goes far beyond Hume in rejecting the notion of personal identity , it does not believe in the existence, the being, the integrity of the person. The most brilliant modern dramatists have denied even the approximate coherence of the selves which trade under a single name. They do not believe in dialogue.[২৭] রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এমন প্রচণ্ড আধুনিক নন, সংলাপহীন নৈঃশব্দে নাটককে নির্বাসনে দেবার পক্ষপাতী তিনি নিশ্চয়ই নন. তবু তিনি যখন ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব থেকে সমষ্টির সমস্যা বা শ্রেণীদ্বন্দ্বে উপনীত হন, তখন নির্ভুলভাবে তাঁর নাটকে বিশ শতকীয় আধুনিকতার অন্ততঃ কিছু বৈশিষ্ট্য দীপ্যমান হয়ে ওঠে এবং সে বৈশিষ্ট্য উনিশ শতকে গড়ে ওঠা বাঙালীর মূল্যবোধ থেকে অবশ্যই পৃথক। অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্ত করবী ও কালের যাত্রা—এই চারটি নাটকেরই শেষাংশে রয়েছে ভাঙার চিত্র, ধ্বংসের আহ্বান। প্রচলিত প্রতিষ্ঠান, মুমূর্ষু মূল্যবোধ শোষণের কারাগার ভেঙে বিজয়ী হয়েছে কোনো বিশেষ বীর নয়, সাধারণ মানুষ। স্বভাবতই এরূপ দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সমষ্টি তথা শ্রেণীই প্রাধান্য পেয়ে থাকে এবং ব্যক্তিহৃদয়ের ভাবতরঙ্গ তার পুরোনো মর্যাদা হারাতে বাধ্য হয়। এটিকেই বিশেষ করে বিশ শতকীয় বৈশিষ্ট্য বলা চলে, কেন না আধুনিক কালেই মানুষ যতটা না ব্যক্তিলক্ষণে চিহ্নিত, তার চাইতে অনেক বেশি শ্রেণী

চরিত্রের অন্তর্গত। সেজন্যই আধুনিক কালের তাত্ত্বিক নাট্যদ্বন্দ্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এই সমষ্টিকেন্দ্রিকতার প্রতি নির্দেশ করে বলেন—"the essential character of drama is social conflict—person against other persons, or individual against groups, or groups against other groups[২৮] ইত্যাদি। এখানে ব্যক্তি অপেক্ষা সমষ্টির প্রতি সমালোচকের মনস্কতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথেও এই আধুনিকতার প্রকাশ ঘটেছে আত্মিক উত্তরণ থেকে সমষ্টির পরিত্রাণের সূত্র ধরে। তাই বাংলা নাটকের দ্বন্দ্বচেতনা যখন মধুসূদনের ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা থেকে যাত্রা করে রবীন্দ্রনাথের সমষ্টিপ্রাণতায় উপনীত হয়েছিলো, তখন সঙ্গতভাবেই সিদ্ধান্ত করা চলে যে এই চিহ্ন অবলম্বন করেই আমাদের নাট্যসাহিত্য উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করেছিলো।

এখন আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এই দ্বন্দ্বচেতনা বাঙালী নাট্যকারদের ট্র্যাজিকদৃষ্টি ও কমেডিবোধকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিলো এবং তা কতটা সার্থক ও ফলপ্রসূ হতে পেরেছিলো। পরবর্তী অধ্যায়ে সে প্রচেষ্টা করা হলো।

১ কালীপ্রসন্ন ঘোষ : নাটক—সমালোচনা সাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত (এ. মুখার্জী—১৯৪৯), পৃ ২০৪
২ দ্বিজেন্দ্ররচনাবলী : (সাহিত্য সংসদ : ১৯৬৪) পৃ ৬৫২
৩ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় : নাটক (সাহিত্য—ফাল্গুন, ১৩২১), পৃ ৮৩৫
৪ তদেব—পৃ ৮৪১
৫ কালীপ্রসন্ন ঘোষ—তদেব, পৃ ২০৪
৬ নীরেন্দ্রনাথ রায় : সাহিত্য-বীক্ষা (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি—১৯৪৯) পৃ ১০১
৭ সুশীলকুমার দে : দীনবন্ধু মিত্র (এ. মুখার্জী—১৩৫৮) পৃ ১৫
৮ তদেব—পৃ ১৪
৯ তদেব—পৃ ১৫-১৬
১০ দীনবন্ধু রচনাবলী : (সাহিত্য সংসদ) ভূমিকা—পৃ ২১
১১ গিরিশ রচনাবলী : পৃ ৭৪৭
১২ তদেব—পৃ ৭৪১
১৩ Irving Ribner : Patterns in Shakspearian Tragedy (Mathuen : 1960) P. 6
১৪ Op. Cit—P 6 7
১৫ সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় : দৃশ্যকাব্য পরিচয় (বসুমতী সাহিত্য মন্দির ১৯৫০) পৃ ১০৪
১৬ কুমুদবন্ধু সেন :—গিরিশচন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য—পৃ ৫৯-৬০
১৭ তদেব—পৃ ৬০
১৮ দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী—পৃ ৭০১
১৯ তদেব—পৃ ৭০২-৭০৩

২০ তদেব—পৃ ৭০৩

২১ সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় : তদেব—পৃ ৪৪৮

২২ দেবকুমার রায়চৌধুরী : দ্বিজেন্দ্রলাল (১৩২৮) পৃ ৫৬৫ ৬৬

২৩ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) পৃ ১৭৬

২৪ দৃশ্যকাব্য বা নাটক : আর্যদর্শন (জ্যৈষ্ঠ—১২৮১)

২৮ Ronald Gaskell : Drama and reality (Routledge & Kegan Paul : 1972) P. 9

২৬ Op. Cit—P. 9

২৭ M. C. Bradbrook : English Dramatic Form (Chatto & Windus : 1965) P. 179

২৫ J. H. Lawson : Theory and Technique of Play writing (Hill & Wang : 1960) P. 160

———

পঞ্চম অধ্যায়

প্রসঙ্গ : ট্র্যাজেডি, মেলোড্রামা

এক

প্রথম বাঙলা মৌলিক নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে—কীর্তিবিলাস ও ভদ্রার্জ্জুন। কীর্তিবিলাস ট্র্যাজেডি এবং ভদ্রার্জ্জুন কমেডি। অর্থাৎ রসপ্রকাশের বিচারে নাটকে যে দুটি প্রধান ধারা আছে, বাঙলা নাটকের সৃষ্টিলগ্নে উভয়কেই বাঙালী নাট্যকার অবলম্বন করেছিলেন। এটিকে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। অতঃপর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত 'বিধবা বিবাহ নাটক'। স্বয়ং নাট্যকারের ঘোষণা অনুযায়ী এ নাটকটি is the first attempt made to introduce the regular tragedy into Bengallee drama। সমালোচকের সিদ্ধান্ত—নাট্যকারের এই দাবি অযৌক্তিক নয়, কেননা "ইহার পরিণামে এমন একটি দুরতিক্রম্য অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাহাতে ইহা কেবলমাত্র বিয়োগান্তক নাটক বলিয়াই গৃহীত হইবার যোগ্য নহে, ইহাকে বাঙলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ট্র্যাজেডি বলিয়াও উল্লেখ করা যাইতে পারে।"[১] অতঃপর মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' রচনার মাধ্যমে বাঙলা নাট্যসাহিত্যে ট্র্যাজেডি একটি উল্লেখযোগ্য মানে উপনীত হতে সক্ষম হলো। বাঙলা কমেডিও অনুরূপভাবে 'ভদ্রার্জ্জুন' থেকে যাত্রা সুরু করে 'ভানুমতীচিত্তবিলাসের' মাধ্যমে শেকস্পীয়র স্পর্শ করে রামনারায়ণ তর্করত্ন ও কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রহসনের প্রান্ত ছুঁয়ে 'শর্মিষ্ঠায়' এসে স্থিত হলো।

কিন্তু বাঙালী নাট্যকারগণ কমেডি রচনায় যতটা নিরঙ্কুশ ছিলেন, ট্র্যাজেডি রচনার ক্ষেত্রে তেমন হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কেন না, ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্ত নাটক ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী বলে প্রচলিত ছিলো। অবশ্য কেন এরূপ নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছিলো তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। সাহিত্য দর্পণকার নানা নিষেধের মধ্যে নাটকে বধ দৃশ্যকেও অপাঙক্তেয় বলে ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু তাতে বিয়োগান্ত নাটক নিষিদ্ধ এমন বোঝায় না। ধনঞ্জয় তাঁর দশরূপকে বলেছেন নাটকে বধ প্রত্যক্ষভাবে দেখানো চলবে না। আচার্য ভরত কিন্তু অনুরূপ প্রসঙ্গে 'বধ' শব্দটির বদলে 'মরণ' ব্যবহার করেছেন। ফলে বিষয়টি আর এক থাকে নি, কেননা 'বধ' আর 'মরণ' নিঃসন্দেহে সমার্থক নয়।[২]

নাট্য—৭

নাট্যকার ভাস বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত 'ঊরুভঙ্গম্' নামক একাঙ্ক নাটকটি বিয়োগান্ত। অধ্যাপক ভিন্টারনিজের মতে এ নাটকটি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের মধ্যে একমাত্র বিয়োগান্ত নাটক। উক্ত নাটকটির আধুনিক কালের সম্পাদক অধ্যাপক দেবাধর এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—The Urubhanga is a tragedy of Duryodhana's defeat and death; against the canons of orthodox sanskrit dramaturgy the author introduces death and frightful forms of death on the stage[৩] অর্থাৎ কালিদাস পূর্ববর্তীকালে সংস্কৃত নাটকে বধ দৃশ্য সংস্থাপনা বা বিয়োগান্ত উপসংহার অপ্রাপ্য বা নিষিদ্ধ ছিলো না। পরবর্তীকালে এই বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে। নাট্যাভিনয়ের ফল হিসেবে ভরত মুনি যখন চতুর্বর্গ অর্থাৎ অর্থ কাম ধর্ম ও মোক্ষকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন, সে সূত্র অবলম্বন করেই এরূপ নিয়ম প্রবর্তিত হওয়া সম্ভব হতে পাবে। এবং সেজন্যেই উনিশ শতকীয় বাঙালী সমালোচক ঘোষণা করেছিলেন—"বাস্তবিক, যাহা ইউরোপে tragedy বলিয়া বিখ্যাত, আমাদের দেশে দশরূপক মধ্যে তাহার স্থান হইতে পারে না। কারণ তাহা হিন্দু ধর্মাদর্শের বিপরীত হওয়াতে নাটকীয় নিয়ম ও আদর্শেরও বিপরীত হইয়াছে।"[৪]

এরূপ পরিস্থিতিতে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত যখন প্রথম ট্র্যাজেডি রচনা করেছিলেন, তখন দীর্ঘ ভূমিকা লিখে আত্মসমর্থনে বাধ্য হয়েছিলেন—"ভারতবর্ষীয় পূর্বতন পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে ধার্মিক ব্যক্তির দুঃখাভিনয় করিবার সময়ে তাঁহাকে দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাহি। ইহা কেবল তাঁহাদিগের ভ্রান্তি মাত্র। জীবনধারণ করিলেই ইষ্ট-অনিষ্ট উভয়েরই ভোগী হইতে হইবে, ধার্মিক হইলেই যে আপদ-গ্রস্ত হইতে হইবে না, এমত নহে।

"অপিচ ধর্মশীল ব্যক্তি ক্লেশপ্রাপ্ত হইলে অন্তঃকরণে অধিক শোক হয়, সুতরাং যে করুণাভিনয়ে অধর্ম বিরুদ্ধে পুণ্যবান ব্যক্তির প্রাণত্যাগ, সেই করুণাভিনয় দেখিলে অধিক তাপ জন্মে।"[৫] অতএব তাঁর সিদ্ধান্ত—"হর্ষ ক্ষণিক, কিন্তু করুণা বহুকাল স্থায়িনী"[৬] কিন্তু তা সত্ত্বেও ট্র্যাজেডি রচনা বিষয়ে বাঙালী নাট্যকারদের নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথম সার্থক বাঙলা ট্র্যাজেডি বলে স্বীকৃত 'কৃষ্ণকুমারী' বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হবার কারণ হিসেবে অনেকে এ নাটকের রস পরিণামকেই নির্দেশ করেছেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুরূপ কার্যের ফলে বাঙলা নাট্যসাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়, কেননা মধুসূদন তখনই কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠিতে জানিয়েছিলেন—I am afraid, brother Keshub, we are all losing fine enthusiasm we once had in matters dramatic[৭] তারপর যথার্থই মধুসূদন আর নাটকরচনায় উৎসাহ

বোধ করেন নি। মায়াকানন রচনাকালে মধুসূদন কোনো আন্তরিক প্রেরণা অনুভব করেন নি, একথা ঐতিহাসিক সত্য।

অথচ বাঙলা নাটকে ট্র্যাজেডি মধুসূদনের প্রতিভা দ্বারাই উন্নত মানে উপনীত হবার সম্ভাবনা ছিলো এমন মন্তব্য হয়তো সাধারণভাবে করা চলে। যে কবির কল্পনা রাবণ চরিত্র সৃজন করেছিলো, তিনি যে ট্র্যাজেডি রচনার দুরূহ আয়ুধকে নিয়ন্ত্রণে অনেকটা সক্ষম, তা অনুমান করা চলে। মধুসূদনের কবিদৃষ্টি ট্র্যাজেডি রচনার অনুকূল ছিলো। কেননা তাঁর প্রতিভা সম্পূর্ণভাবে নবযুগের মানবতা বোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলো এবং ট্র্যাজেডির জগৎ একান্তভাবে মানবিক। কিন্তু কি হতে পারতো সে সম্ভাবনা নিয়ে উচ্ছ্বসিত না হয়ে কি হয়েছে সে বাস্তবতার সীমানায় আলোচনা আবদ্ধ রাখাই বাঞ্ছনীয়।

দুই

বাঙলা নাট্যসাহিত্যে সার্থক ট্র্যাজেডি নেই। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ট্র্যাজেডি রচনা বিষয়ে বাঙালীর অক্ষমতার জন্য তার জাতীয় চরিত্রকে দায়ী করেছেন।[৮] উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত সমালোচক কালীপ্রসন্ন ঘোষও বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে ট্র্যাজেডি তথা ভালো নাটক রচনার অন্তরায় বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর মতে আর্যজাতির অধঃপতনের পর থেকেই "আমরা এখন শোকের স্থায়িভাব যত্ন পূর্বক পরিহার করি।...বাস্তবিক ভারতবাসীর এখন আর হৃদয় নাই, মর্ম নাই, আবেগ নাই। তীব্রতর, কঠোরতর, গভীরতর ভাবপ্রকৃতি কিছুই নাই। হৃদয় মধ্যে কোন ভাবেরই স্থায়িত্ব নাই, গভীরতা নাই, প্রগাঢ়তা নাই।"[৯] ডঃ অজিত কুমার ঘোষ আবার রসোপলব্ধিতে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দর্শক রুচির প্রবণতা দিয়ে এই অক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করেছেন।[১০]

ট্র্যাজেডি রচনায় বাঙালীর অক্ষমতা বিষয়ে সমালোচকগণ যে সকল কারণ নির্ণয় করেছেন, তার প্রধান কয়েকটি বলা হলো। প্রত্যেকেই সাধারণ ভাবে বাঙালীর চরিত্র ও মানস গঠনকে দায়ী করেছেন এবং সে হিসেবে তাঁদের অভিমত যুক্তিসহ।

কিন্তু কোনো জাতির চরিত্র ও মানস প্রকৃতি একান্তভাবে যুগ নির্ভর। কাজেই উনিশ শতকীয় বাঙালী মানসের প্রকৃতি নির্ণয়ে সমকালীন যুগবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

তিন

সমাজতাত্ত্বিকদের মতে সার্থক নাট্যরচনা তখনই কোনো দেশে সম্ভব হতে পারে, যখন কোনো-না-কোনো প্রকার গণতান্ত্রিক বিপ্লব সেখানে সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের অধিকার সাধারণভাবে যেখানে স্বীকৃত হয়েছে। জর্জ টমসনের মতে—

"....looking back over the rise of Athens and the rise of drama, we can say definitely that Athenian drama was a product of the democratic revolution"[১১] এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে এ বিশ্লেষণ প্রাচীন গ্রীস সম্পর্কে সঠিক হতে পারে কেননা সেখানেই স্বৈরাচার সরিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো, কিন্তু এলিজাবেথীয় ইংল্যাণ্ড তো কঠোরভাবে রাজশক্তি নিয়ন্ত্রিত, তবে সেখানে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যসাহিত্য রচনা সম্ভব হলো কি করে? সে সম্পর্কে জর্জ টমসনের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে—" The feudal system was a hierarchy of hereditary degrees. Then came the development of commodity production, which promoted the growth of towns, controlled by the bourgeois guilds, and the revival of navigation and international trade, leading to the discovery of America. Being incompitable with commodity production, the feudal system was destroyed and replaced by the capitalist system. This was the bourgeois revolution[১২]। একথা অনস্বীকার্য যে বুর্জোয়া বিপ্লবের মাধ্যমেই ইংল্যাণ্ডে সম্ভব হয়েছিলো রেনেসাঁস এবং তার থেকেই উদ্ভূত হয়েছিলো নানা গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা। তাই···the period with which we are immediately concerned is the sixteenth century, when the Tudors established an absolute monarchy supported by the bourgeoisie[১৩]। এবং this was the period in which English drama emerged as an art form[১৪]

উনিশ শতকের বাঙলা দেশেও অনুরূপ একটি ভাব বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিলো এবং সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে হলেও একটি গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল, পরাধীনতা সত্ত্বেও, কোলকাতার বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে গড়ে উঠেছিলো। তাই স্বাভাবিক ভাবেই উনিশ শতকের বাঙলায় নাট্যসাহিত্যের একটি পরিবেশ রচিত হয়েছিলো। কিন্তু সার্থক ট্র্যাজেডি রচনা বাঙালী নাট্যকারদের দ্বারা সম্ভব হলো না কেন?

পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের দিকে মনোনিবেশ করলে দেখা যায় সর্বাপেক্ষা সার্থক ট্র্যাজেডি রচিত হয়েছে মাত্র দুইটি যুগে—উল্লিখিত পেরিক্লিসিয় এথেন্সে এবং এলিজাবেথীয় ইংল্যাণ্ডে। নব অর্জিত অধিকার বোধে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিমানস দিগন্ত সীমায় যখন নিজেকে বিস্তারিত করে দিতে চায়, তখনই বাধে সংঘাত। এই বিস্ময় ও অধিকার বোধ যখন এলিজাবেথীয় ইংল্যাণ্ডে প্রথম বিকশিত হলো, সে সংঘাতের সম্ভাবনা ছিলো দূরবর্তী, তাই সদ্য পরিচয়ের স্বপ্নমদির সুখ কল্পনা ও বিস্ময় মূর্ত হয়ে উঠেছিলো শেকস্পীয়রের প্রথম পর্বে রচিত কমেডিগুলোতে। "শেকস্পীয়রের প্রথম পর্বের কমেডি-গুলিতে দেখা যায় যৌবন সুলভ উচ্ছলতা, এ উচ্ছলতা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত যৌবনা-বেগের প্রকাশ নহে, সমগ্র ইংরেজ জাতি তখন যৌবন-বেদন রসে ভরপুর, মাতাল বলিলেই হয়। মানুষের স্পর্ধিত বিক্রমের সামনে সম্ভব-অসম্ভবের ভেদরেখা যেন বিলীয়মান। কাল্পনিকতা ও কল্পনা—ফ্যান্সি ও ইমাজিনেসন্—ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া

আছে।"[১৫] কিন্তু এ মুক্তি ও উল্লাস ক্ষণিকের। কেননা নবোদ্ভূত বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় আপাত স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে বৃহত্তর বন্ধন। তাকে অতিক্রম করা শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের পক্ষেও সম্ভব হয় না। তাই এলিজাবেথের রাজত্বকালের শেষ পর্বে অবস্থ পরিবর্তিত হচ্ছিলো। ঐতিহাসিকের ভাষায়—" But the temper of the years after 1600 is also more critical, searching and analytic. The crowded subtlety of the Jacobeans denotes a quicker sense of humanism, its uncertainties and contradictions. In seeing their civilization as a whole, they grow deeply aware of its disharmonies and its impermanence.[১৬]। তাই "ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের পথে বুর্জোয়া সমাজে বাহ্য ও আন্তর কত যে বাধা তাহার বৈচিত্র্য শেকস্পীয়রের ট্র্যাজেডিতে চিরন্তন রূপলাভ করিয়াছে। এ বাধা বুর্জোয়া সমাজের অন্তর্নিহিত, সে সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদের বিপ্লবী পরিবর্তন না ঘটিলে এ বাধা দূর হইতে পারে না"[১৭] সমাজ বিকাশের এরূপ পরিস্থিতিতেই সার্থক ট্র্যাজেডি রচনা সম্ভব হতে পারে।

কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে, উনিশ শতকের বাঙলাদেশের সমাজ পরিবেশ ব্যক্তিত্বের সাধারণ ভাবে মুক্তি এনে দিলেও তা এমন কিছু অভীপ্সা দ্বারা তাড়িত ছিলো না যা দিগন্তসীমা স্পর্শ করতে উন্মুখ। আমাদের কামনা ছিলো না প্রচণ্ড, তাই ব্যর্থতা বোধও স্তিমিত। আমাদের অধিকার বোধ সামাজিক কিছু রীতির বাধা অপনোদনেই ছিলো ব্যস্ত। দেশের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সৃষ্টিশীল সক্রিয়তায় জড়িত না হবার ফলে মানবতার uncertainties and contradictions সম্পর্কে সচেতন হতে পারি নি এবং সমকালীন সভ্যতার disharmonies and impermanence কোনো তীব্র সংক্ষোভের সৃষ্টি করে নি। ফলে সঙ্গত কারণেই বাঙালী নাট্যকার দ্বারা সার্থক ট্র্যাজেডি রচনা সম্ভব হয় নি।

চার

বাঙালী নাট্যকার—যাঁদের রচনার মূল প্রেরণা মানবিক ছিলো, সেই—মধুসূদন-দীনবন্ধুর মধ্যে শেষোক্ত নাট্যকারের প্রতিভা ট্র্যাজেডি রচনার অনুকূল ছিলো না। তাঁর সাতখানা নাটকের মধ্যে ছয়খানাই কমেডি অথবা প্রহসন। "তাঁর ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রে এমন কোনো যন্ত্রণা-উৎস ছিলো না যা থেকে আর্ত ক্ষুব্ধ সৃষ্টির সঙ্গীত তরঙ্গিত হয়ে উঠতে পারে। জীবন প্রবাহে তাই তিনি তটস্থ দর্শক।...আর প্রসন্ন মনই কৌতুক বর্ষণে সমর্থ, এমন কি বঙ্গের ধারকে শুধু বিকীরিত বৈদ্যুতিতে রূপান্তরিত করতে পারে। দীনবন্ধু তটস্থ এবং প্রসন্ন। তাঁর জীবন এবং সৃষ্টি জুড়ে তাই হাস্যের মহোৎসব এবং তিনি পরদুঃখ কাতর। সহানুভূতির স্পর্শে তাই সে হাস্য কচিৎ অশ্রুসিক্ত।"[১৮]

কিন্তু মধুসূদন সম্পর্কে সহজ সিদ্ধান্ত করা চলে না। পূর্বেই বলা হয়েছে, ট্র্যাজেডির

প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছতে মধুসূদন অনেকটা সমর্থ হয়েছিলেন। কৃষ্ণকুমারীর পরে আরো ট্র্যাজেডি রচনা করলে তা সার্থক হতো কিনা অনুমানের বিষয়। কৃষ্ণকুমারীকে ট্র্যাজেডি হিসেবে সফল রচনা বলে স্বীকার করেও ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন—"শুধু ভীমসিংহ কেন, নায়িকা কৃষ্ণকুমারীর চরিত্রেও সেই বিভূতি নাই যাহা আমরা শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির নায়ক-নায়িকার কাছে প্রত্যাশা করিতে পারি।"[১৯] অতএব এ নাটকে "ট্র্যাজিক ব্যাপ্তির একান্ত অভাব।" মধুসূদনের প্রতিভার ক্ষমতা ও প্রবণতা সত্ত্বেও যুগের অন্তঃশায়ী বাধা অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো কিনা, এ প্রশ্ন মনে না জেগে উপায় নেই।

পাঁচ

গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা ট্র্যাজেডি রচনার অনুকূল ছিলো না। পূর্বেই বলা হয়েছে, গিরিশচন্দ্রের দ্বন্দ্ব চেতনা মূলতঃ ধর্মবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সেই ধর্মবোধ জাগতিক পাপপুণ্যবোধের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। জাগতিক পাপপুণ্যবোধ অতি সহজেই শ্রেয়-প্রেয়ে জড়িত হয়ে পড়ে, ফলে নাট্যকারের পক্ষে নিরপেক্ষতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করা সহজ হয় না। বিশেষতঃ ট্র্যাজেডির মধ্যে যে তীব্র অন্তর্জ্বালা, গভীর অপচয়বোধ ও প্রচণ্ড অনিবার্যতা আছে, নাট্যকারের সহজ পক্ষাবলম্বনের ফলে তা সঠিক স্ফূর্তিলাভে সক্ষম হয় না। বিয়োগান্ত হলেই ট্র্যাজিক হয় না, নাটকের অন্তিমে মৃত্যুর ঘনঘটা—যেমন, প্রফুল্ল বা জনা নাটকে—ট্র্যাজিক সংবিদ্ তীব্র করে তোলে না, কেন না The wars recorded in the Old Testament are bloody and grievous, but not tragic. They are just or unjust The Peloponnesian Wars, on the contrary, are tragic Behind them lie obscure fatalities and misjudgements[২০]। এবং সেজন্যেই সমালোচকের সিদ্ধান্ত—"The Judaic vision sees in disaster a specific moral fault or failure of understanding The Greek tragic poets assert that the forces which shape or destroy our lives lie outside the governance of reason or justice. Worse than that : there are around us daemonic energies which prey upon the soul and turn it to madness or which poison our will so that we inflict irreparable outrage upon ourselves and those we lose"[২১] গিরিশচন্দ্রের দ্বন্দ্ব চেতনা এই just or unjust দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তাঁর কবিদৃষ্টির কাছে কিছুই lie outside the governance of justice নয়, বরং এক পরম কারুণিকের মঙ্গল স্পর্শ তাঁর সাহিত্যে সর্বদাই অনুভূত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে আর যাইহোক সার্থক ট্র্যাজেডি রচনা সম্ভব নয়।

ছয়

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি এই একই বিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করা চলে। পার্থক্যের মধ্যে

পূর্বেই বলা হয়েছে—গিরিশচন্দ্র ধর্মবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, দ্বিজেন্দ্রলালে সাংসারিক নীতিবোধের প্রাধান্য। কিন্তু এই নীতিবোধও প্রধানত পাপপুণ্য বোধের সঙ্গে জড়িত, তাই দ্বিজেন্দ্র প্রতিভাও ট্র্যাজেডি রচনার অনুকূল নয়। অথচ তিনি বেশ কয়েকটি ট্র্যাজেডি রচনা করেছিলেন এবং সম্ভবতঃ বাঙলা নাট্যসাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় ট্র্যাজেডি 'সাজাহান" নাটকের রচয়িতা তিনি। কাজেই আমাদের সিদ্ধান্ত বাস্তব অবস্থার প্রতিকূল বলে বিবেচিত হতে পারে। অতএব এ বিষয়ে কিছু বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

ট্র্যাজেডি একান্তভাবে নায়ক নির্ভর। সাজাহান নাটকে নায়ক কে? ঔরঙ্গজীব না সাজাহান? যদি ঔরঙ্গজীবকে নায়ক বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে তার অন্তর্দাহ ট্র্যাজেডির নায়কোচিত তীব্রতা ও গভীরতায় পৌঁচেছে কি না সন্দেহ। বিশেষত যে কারণে তার অনুতাপ ও অন্তর্দাহ—ভ্রাতাদের নৃশংসভাবে হত্যা ও পিতাকে জীবদ্দশায় বন্দী—নাট্যকারের মানসিক অনুমোদন লাভ করে নি। তাই নাট্যকারের মুখপাত্র তথাকথিত বিদূষক দিলদার বলছে—"চিরকালটা পরকে ছলনা ক'বে কি জাঁহাপনার বিশ্বাস জন্মেছে যে নিজেকে ছলনা কর্তে পারেন? সেইটেই সকলের চেয়ে শক্ত। ভাইকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পারেন; কিন্তু বিবেককে শীঘ্র টুঁটি টিপে মারতে পারেন না ··এখন পাপেব প্রায়শ্চিত্ত করুন।' [পঞ্চম অঙ্ক ; পঞ্চম দৃশ্য] ঔরঙ্গজীবের এ অনুতাপ পাপের শাস্তি। কাজেই এখানে ট্র্যাজেডি সম্ভব নয়।

অপর পক্ষে, ট্র্যাজেডিব নায়ক হিসেবে নাটকে উপস্থাপিত সাজাহান চরিত্রের উপযোগিতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। সাজাহান চরিত্রের মূল ভাবকেন্দ্র আদ্যন্ত বাৎসল্যরসে মণ্ডিত। "তাঁহার চরিত্র আদ্যন্ত একই রূপ স্নেহাতুর, অপ্রকৃতিস্থ, অসহায়—তিনি চলমান ঘটনার নিরুপায় দ্রষ্টা, শক্তিমান স্রষ্টা নহেন।"[২২] এরূপ চরিত্র ট্র্যাজেডিব নায়ক হিসেবে কতটা গ্রহণযোগ্য তা বিচার্য। কোনো কোন সমালোচক সাজাহানের সঙ্গে কিং লিয়রেব তুলনা করেছেন এবং উভয়ের ট্র্যাজিক ভাব কেন্দ্রটি একই বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। পিতা-সন্তান সম্পর্ক উভয় নাটকেই মূল বিষয়। লিয়রের মত সাজাহানকেও বলা চলে—a man more sinned against than sinning, but almost wholly as a sufferer, hardly at all as an agent. His sufferings too have been so cruel, and our indignation against those who inflicted them has been so intense[২৩] এবং সেজন্যেই সমালোচক সিদ্ধান্ত করেছেন—"…ট্র্যাজেডি পরিকল্পনার দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকে শেকস্‌পীয়র প্রদর্শিত রাজা লীয়রের ট্র্যাজেডি পরিকল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।'[২৪] সমালোচকের এ বক্তব্য সঠিক বলে মনে হয় না। লিয়রের ট্র্যাজেডি সাজাহানের মতো শুধু সন্তানস্নেহ নয়। এক

প্রবল অহং বোধ (egoism) দ্বারা লিয়র আদ্যন্ত তাড়িত, এই অহংবোধের মাধ্যমেই তিনি বিশ্ববিধানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। এই প্রবল অহংবোধের রন্ধ্রপথে প্রবেশ করেছে tragic flaw—তাঁর ভাবী বিপর্যয়ের বীজ। ট্র্যাজেডির নায়কের পক্ষে এই অহংবোধ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সাজাহান চরিত্রে রয়েছে এই অহংবোধের একান্ত অভাব। মাঝে মাঝে অবশ্য সাজাহান তীব্র ভাষায় তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসী হয়েছেন :

"ভেবেছো আমি এই শাঠ্য, এই অত্যাচার—এখানে এইরকম বসে নিঃসহায়ভাবে সহ্য কর্ব্ব। ভেবেছো এই কেশরী স্থবির বলে তোমরা তাকে পদাঘাত করে যাবে? আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে ; কিন্তু আমি সাজাহান।" [প্রথম অঙ্ক ; সপ্তম দৃশ্য]

অথবা,

"কার সাধ্য দারাকে হত্যা করে? আমি সম্রাট সাজাহান, আমি স্বয়ং তাকে পাহারা দিচ্ছি। কার সাধ্য!—ঔরঙ্গজীব?—তুচ্ছ! আমি যদি চোখ রাঙ্গাই, ঔরঙ্গজীব ভয়ে কাঁপবে। আমি যদি বলি ঝড় উঠুকে ; ত ঝড় উঠবে ; যদি বলি বাজ পড়ুক, ত বাজ পড়বে।" [পঞ্চম অঙ্ক ; তৃতীয় দৃশ্য]

উদ্ধৃত সংলাপ দুটো যথাক্রমে নাটকের প্রথম অঙ্ক ও শেষ অঙ্ক থেকে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সংলাপটি সাজাহানের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় উক্ত। উভয়েরই মধ্যেই সাজাহানের অহংকার প্রকাশিত। কিন্তু এ অহংকার নিষ্ফল ও অর্থহীন। যে অহংবোধ লিয়রকে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করেছে, সাজাহানের এই অহংকারের সঙ্গে তার পার্থক্য মূলগত। তাছাড়া, বাৎসল্য সাজাহানের অহংবোধকে স্তিমিত করে দিয়েছে। সন্তান স্নেহের জন্য আত্মবিলোপ তাঁকে ট্র্যাজিক মহিমা থেকে নির্বাসিত করেছে। তাঁর জন্য দর্শকমনে করুণার উদ্রেক হয় মাত্র, আরিস্তোতল কথিত pity and fear অথবা নিকল বিশ্লেষিত awe and grandeur অর্থাৎ ট্র্যাজেডির প্রধানতম উপাদান অনুপস্থিত থেকে যায়। কিন্তু Lear, immense in stature, dominates the play…Lear's continual anger, which puts him robust temper at the service of an infantile folly and drives him to make discoveries by tragic revelations…[২৫]।

বিশেষত সাজাহানে বিশ্ববিধানকে চ্যালেঞ্জ জানানোর লিয়রীয় অত্যুগ্রতা অনুপস্থিত। In King Lear the indictment of the ordered universe dislocates the very foundation of reason. Transitions, shades of meaning, logical sequences—all yield to the brutal assult.[২৬] ফলে কিং লিয়রের মধ্যে যে মহাজাগতিক উপলব্ধি cosmic realization—শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির যা অনিবার্য ফল প্রকাশ পেয়েছে, সাজাহানে তার একান্ত অভাব।

যাই হোক, এ সিদ্ধান্ত সম্ভবত অযৌক্তিক হবে না যে ব্যবহারিক নীতিবোধ ও প্রবল বাৎসল্য দ্বিজেন্দ্রলালের ট্র্যাজিক দৃষ্টিকে (tragic visicn) নিয়ন্ত্রিত করেছে, ফলে সঙ্গত কারণেই তাঁর নাটকে ট্র্যাজেডির তীব্রতা অনুপস্থিত হয়েছে। একমাত্র নুরজাহান নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর অভ্যস্ত নীতিবোধ ও বাৎসল্যরসের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং তার ফলে সম্ভবত একমাত্র এই নাটকটিতেই যথার্থ ট্র্যাজিক সমুন্নতি অনেকাংশে প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়ের ভাষায়—"নুরজাহানের দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি, প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা মত্ততার মূলে ছিলো এক ধ্বংসাত্মক বৃত্তি—এই ধ্বংসাত্মক অশুভ বৃত্তিকেই তিনি 'শয়তানী' আখ্যা দিয়েছেন।...তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অদম্য তেজ ও অসাধারণ আত্মসচেতনতা সত্ত্বেও নুরজাহান ক্রমশঃ সর্বনাশ ভাঙনের দিকেই এগিয়ে চলে এসেছেন—ফিরে আসার কোনো পথ নেই।"২৭ এই অনিবার্যতার মধ্যে আদর্শ ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত থাকে। কিন্তু পরিমিতি বোধের অভাবে এ নাটকে ট্র্যাজিক সংবিদ সম্পূর্ণ স্ফুরিত হতে পারে নি।

সাত

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'রাজা ও রানী'র দ্বন্দ্বচেতনার মধ্যে যথার্থ ট্র্যাজিক সম্ভাবনা নিহিত ছিলো। বিক্রমের প্রবল প্রেম—তাব প্রচণ্ড আবেগ ও উন্মত্ততা অহংবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়ে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে ছুটে গিয়েছে।' "এই নাটকে যথার্থ নাট্যপরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।"২৮ বিক্রমের উদ্ধত আত্মঘোষণা—

"বজ্রাগ্নিরে করিয়াছি
বিদ্যুতের মালা, পরায়েছি কণ্ঠে তব"— [দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য]

ট্র্যাজেডির নায়কের উপযুক্ত। সে যখন বলে—

"কে রাজা ? কে রাণী ?
নহি আমি রাজা। শূন্য সিংহাসন কাঁদে।
জীর্ণ রাজকার্য রাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণ তলে ধূলির মাঝারে— [প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

তখন তার ট্রাজিক অনিবার্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। তবু 'রাজা ও রাণী' সার্থক ট্র্যাজেডি নয়। পরিমিতি বোধের অনাবশ্যক প্রাধান্য, অভাব, উপকাহিনীর অতিরিক্ত লিরিক প্রাণতা এবং সর্বোপরি বিক্রমের শেষ সংলাপে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি নাটকের ট্র্যাজিক সংহতি ও তীব্রতা বিনষ্ট করেছে। পরবর্তী নাটক 'বিসর্জন'কে ট্র্যাজেডি করা নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিলো না। বিসর্জনে দুই বিপরীত আদর্শের দ্বন্দ্ব—প্রথানুযায়ী

লোকাচার ও মানবপ্রেম, এ হেন দ্বন্দ্বের মধ্যে ট্র্যাজিক তীব্রতা সৃষ্টি করা সহজ নয়। দর্শকমন, বিশেষত আধুনিককালে, মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে, অত্যন্ত সঙ্গত ও সহজ ভাবেই পক্ষাবলম্বন করে ফেলে, ফলে দ্বন্দ্ব তার তীব্রতা হারায় এবং সঠিক উপসংহারে আশ্বস্ত হয়। ট্র্যাজেডির অন্যতম প্রধান শর্ত—অপচয়বোধ—তাতে থাকে না। বিশেষত বিপরীত আদর্শদ্বয়ের যারা ধারক—গোবিন্দ মাণিক্য ও রঘুপতি—তাদের নিজেদের চরিত্রে দ্বন্দ্ব প্রায় অনুপস্থিত। অবশ্য উভয়ের মধ্যে পতিত হয়ে জয়সিংহ দ্বন্দ্বমুখর হয়েছে, কিন্তু তার বিষণ্ণতা কখনো ট্র্যাজিক তীব্রতায় গিয়ে পৌঁছোয় না। তার আত্মদান করুণ কিন্তু ভীতি উৎপাদক নয়।

আসলে রবীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্বচেতনা ট্র্যাজেডির অনুকূল নয়। যে কবি বলেন—'দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,' তার পক্ষে ট্র্যাজেডির প্রশ্ন, সংশয় ও অপচয় বোধে আক্রান্ত হওয়া সহজ নয়। সকল আঘাত-সংঘাতের মাঝখানে থেকেও অপূর্ব প্রসন্নতা বজায় থাকে তাঁর। তাই বিসর্জন বা মালিনীতে ট্র্যাজিক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সেগুলো সার্থক ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠে না।

পরবর্তী পর্যায়ের নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রবৈশিষ্ট্য দ্যোতক রচনা তাঁর রূপক সাংকেতিক নাটক—শারদোৎসব থেকে কালের যাত্রা। এদের মধ্যে—পূর্বেই বলা হয়েছে—শারদোৎসব, রাজা, ডাকঘর মূলত আত্মিক উত্তরণের নাটক। ডাকঘর নাটকটি শান্ত বিষণ্ণতা মণ্ডিত। এর মধ্যে করুণরসের প্রাধান্য থাকলেও তা ট্র্যাজিক নয়। অনেক সমালোচক নাটকের অন্তিমে অমলের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই অমলের মৃত্যুসংবাদ অস্বীকার করেছেন। মৃত্যু না হলে তো কথাই নেই, অমলের মৃত্যু ধরে নিলেও নাটকের উপসংহারে যে একটি পরম প্রাপ্তিবোধ, বন্ধন মুক্তির আনন্দ ও অপূর্ব শান্তরসের দ্যোতনা পরিলক্ষিত হয় তাতে ট্র্যাজিক তীব্রতা ও অপচয়বোধ অনুপস্থিত। তাছাড়া, উপসংহারে মৃত্যু থাকলেই তা বিয়োগান্ত বা ট্র্যাজিক হয় না। আন্তন চেকভের 'দ্য সীগাল' (The Seagull) নাটকের নায়ক শেষদৃশ্যের শেষাংশে আত্মহত্যা করেছে, নাটকটির সমাপ্তিও বিষণ্ণতার মধ্যে, তা সত্ত্বেও নাট্যকার নাটকটিকে 'কমেডি' বলে অভিহিত করেছেন। এর মধ্য দিয়ে চেকভের বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে। ডাকঘরকেও অনুরূপভাবে বিশিষ্ট রবীন্দ্র-জীবনবাণী প্রকাশক বলে অভিহিত করা যায়। বিশেষত যে নাটকে আত্মিক উত্তরণ প্রাধান্য পায়, তার সংবিদ কখনো ট্র্যাজিক হতে পারে না। তাই রবীন্দ্র প্রযোজনায় ডাকঘরের শেষ দৃশ্যে যদিও অমলের মৃত্যু পরিকল্পিত হয়েছিলো কিন্তু সমুখে শান্তি পারাবার গানটি নিঃসন্দেহে দর্শকমনকে পরম প্রাপ্তির প্রসন্নতায় ভরে দিয়েছিলো।

রবীন্দ্রনাথের এ পর্যায়ের নাটকগুলোর মধ্যে—পূর্বেই বলা হয়েছে—অচলায়তন থেকে

সুরু করে কালের যাত্রায় সমষ্টি প্রাধান্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এ নাটকগুলোতে রবীন্দ্রনাথ আত্মিক উত্তরণ অপেক্ষা সমষ্টির পরিত্রাণ সম্পর্কে মনোযোগী হয়েছেন অধিক। যে প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, বা সমাজবিন্যাস নানা কৌশলে ব্যক্তি ও সমষ্টিসত্বাকে শৃঙ্খলিত করে নিজের বিশ্বগ্রাসী লোভ ও ক্ষুধাকে বাড়িয়েই চলে—রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন (অন্তত উপরোক্ত নাটকগুলোতে)—যে সমষ্টির প্রতিবাদে ও প্রচেষ্টায় সে অন্যায়ের প্রতিবিধান ও বিলোপ সাধন সম্ভব। তাই অচলায়তন ভেঙে পড়ে শোন-পাংশুদের বলিষ্ঠ আঘাতে, আবদ্ধধারা মুক্ত হয় অভিজিতের চেষ্টায় গণজাগরণে, রক্ত-করবীর লৌহজাল ছিন্ন হয় কাঙালাল বিশুপাগলদের সঙ্গে রাজার মিলিত শক্তির প্রচণ্ডতায় এবং কালের যাত্রায় মহাকালের রথ তীব্র গতিবেগ সম্পন্ন হয়ে ওঠে শূদ্রদের সমষ্টিগত কর্ম তাড়নায়। এ নাটকগুলোর এই সমষ্টি প্রাধান্যই তাদের ট্র্যাজিক রস থেকে বঞ্চিত করেছে, কেননা সমষ্টির কোনো ট্র্যাজেডি হয় না। ব্যক্তিমানুষ বিপর্যস্ত ও বিলুপ্ত হতে পারে কিন্তু মানব জাতির বিনাশ বা ধ্বংস অসম্ভব। তাই অভিজিতের আত্মদান আমাদের বেদনাবিদ্ধ করে না, অবদমিত শিবতরাই বাসীর প্রতিবাদের শক্তি সঞ্চয় ও প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহের সাহস তার চাইতে অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

আধুনিক মানসের সার্থক প্রতিফলন Vsevolod Vishnevsky রচিত নাটক An Optimistic Tragedy। নাটকটির নাম অর্থদ্যোতক। এ নাটকের কুশীলব স্পর্ধাভরে বলতে সক্ষম—"Death, where is thy sting ?" এ নাটকটিতে নাট্যকার dramatizes the heroic death in the battle of a company of Red Marines. All perish before our eyes, but we are not meant to regard their sacrifice as tragic for it contributes to the final victory of the Party and the Soviet Union.[২৯] নাটকটির শেষ অঙ্কের শেষাংশে লক্ষ্য করি মৃত্যুর মুখে উপনীত কমিসারকে মঞ্চে আনা হয়েছে, নেপথ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে the two battalions fighting their way through, louder, nearer, like an approaching avalanche ! এই পটভূমিতে মুমূর্ষু কমিসারের দৃপ্ত ঘোষণা Hold high—he traditions—of the Red Fleet এবং তখন মঞ্চের মানুষগুলো stand with bared, bowed heads, a mighty burst of music, sombre yet triumphant, promises that this is not the end …।

অনুরূপ আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্র নাটকের আলোচ্য পর্যায়ের আপাত বিপর্যয়ের মাঝে। তাই আধুনিক কালের মানুষ see in tragedy a relic in the museum of the moral past. The tragic theatre is an expression of the pre-rational phase in history ; it is founded on the assumption that there are in nature and in the Psyche occult, uncontrollable forces able to madden or destroy the mind[৩০]। এবং Tragedy can occur only where reality has not been harnessed by

reason and social consciousness.[৩১] প্রকৃতির রহস্য ও মানব মন সম্পর্কিত অজ্ঞতাই ট্র্যাজেডির জন্মদাতা, যে রহস্য বিস্মিত মানুষের কাছে কোনো যুক্তি দ্বারা বোধগম্য নয়, মানব প্রগতির সে পর্যায়ে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি। কিন্তু আধুনিক কালের মানুষ knows that such forces have no real existence; they are metaphors of ancient ignorance or phantasms with which to frighten children in the dark. He knows that there is no such thing as 'Anangke', the blind necessity which overwhelms Oedipus[৩২]। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন প্রাথমিক প্রচেষ্টার পর প্রচলিত ট্র্যাজেডি রচনার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ভিন্ন স্বাদের নাট্যরসে আগ্রহী হন, তখন তিনি আধুনিক যুগমানসকেই নির্ভুলভাবে প্রকাশিত করেন।

আট

ট্র্যাজেডি রচনায় ব্যর্থতা সাধারণত নাট্যকারের মেলোড্রামাটিক প্রবণতাকে উৎসাহ দান করে। এমন কি বিশ্ব সাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি মেলোড্রামার লক্ষণাক্রান্ত। বাংলা নাট্য সাহিত্যে ট্র্যাজেডি রচনার দুর্বলতা মেলোড্রামার পরিমাণ বাড়িয়েছে।[৩৩]

মেলোড্রামা কাকে বলে? Robert B. Heilman-এর মতে, মেলোড্রামা হলো drama of disaster। সমালোচক ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামার পার্থক্য নির্ণয় করে লিখেছেন—"In disaster, what happens comes from without; in tragedy, from within. In disaster, we are victims; in tragedy, we make victims, of ourselves or others. In disaster, our moral quality is secondary; in tragedy, it is primary, the very source of action." [৩৪] এই প্রতিপাদ্য পটভূমিতে রেখে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন। "Disaster is the realm of quantity of life; tragedy of quality of life ··In tragedy we act; in the literature of disaster we are acted upon [৩৫]। এবং সেজন্যই In tragedy, the conflict is within man, in melodrama, it is between men, or between men and things[৩৬]।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আমাদের নাট্য সাহিত্যে মেলোড্রামার আধিক্য কেন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ থাকে না। আমাদের দ্বন্দ্ব চেতনা বা conflict অনিবার্য কারণেই from within হতে পারে নি। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে উনিশ শতকীয় বাঙলার যুগ পরিবেশ আমাদের জাতীয় জীবনে উপযুক্ত দ্বন্দ্ব সঞ্চারে ব্যর্থ ছিল। তাই নাট্যকারকে অধিকাংশ সময়েই নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃজনে কৃত্রিমতার আরোপ করতে হয়েছে, ফলে বাংলা নাটকে what happens comes from without হতে বাধ্য হয়েছে। এবং যুগ পরিবেশের নিকট বিশেষ সাহায্য

লাভে বঞ্চিত হয়েই গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালকে কখনো ধর্মীয়, কখনো নৈতিক ভাবাদর্শ আরোপ করে নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে হয়েছে।

কিন্তু উপরোক্ত আলোচনায় মেলোড্রামা সৃষ্টির অপর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ অনুপস্থিত থেকে গেছে। ট্র্যাজেডি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আরিস্তোতল ক্রিয়ার causal necessity বা যৌক্তিক অনিবার্যতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এই যৌক্তিক অনিবার্যতা ট্র্যাজিক রস সৃষ্টির অত্যাবশ্যক উপাদান। মেলোড্রামায় এই যৌক্তিক অনিবার্যতাকে উপেক্ষা করা হয়। In a melodrama the transition is faulty or entirely lacking. Conflict is over-emphasized. The characters move with lightning speed from one emotional peak to another—the result of their one-dimensionality ৩৭. বাঙলা নাটকে এই over emphasized দ্বন্দ্ব ও চরিত্রের one dimensionality সচেতন দর্শকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না।

কিন্তু এমন হলো কেন? ঐতিহাসিকদের মতে রেনেসাঁস বা নবজাগৃতি চিন্তাধারার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হেতুবিধি আবিষ্কার। "হেতুবিধির আবিষ্কার মধ্যযুগীয় জ্ঞানকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতম অভিঘাত। ইহাকে আধুনিক বিজ্ঞানের মনিকোঠা বলাও চলে। একবার হেতুবিধি, অর্থাৎ কার্য-কারণ-সম্বন্ধ মানিয়া লইলে আর অতি-প্রাকৃতের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। আকস্মিককেও পরিহার করিতে হয় মূল ঘটনা হিসাবে। যাহাকে মনে হয় অতি প্রাকৃত বা আকস্মিক তাহাও নিশ্চয় কার্য-কারণ সম্বন্ধে গ্রথিত, হেতুবিধির দ্বারা শৃঙ্খলিত।"৩৮ রেনেসাঁ চেতনার এই মূল বিধি—হেতুবিধি—শেকস্পীরীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল তাঁর ট্র্যাজেডিগুলোতে সার্থকতম ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই নাটকগুলোর' "প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ঘটনার পরম্পরা, অনিবার্য গতিতে অগ্রসর হয় নাটকের নিয়তির দিকে। কোনো ঘটনাই নহে অকারণ বা অহেতুক। যেখানে আকস্মিক ঘটনা ঘটিয়াছে, যেমন ওথেলোতে রুমাল ফেলা, তাহা ঘটিয়াছে মূল ঘটনাস্রোতের পরিপূরক রূপে, তাহা হইতে পৃথক হইয়া নহে। যেখানে অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার করা হইয়াছে, যেমন হ্যামলেট বা ম্যাকবেথ-এ, তাহার নাটকীয় সঙ্গতির উপাদান দেওয়া আছে নাটকের ভিতরেই। যেখানে কোনো চরিত্র দেখানো হইতেছে অভাবিতপূর্ব পরিবর্তন—যেমন ডেসডিমোনার প্রতি ওথেলোর নির্মম ব্যবহারে, বা পৃথিবী সম্বন্ধে লিয়রের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল রূপান্তরে, সেখানেও হেতুবিধির ব্যত্যয় করা হয় নাই। পাঠক বা দর্শকের পক্ষে বুঝিতে বিলম্ব হয় না, অনুরূপ ব্যক্তির পক্ষে অনুরূপ অবস্থায় অনুরূপ ব্যবহার করাই স্বাভাবিক। ট্র্যাজেডিগুলোতে যেখানে সেখানে অপূর্ব কবিত্বের প্রকাশ আছে তাহা কোনো সময়েই তাহাদের নাটকীয় উপযোগিতা ছাড়াইয়া স্বয়ং প্রধান হইয়া পড়ে না। এই উপযোগবোধ শেকস্পীয়রের বৃহৎ ট্র্যাজেডিগুলোতে যে পরিমাণ পাওয়া যায় বিশ্বসাহিত্যে

অন্য কোনো নাটকে সেই পরিমাণে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এবং এই উপযোগবোধ তিনি পাইয়াছিলেন সেযুগের বস্তুনিষ্ঠ হেতুবিধির উদ্ভাবন হইতে।"[৩৯] এ প্রসঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে বস্তুবাদী হেতুবিধির প্রথম ও প্রধান আচার্য ফ্রান্সিস বেকন শেকস্‌পীয়রের সমকালীন ছিলেন।

উনিশ শতকীয় বাঙালী নবজাগৃতি নিঃসন্দেহে ইউরোপীয় রেনেসাঁর সমতুল্য ছিলো না। এ প্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। আমাদের এই অর্ধবিকশিত নব জাগৃতিতে স্বাভাবিক কারণেই রেনেসাঁসের সর্বাবিধ লক্ষণ উপযুক্ত প্রকাশে ব্যর্থ হয়েছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অন্যতম প্রধান উপাদান এই হেতুবিধি সম্পর্কেও এ বিশ্লেষণ প্রয়োগ করা চলে। রেনেসাঁসের হেতুবিধি বাঙালীর দ্বারা সম্পূর্ণ করায়ত্ত করা কখনোই সম্ভব হয় নি। বাঙালী মনন অনুরূপ কারণেই কোনো বেকন-সৃজনে অক্ষম হয়েছে।

বাঙালীর জাতীয় জীবনে এই হেতুবিধির অপ্রতুলতা বাঙলা নাট্যসাহিত্যে মেলোড্রামার সৃষ্টি করেছে—এ মন্তব্য সম্ভবত অসঙ্গত নয়। অপ্রধান নাট্যকারদের রচনায় তো বটেই, শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের রচনাতেও এই হেতুবিধির ব্যত্যয় অত্যন্ত প্রকটরূপে বর্তমান। এসম্পর্কে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হলো :

[ক] কৃষ্ণকুমারী মধুসূদনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক এবং বাঙলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডি সম্ভব হয়েছে যত না প্রধান চরিত্রগুলোর আভ্যন্তরীণ বিকাশে, তার চাইতে অনেক বেশি পরিস্থিতির বিন্যাসে। এবং এই পরিস্থিতি সৃজনে প্রধানত সাহায্য করেছে মদনিকার অবাধ সঞ্চরণ। সে কখনো পুরুষবেশে, কখনো বা নারীবেশে যুগপৎ কৃষ্ণকুমারী, ধনদাস ও মরু প্রদেশের দূতকে অক্লেশে প্রভাবিত করেছে। পুরুষবেশী মদনিকাকে ধনদাস চিনতে পারলো না কেন, সে অসম্ভাব্যতার কথা ছেড়ে দিলেও চিতোরের রাজ অবরোধে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে মদনিকার প্রবেশ ও কৃষ্ণকুমারীকে মরুসিংহের প্রতি পরিচালিত করা সকল সম্ভাব্যতাকে অতিক্রম করেছে। তাছাড়া, মরুদেশের দূত অকস্মাৎ জনৈক নাগরিকের কথায় আস্থা স্থাপন করলো কেন, সে বিষয়েও প্রশ্ন না জেগে পারে না। অথচ কৃষ্ণকুমারীর ট্র্যাজিক পরিণতিতে এসকল ঘটনার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

[খ] গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে উপস্থাপিত অলৌকিকতা মেনে নিলে স্বভাবতই অসম্ভাব্যতাকে গ্রহণ করতে হয়। তখন দর্শকের পক্ষে প্রশ্ন তোলা সঙ্গত হয় না পূর্ণা বা অলোয়াই নদী শঙ্করাচার্যের ইচ্ছানুসারে প্রবাহিত হতে পারে কি না। কেননা ঈশ্বরের কৃপায় সবই সম্ভব (শঙ্করাচার্য—প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)। গিরিশচন্দ্র, এমন কি, ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটকেও বার বার সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করেছেন অত্যন্ত অক্লেশে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক, সিরাজদ্দৌলা নাটকে জহরা চরিত্রের স্থানকাল নির্বিশেষে স্বচ্ছন্দ পরিভ্রমণ। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে

মীরজাফর যখন ভবিতব্য ভেবে ব্যাকুল, জহরা সেখানে নিরঙ্কুশ প্রবেশ করে তাকে জানালো—"আমি শয়তানী—আমার শয়তানি দৃষ্টিতে ভূতভবিষ্যৎ অবগত।" অতএব জহরার বাধা কোথায়? তাই পরের দৃশ্যেই ঘসেটি বেগম যখন আর্তনাদ করে বলে—এমন কেউ নাই, যে আমায় এই কারাগার হতে উদ্ধার করে।" "—সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য ভাবেই জহরা উপস্থিত হয়ে বলে—এই যে আমি আছি।" তার এই অবারিত বিহার শুধু মাত্র প্রাসাদে প্রসাদ সীমাবদ্ধ থাকে নি, যুদ্ধের দুর্যোগেও সে নিরবিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে দিবসে নিশীথে ঘুরে বেড়িয়েছে। জহরার এ ব্যবহার যে কিছুতেই যুক্তি নির্ভর হতে পারে না, সে বিষয়ে নাট্যকার অবহিত হতে পারেন নি। অনুরূপভাবে প্রফুল্ল নাটকেও ভজহরি চরিত্রের আকস্মিক পরিবর্তন সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করেছে। জগৎ পরিবর্তনশীল, প্রত্যেক মানুষের পরিবর্তন সম্ভব, কিন্তু এই পরিবর্তনের ক্রম দেখালে তা দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। বাস্তব পৃথিবীতে দুর্ঘটনাকে স্বীকার করতেই হয় কিন্তু সাহিত্য সেই দুর্ঘটনাকেও যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলতে হয়। ভজহরির রূপান্তরে কোনো যুক্তিনির্ভর ক্রম দেখানো হয় নি, ফলে নাটকে সে অতিনাটকীয়তার সঞ্চার করেছে। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে আমরা প্রথম ভজহরি সাক্ষাৎ পাই, সে কাঙালীর ভাগ্নে, মামার ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়ে রমেশের কাছে টাকা নিয়ে সে যোগেশ পরিবারের সর্বনাশে উদ্যত। তার সঙ্গে আমাদের পরবর্তী সাক্ষাৎ ঐ অঙ্কেরই পঞ্চম গর্ভাঙ্কে। সে সেখানে স্বতঃ প্রবৃত্তভাবে শিবনাথের উপস্থিত হয়ে রমেশ ও তার সাগ্‌রেদদের সকল ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়। বাস্তব জীবনে ভজহরির এ পবিবর্তন আকস্মিক হলেও গ্রহণযোগ্য বলে অবিবেচিত হতো না, কেননা সংসারে অপরিচিত মানুষেরও অধিকাংশ কার্যধারা ঘটে আমাদের অগোচরে, তাই আপাত অসম্ভাব্যও সেখানে সম্ভব বলে প্রতীয়মান হতে পারে। কিন্তু সাহিত্য বাস্তবের এই অসংলগ্নতাকে পরিপূরণ করে। তাই ভজহরির পরিবর্তন বিশ্বাস্য হলেও সঙ্গত নয়, কেননা সে সাহিত্যিক হেতুবিধিকে অগ্রাহ্য করেছে। অথচ ভজহরি এই আচরণ নাটকের পরিণতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

অথবা রমেশ চরিত্রটিকেই গ্রহণ করা যাক। প্রফুল্ল নাটকের শোচনীয় বিপর্যয়ের মূলে যত না নায়ক যোগেশের কার্যাবলী তার চাইতে অনেক বেশি রমেশের ষড়যন্ত্র। রমেশ চরিত্রটিকে নাট্যকার প্রথম থেকেই উপস্থাপিত করেছেন প্রতারক, প্রবঞ্চক, শঠ, মিথ্যাবাদী, ষড়যন্ত্রকারীরূপে। নাটকের আদ্যন্ত তার প্রায় একই রূপ। সঙ্গত ভাবেই পাঠকমনে প্রশ্ন না জেগে পারে না, তাহলে সে তার জীবনের এতগুলো বছর যোগেশের সংসারে এই হীন প্রকৃতি গোপন করে বিচরণ করেছিলো কিভাবে? অন্তত যোগেশ, জ্ঞানদা বা উমাসুন্দরী যে রমেশের

প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি সম্পর্কে নিদারুণ অজ্ঞ ছিলো। সে তো নাটকের প্রথম অঙ্ক থেকেই স্পষ্ট। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে আমরা দেখি যোগেশ রমেশের সঙ্গে সাংসারিক বিষয়-আশয় নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত, যোগেশের কথায় বা আচরণে রমেশ সম্পর্কে কোনো ভীতি বা সন্দেহের পরিচয় নেই কিংবা সেই দৃশ্যেরই সমাপ্তিতে ব্যাঙ্ক ফেলের দুঃসংবাদ ও যোগেশের অপ্রকৃতিস্থতার আকস্মিকতায় জ্ঞানদা যখন আহ্বান জানায়—"ঠাকুর পো, ঠাকুর পো! শিগগীর এস, সর্বনাশ হলো—"তখন রমেশের প্রতি সকলের সুগভীর আস্থার কথাই ঘোষিত হয়। তখনই প্রশ্ন জাগে, রমেশের মতো ব্যক্তি একান্নবর্তী পরিবারে সুদীর্ঘ বছরগুলো অতিবাহিত করে এতদিন আত্মগোপন করে ছিলো কোন্ অলৌকিক উপায়ে? নাটকে উপস্থাপিত ষড়যন্ত্রের নায়ক রমেশ চরিত্র নাটকারম্ভের পূর্বে নেপথ্যচারী রমেশের যুক্তিগ্রাহ্য পরিণতি কিনা সে সন্দেহ তখন পাঠক মনে না উঠে পারে না।

(গ) মেবারপতন দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলে পরিচিত। মেবার পতনে নারী চরিত্র তিনটি—কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী। এ তিন নারীচরিত্র নাট্যকারের তিনটি আদর্শের প্রতীক। "আমি এক মহানীতি লইয়া নাটক লিখিতে বসিয়াছি"—ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের এই প্রতিপাদ্য নাটকে নারীচরিত্র-গুলোর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে। সত্যবতী চরিত্রটি দেশপ্রেমের প্রতীক। সে মেবারের সগরসিংহের কন্যা ও মহাবতের ভগ্নী। তার মতো রাজ পরিবারের একটি কন্যা ও বধূর পক্ষে পথে পথে গান গেয়ে বেড়ানোর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে না হয় কোনো প্রশ্ন তোলা হলো না, কিন্তু সে যে ভাবে নাটকীয় ক্রিয়ার সঙ্কট মুহূর্তে প্রায়ই আবির্ভূত হইয়েছে তা প্রায় অলৌকিকতার পর্যায়ে পড়েছে। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে মেবারের রানা অমরসিংহ সামন্তবর্গের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোগলের সঙ্গে সন্ধি করতে উদ্যত, এমন কি প্রতাপসিংহের বিশ্বস্ত বীর সেনাপতি গোবিন্দ সিংহের সকল যুক্তি নিষ্ফল প্রতিপন্ন, ঠিক তখনই "বেগে সত্যবতী প্রবেশ করিলেন।" মেবার রাজের মন্ত্রণা সভায় সকল বাধা এড়িয়ে একজন অজ্ঞাত কুলশীল (তখনও সত্যবতীর পরিচয় কেউ জানে না) রমনী কেমন করে উপস্থিত হতে পারে তা বুদ্ধির অগোচর। শুধু তাই নয়, তার তেজোদ্দীপ্ত সংলাপ'—কখন না সামন্তগণ। তোমরা যুদ্ধের জন্য সাজো। রাণা যদি তোমাদের যুদ্ধে নিয়ে যেতে অস্বীকৃত হন, আমি তোমাদের সেনাপতি হবো।" অমনি সকলের দ্বিধা দূর হলো, স্থবির বীর গোবিন্দসিংহ পিস্তল দিয়ে আয়না ভাঙলেন এবং অমরসিংহ যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হলেন। এমন একবার নয়, একাধিকবার সঙ্কটকালে উপস্থিত হয়ে সে অনুরূপ কার্য করেছে [দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য]। এতে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে কতটা জানি না, কিন্তু Causal necessity যে বিনষ্ট হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অথবা, নাট্যকারের অপর মুখপাত্র মানসী চরিত্রটিকে গ্রহণ করা যাক। মানসী নাট্যকারের মানসকন্যা, তাঁর মহানীতির প্রকাশক—বিশ্বপ্রেমের প্রতীক। রাজঅন্তঃপুরে থেকে বিশ্বপ্রেম ও মানবসেবার অভীপ্সা মানসীর অন্তরে আসা হয়তো স্বাভাবিক, কিন্তু সে যেভাবে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মতো অন্ধকার রজনীতে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে মোগল ও রাজপুত নির্বিশেষে আহত সৈনিকের সেবা করেছে তা সকল সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করেছে। নাটকে প্রমাণ আছে যে রাণা অমরসিংহের অগোচরেই মানসী রাতে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলো। এটা যে একেবারেই অসম্ভব, যুদ্ধকালীন সঙ্কট সময়ে দুর্গের বাইরে রাজার অনুমতি ব্যতীত যাওয়া এমনিতেই কঠিন, তার ওপর রাত্রিকালো কোনো রমণীর পক্ষে তা একেবারেই অবাস্তব। অথচ দ্বিজেন্দ্রলাল নির্দ্বিধায় তা করিয়েছেন, তাতে হয়তো তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু নাটকের যুক্তিক্রম বজায় থাকে নি।

অনুরূপ আরো বহু দৃষ্টান্ত নানা নাটক থেকে উদ্ধৃত করা চলে, সম্ভবত তার আর প্রয়োজন নেই। আমাদের যা প্রতিপাদ্য তা উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে বলা যায়। এই হেতু বধি লঙ্ঘন' বাঙালী নাট্যকারদের একটি প্রবণতা রূপে দেখা দিয়েছিলে বলে তিলতর্পণ নাটকে অমৃতলাল বসু প্রচণ্ড ব্যঙ্গ করেছিলেন। 'তিলতর্পণ' নাটকে দেখা যায় চিতোরের রাণা বাপ্পাদিত্যের সঙ্গে বাঙলার নবাব আলীবর্দী খানের যুদ্ধ। জয়লাভের আকাঙ্ক্ষায় বাপ্পাদিত্য কোলকাতার মার্টিনী কোম্পানী থেকে রাইফেল আনবেন বলে স্থির করেছেন। অন্যদিকে, রাজকন্যা হেমাঙ্গিনী বাগানের মালী অজাগর মাইতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুক্তপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন। অর্থাৎ উপস্থিত চমৎকারিত্বের মোহে কি ভাবে নাটকীয় ঔচিত্য বিসর্জন বাঙালী নাট্যকারেরা দিয়ে থাকেন, অমৃতলালের নিপুণ চিত্রণের পর সম্ভবত এ বিষয়ে অধিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয় না।

১ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড—২০৩
২ ড. বিষ্ণু বসু : ধনঞ্জয় বিরচিত দশরূপক [থিয়েটার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৭৪] পৃ ৮৩-৮৪
৩ C. R. Devadhar : Urubhangam [Oriental Book Agency : 1940] P. 3
৪ পূর্ণচন্দ্র বসু : সাহিত্যে খুন (সমালোচনা সাহিত্য) পৃ. ৪৬
৫ ড আশুতোষ ভট্টাচার্য : তদেব, পৃ. ১৩২
৬ তদেব - পৃ. ১৩২
৭ ড. ক্ষেত্র গুপ্ত : কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী—পৃ. ১৭৪
৮ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : তদেব—পৃ. ২৮
৯ কালীপ্রসন্ন ঘোষ : নাটক [সমালোচনা সাহিত্য] পৃ. ২০৪

১০ ড. অজিতকুমার ঘোষ : নাটকের কথা [সুপ্রকাশ : ১৯৫৯] পৃ. ৬৩ ৬৪
১১ George Thomson : Marxism and Poetry [P. P. H. 1954] P. 43
১২ Op. Cit—P. 43
১৩ Op. Cit—P. 43
১৪ Op. Cit—P. 43
১৫ নীরেন্দ্রনাথ রায় : সাহিত্য বীক্ষা [ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লি., ১৯৫৫] পৃ. ৫৬
১৬ Boris Ford (ed) : The Age of Shakespeare [Pelican, 1962] P. 98
১৭ নীরেন্দ্রনাথ রায় : সাহিত্য-বীক্ষা—পৃ. ৬৬
১৮ দীনবন্ধু রচনাবলী : ড ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত - পৃ. ১৬
১৯ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : মধুসূদন, কবি ও নাট্যকার [এ. মুখার্জী—১৩৭২] পৃ. ১৪০
২০ George Steiner : The Death of Tragedy [Faber & Faber, 1961] P. 6
২১ Op. Cit—P. 6-7
২২ ড. অজিতকুমার ঘোষ : বাংলা নাটকের ইতিহাস [জেনারেল প্রিণ্টার্স : ১৩৬২] পৃ. ২১৬
২৩ A. C. Bradley : Shakespearean Tragedy—P. 231
২৪ রথীন্দ্রনাথ রায় : দ্বিজেন্দ্রলাল—পৃ. ২৩১
২৫ Henry Fluchere : Shakespeare [Longmans : 1960] P. 242
২৬ Cp. Cit—P. 241
২৭ রথীন্দ্রনাথ রায় : তদেব—পৃ. ৩০৮
২৮ George Steiner : Cp. Cit—P. 344
২৯ Op. Cit—P. 342
৩০ Op. Cit—P. 342
৩১ Op. Cit—P. 342
৩২ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : তদেব—পৃ. ২৭ ২৮
৩৩ Perspectives On Drama [O. U. P. : 1968] P. 154
৩৪ Cp. Cit—P. 154-55
৩৫ Op. Cit—P. 159
৩৬ Lajos Egri : The Art of Dramatic Writing [Simon & Schuster : 1960] P. 255
৩৭ নীরেন্দ্রনাথ রায় : তদেব—পৃ. ৬১
৩৮ নীরেন্দ্রনাথ রায় : তদেব—পৃ. ৬১-৬২
৩৯ নীরেন্দ্রনাথ রায় : তদেব—পৃ. ৬১-৬২

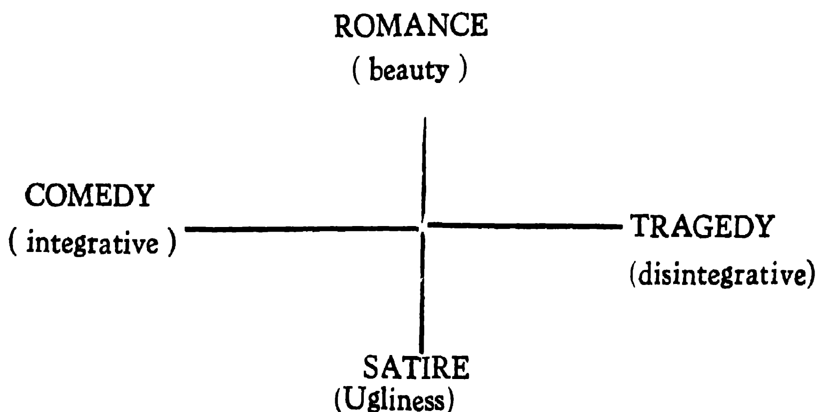
———

ষষ্ঠ অধ্যায়

কমেডি থেকে প্রহসন

এক

Elements of Drama গ্রন্থের লেখকদ্বয় নাটক সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক নক্সা অঙ্কিত করেছেন। আলোচনার সুবিধের জন্য বর্তমান প্রবন্ধ তাই দিয়েই সুরু করা গেল।



নাট্যকার তাঁর দর্পণে has focused on the beautiful or the ugly, on the orderly or the chaotic, on what is best or what is worst in the world [১]., কোনো নাটকে the beautiful and the orderly tends towards an idealised vision of the world-এর ওপর জোর দেওয়া হলে তাকে romance বলা চলে এবং ugly and chaotic tends toward a debased view of the world-এ আলোক সম্পাত করলে তা satire হতে বাধ্য হয়। সমালোচকের মতে, উভয়-দৃষ্টিভঙ্গীই অত্যন্ত চরমপন্থী একদেশদর্শী ও স্থিতিশীল।

উপরোক্ত দুই কোটির মধ্যে রয়েছে a pair of dynamic processes which take place in a world neither so beautiful as that of the romance, nor so ugly as that of satire.[২] প্রজাতি হিসেবে এদেরই ট্র্যাজেডি ও কমেডি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এ আলোচনায় অতি সরলীকরণের প্রয়াস প্রকাশ পেলে ট্র্যাজেডি ও কমেডির পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্ট হয়েছে বলা যায়। ট্র্যাজেডি যদি হয় মানুষের সংগ্রাম মুখর জীবনের প্রতিফলন, কমেডি তার শান্ত মুহূর্তের বিশ্রাম। ট্র্যাজেডি যদি হয় পর্বত-শৃঙ্গের শীর্ষবিন্দু, কমেডি প্রসারিত মালভূমি। ট্র্যাজেডিতে ব্যক্তির অহংবোধের আপাত পরাজয়। কমেডিতে সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির সমন্বয় ঘটিয়ে শান্তি স্থাপন। উভয়েই মানুষের জীবনে একান্ত সত্য।

প্রতীচ্য নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ট্র্যাজেডি ও কমেডি (ব্যাপক অর্থে) সেখানে যেন যৌথ জীবনে অভ্যস্ত। অর্থাৎ যে কালে যে দেশে শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি রচিত হয়েছে, ঠিক সে দেশে ও সেকালে শ্রেষ্ঠ কমেডিও রচিত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলোর প্রায় সমসময়েই আরিস্তো-ফেনিসের কমেডিগুলো লেখা। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কমেডিলেখক ম্যালিয়ের ও ট্র্যাজেডি লেখক রাসিন সমকালীন, স্পেনের থেরভেনতেস ও লোপে দ্য ভেগা—কমেডি ও ট্র্যাজেডি লেখকদ্বয়—একই সময়ে আবির্ভূত। সর্বোপরি রয়েছেন শেকস্পীয়র পৃথিবীর মহত্তম ট্র্যাজেডি ও শ্রেষ্ঠতম কমেডির নাট্যকার। আর শেকস্পীয়রের এক প্রান্তে রয়েছেন ট্র্যাজেডির মার্লো, অপর প্রান্তে কমেডির জনসন।

কেন এমন হলো ? একই যুগ কি হাসি ও কান্না, দুঃখ ও আনন্দের পক্ষে সমভাবে উপযোগী। যুগের গভীরে আছে কি এমন কোনো বিপন্ন বিস্ময় যা মানুষকে যুগপৎ বিপরীত রসপ্রকাশে উদ্বেল করে তোলে ? 'সংগ্রাম ও শান্তি' তবে কি মানব সভ্যতায় সহবাসে বিশ্বাসী!

হোরেস ওয়লপোল একবার বলেছিলেন "The world is a comedy to those who think, a tragedy to those who feel। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে সার্থক নাটক সে জাতির পক্ষেই সৃষ্টি করা সম্ভব যার মধ্যে রয়েছে জীবনের আলোড়ন। এই জীবনের আলোড়ন সত্য ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে হৃদয় ও মস্তিষ্কের পারস্পরিক বিকাশে, আবেগ ও বুদ্ধির চরমোৎকর্ষে। সম্ভবত সে কারণেই ট্র্যাজেডি ও কমেডি সমকালে নাট্য সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

দুই

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি ট্র্যাজেডি রচনা বিষয়ে বাঙালী নাট্যকারদের সাফল্য ও ব্যর্থতা। উনিশ শতকীয় বাঙলার যুগ পরিবেশ এবং বাঙালী নাট্যকারদের প্রবণতা ও প্রতিভা যে ট্র্যাজেডি রচনার অনুকূল ছিলো না, সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে কমেডি রচয়িতা হিসেবে বাঙালী নাট্যকারগণ সার্থকতার কোন শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়েছিলেন।

কমেডি আলোচনা প্রসঙ্গে Northrop Frye-এর মন্তব্যটি মনে রাখা প্রয়োজন। তাঁর মতে—"Comedy blends insensibly into satire at one extreme and into romance at the other"[৩] প্রহসন ও রোমান্স একই জীবনদৃষ্টির ভিন্নমুখী প্রকাশ। যেখানে পরিবেশকে মানুষ নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম সেখানে সৃষ্টি হয় রোমান্স এবং অভিলষিত পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে রচিত হয় প্রহসন। রোমান্সের অবলম্বন প্রেম, প্রহসনের ব্যঙ্গ।

বাঙলা কমেডিতেও এই দ্বিমুখী ধারার প্রবণতা লক্ষ্য করার মতো। প্রথম বাঙলা কমেডি 'ভদ্রার্জুন' সুভদ্রা ও অর্জুনের প্রেমকাহিনী নিয়ে রচিত। প্রথম অভিনীত মৌলিক নাটক বা প্রথম সার্থক বাঙলা নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব' সামাজিক প্রথার প্রতি ব্যঙ্গ। এই রোমান্স বা প্রেম বাঙলা সাহিত্যে যেমন একদিকে শর্মিষ্ঠা পদ্মাবতী বা মুকুলমুঞ্জরার মতো গভীর রসের লক্ষণাক্রান্ত নাটক সম্ভব করেছে, আবার অন্যদিকে আলিবাবা শিরিন ফরহাদ বা দু'টি প্রাণ-এর মতো লঘু, অবাস্তব কখনো বা উদ্ভট নাট্যরসের সৃষ্টি করেছে। প্রহসনেও অনুরূপ এককোটিতে রয়েছে বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, সধবার একাদশীর মতো অস্ত্যর্থক ও গঠন মূলক মনোভঙ্গী দ্বারা রচিত ব্যঙ্গ, অন্যদিকে বিবাহ বিভ্রাট, ব্যাপিকাবিদায় বা কিঞ্চিৎ জলযোগের মতো মূলত প্রগতি-বিরোধী প্রহসন। বাঙলা প্রহসনে স্যাটায়ারের আধিপত্য অধিক হলেও কখনো কখনো উইট বা হিউমারের প্রবণতাও লক্ষ্য করার মতো। অলীকবাবু, চিরকুমার সভা বা বৈকুণ্ঠের খাতা জাতীয় প্রহসন বিরল হলেও অলভ্য নয়।

তিন

রোমান্সমূলক কমেডির উপজীব্য প্রেম। শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতীর মাধ্যমে মধুসূদন প্রেমের প্রতিষ্ঠায় যত্নবান। ট্র্যাজেডি রচনায় বাঙালীর যেমন কোনো ঐতিহ্য ছিলো না, কমেডিতে সেরকম অসুবিধে ছিলো না। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কমেডির প্রতুলতা ও শ্রেষ্ঠতা বিশ্বের রসিকচিত্তেও আনন্দসঞ্চার করে থাকে। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমেডি 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম'—গ্যায়টে যার প্রশংসায় উচ্চকণ্ঠ ছিলেন, প্রাচীন সাহিত্যে ভারতীয় কবি কালিদাসের অমর অবদান। তাছাড়া উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক, রত্নাবলী, স্বপ্নবাসবদত্তা প্রভৃতি নাটক যুগে যুগে ভারতীয় সাহিত্যিকদের প্রভাবিত করেছে। বাঙালী নাট্যকারগণ সঙ্গত কারণেই সংস্কৃতি নাট্যসাহিত্যের উত্তরাধিকার অর্জন করেছেন। বিশেষত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' ও 'রত্নাবলী' বাঙালীচিত্তে সাড়া জাগিয়েছিলো সমধিক। উনিশ শতকীয় বাঙলা পত্র-পত্রিকায় 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নিয়ে আলোচনার প্রাবল্য লক্ষ্য করার মতো। কালিদাসের এই নাটকটিতে কমেডি চেতনার এমন একটি গভীরতা ও ব্যাপকতা প্রকাশ পেয়েছে, জীবনের তরঙ্গ ও প্রশান্তি নাটকটিতে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত রয়েছে যা শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক নাটকের মধ্যেও সহজে

মেলে না। Peace passeth understanding এই যদি হয় মহৎ সাহিত্যপাঠের ফল তবে শকুন্তলায় তা পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে—এমন অভিমত অত্যুক্তি নয়।

সংস্কৃত কমেডি বাঙালী নাট্যকারদের যেমন প্রভাবিত করেছিলো, তার উৎকর্ষ সম্ভবত তাঁদের কতকগুলো বাধার সম্মুখীন করেছিলো। সংস্কৃত ও ইংরেজী কমেডির দ্বিমুখী অভিঘাতে তাদের কিছুটা ত্রস্ত হতে হয়েছিলো। বাঙলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম সার্থক কমেডি-নাট্যকার মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী-তে এই দ্বিধার পরিচয় মেলে। বিশেষত শর্মিষ্ঠা রচনাকালে মধুসূদন রত্নাবলী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন অধিক পরিমাণে। কয়েকটি ব্যতীত অধিকাংশ সংস্কৃত নাটক গতানুগতিক ছকবাঁধা প্রেমকাহিনী অবলম্বনে রচিত। তা অত্যন্ত আড়ষ্ট, অভিজাত সম্প্রদায়ের আড়ম্বরপূর্ণ প্রাণহীন বিলাস, জীবনের তরঙ্গস্পন্দন সেখানে প্রায় অনুপস্থিত। রত্নাবলী নাটকের জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো অলক্ষ্য নয়। অধ্যাপক কীথের ভাষায়—সংস্কৃত নাট্যকারগণ "make no attempt at realism ; they choose their subjects from the legend, and they cast over the trivial 'amourettes' of their heroes the glamour derived from the assurance that the winning in marriage of a maiden will assure them universal rule. The action of the play is thus not suffered to degenerate into a portrayal of the domestic difficulties of harem system under polygamic conditions ; the dramatists do not seek realism, but are content to reproduce a stereotyped scheme of love, jealousy, parting and reunion, a sequence well calculated to evoke the sentiment of love in the mind of the audience.[৪] অধ্যাপক কীথের বিচারে কিছু একদেশদর্শিতা প্রকাশ পেলেও তাঁর সিদ্ধান্ত সঠিক বলেই মনে হয় এবং অধিকাংশ সংস্কৃতনাটকে Scheme of love যে অত্যন্ত stereotyped সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের এই গতানুগতিকতার কারণ হিসেবে অধ্যাপক কীথ বলেছেন—The emotions which thus it was desired to evoke, were, however, strictly limited by the Brahminical theory of life. The actions and status of man in any existence depend on no accident ; they are essentially the working out of deeds done in a previous birth, and these again are explained by yet earlier actions from time without beginning.[৫] সমালোচকের এ মন্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য হলেও সংস্কৃতনাটকের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে সম্পূর্ণ সার্থক এমন কথা বলা যায় না। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ছিলো কঠোরভাবে শ্রেণীভিত্তিক। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য বিশেষভাবে অভিজাত শ্রেণীর মানসফসল। কালিদাস যে শুধু বিখ্যাত নৃপতির সভাকবি ছিলেন তা নয়,

প্রখ্যাত নাট্যকারদ্বয় শ্রীহর্ষ ও শূদ্রক রাজা ছিলেন। সুখদুঃখ তরঙ্গিত সাহিত্য রচনায় কোনো দেশের great tradition ও little tradition-এর সার্থক সমন্বয়ের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে ; ···সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকটার উপরে দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ নিম্নসাহিত্য এবং উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটি যোগ আছে।"[৬] এখানেও রবীন্দ্রনাথ 'সার্বভৌমিক' সাহিত্য রচনায় great tradition ও little tradition-এর সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সংস্কৃত নাট্যকারগণ তাঁদের শ্রেণীগত অবস্থানের ঋজুতার দরুন little tradition অস্বীকার করেছেন, ফলে তাঁদের রচনায় ব্যাপক অর্থে জনজীবন অবহেলিত হয়েছে এবং সেজন্য তাঁদেব অবলম্বিত great tradition কৃত্রিম ও বর্ণহীন হয়ে পড়েছে।

শেকসপীয়বের কমেডিগুলো, অপর পক্ষে, ছিলো ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রাণচাঞ্চল্যে উন্মুখর। শেকসপীয়র অভিজাতশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা পেলেও ইংল্যাণ্ডের সমকালীন little tradition-কে অস্বীকার করেন নি, বরং স্বীকরণ করে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রতিভার আলোকসম্পাত জীবনের সবদিকে পরিব্যাপ্ত হয়েছিলো। ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত প্রেম ও তার বিজয়বার্তা সে কারণেই তাঁর রোমান্টিক কমেডিগুলোকে প্রাণস্পন্দিত করে তুলেছে।

চার

সংস্কৃত নাটক ও শেকসপীরীয় কমেডির এই উভয়মুখী অভিকর্ষ 'শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী'র আন্তরসত্তায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। শর্মিষ্ঠা নাটকে মধুসূদন প্রাচীন কাহিনীর মাধ্যমে নবযুগে অর্জিত প্রেমবোধ প্রকাশে যত্নবান হয়েছেন। সখী সপত্নী-ঈর্ষা যদি হয় শর্মিষ্ঠা নাটকের বীজ তা হলে এই ঈর্ষা নারীর অধিকার-বোধের সঙ্গে মিশে আছে। এই অধিকার-বোধ মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তি এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নবজাগৃতির ফসল। পদ্মাবতী নাটকে নারী-সৌন্দর্যের গরিমা-প্রকাশ নাট্যকারের উদ্দেশ্য। গ্রীক উপকথাকে ভারতীয়করণের মাধ্যমে মধুসূদনের সেই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হয়েছে এবং এই নারী-সৌন্দর্য বন্দনা বিশেষভাবে আধুনিক কালের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবদান। প্রেমের এই বিচিত্র বিকাশ অবলম্বনে মধুসূদন আধুনিকতাকে লক্ষ্য ভেদ করেছিলেন সঠিকভাবেই, কিন্তু তাঁর রূপায়ণে সর্বদা উপযুক্ত সমতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। বিশেষত 'রত্নাবলীর' প্রতাপ শর্মিষ্ঠা নাটককে অনেকাংশে বর্ণহীন বর্ণনায় পর্যবসিত করেছে। শুধুমাত্র চরিত্র পরিকল্পনায় নয়, ক্রিয়াবিন্যাস ও সংলাপেও রত্নাবলীর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

শেকসপীরীয় রোমান্টিক কমেডির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে সমালোচক লিখছেন—
"What in general terms, is the structure of Shakespearean romantic comedy ?···It is non-satiric although,···Satire as a device is indispensable to it. But here Satire, instead of being the chief end, is but a means or device in a larger conception of comic structure. That structure deals with a love story which though for a time frustrated, is in the end brought to a happy conclusion."[৭]

উপরোক্ত শেকসপীরীয় লক্ষণ শুধু মধুসূদনের কমেডি কেন বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের প্রায় সকল রোমান্টিক কমেডির প্রতি প্রয়োগ করা চলে। সমালোচক Peter G. Phialas অবশ্য শেকসপীরীয় কমেডির এ বৈশিষ্ট্যকে external obstruction বলেছেন। কিন্তু What gives Shakespeare's romantic comedies their uniqueness is the nature of the special conflict which for a time frustrates their love stories. For in addition to external obstruction supplied by the secondary plot and far surpassing it in significance, there is an interior conflict, as frustration or opposition coming from the lovers themselves[৮]

সমালোচক কথিত interior conflict বা opposition coming from the lovers themselves সংস্কৃত কমেডিতে অপ্রাপ্য এবং মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী এ বিষয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসারী। পদ্মাবতী নাটকে নায়কনায়িকার বিপ্রলম্ভ ও মিলনে দৈবস্বেচ্ছাচারিতা প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর মধ্যে এমন কোনো অভিঘাত নেই যা পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে উভয়ের মানসমর্মমূলে তরঙ্গ তুলেছে। সে তুলনায় শর্মিষ্ঠা নাটকে যযাতি-দেবযানী শর্মিষ্ঠার প্রণয় অনেক বেশী প্রাণস্পন্দিত। কেননা শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রেম ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর মতো বৈচিত্র্যহীন দ্বৈরথ নয়। শর্মিষ্ঠায় একই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে দু'টি রমণীর প্রণয় অনন্ত সম্ভাবনাময় ত্রিভুজ সমস্যার সূত্রপাত করেছে। শুধু তাই নয়, দৈবনিরপেক্ষ প্রবল অভীপ্সা যযাতি ও নায়িকাদ্বয়কে নিয়ত তাড়না করেছে। তাদের কর্মপ্রচেষ্টা তাদের স্বকীয় উপলব্ধির ফসল হয়ে দেখা দিয়েছে। সাধারণভাবে এরূপ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সচরাচর সম্ভব হয় না এবং মধুসূদনকেও শর্মিষ্ঠা নাটকের সমস্যার সমাধানকল্পে দৈবশক্তি নির্ভর করতে হয়েছে। ফলে যে প্রেম নাটকে interior conflict হয়ে দেখা দিয়েছিলো তার একটি সাদামাটা সমাধান সম্পন্ন হয়েছে।

পাঁচ

পূর্বেই বলা হয়েছে, কমেডি দ্বিবাহু সমন্বিত—একটি বুদ্ধিচালিত অপরটি হৃদয়-তাড়িত। শেকস্‌পীয়র এবং জনসন-মলিয়েরের মধ্যে প্রধান পার্থক্য—Shakespeare's

comedy is emotional, fanciful, tender, human; Johnson's and Moliere's is intellectual, realistic, critical.[৯] অর্থাৎ জনসন বা মলিয়েরের প্রভৃতি নাট্যকারদের রচনা হলো comedy of ideas এবং শেকস্‌পীয়রের comedy of emotions.

কমেডির অবলম্বন যদি হয় হাস্যরস, তাহলে এখানে একটি সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। হাস্যরস, বা laughter সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ফরাসী দার্শনিক বের্গস একটি প্রতিপাদ্য উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে—"Indifference is its natural environment, for laughter has no greater foe than emotion ..To produce the whole of its effect, then, the comic demands something like a momentary anesthesia of the heart. Its appeal is to intelligence, pure and simple.[১০] তখনই প্রশ্ন জাগে তাহলে শেকসপীয়র রচিত কমেডিগুলো—যার আবেদন মূলত হৃদয় বা আবেগের কাছে—কোন্ শ্রেণীভুক্ত হবে। এখানেই প্রচলিত কমেডিচেতনার ওপর শেকস্‌পীয়রের বিজয়বার্তা ঘোষিত হয়েছে এবং বিশ্বসাহিত্য প্রথাগত বিধির বাইরে একটি নতুন স্বাদের কমেডি উদ্ভাবনে সমর্থ হয়েছে। আধুনিক ট্র্যাজি-কমেডি এই শেকসপীরীয় রীতিরই সার্থক অনুবর্তন।

মধুসূদনের কমেডি চেতনায় আবেগ প্রাধান্যই লক্ষ্য করা যায়, সাহিত্য সৃজনে momentary anesthasia of the heart তিনি পছন্দ করতেন না। শর্মিষ্ঠা-পদ্মাবতীতে মধুসূদন emotional, tender, human. কিন্তু বাঙলা নাট্যসাহিত্যে মধুসূদন প্রবর্তিত কমেডিধারা সার্থকভাবে অনুসৃত হয়েছিলো কি না বিচার্য। সাধারণতঃ লক্ষ্য করা যায়, কমেডির তুলনায় ট্র্যাজেডি—এবং অবশ্যই মেলোড্রামা—দর্শক অভিনন্দনে ধন্য হয়ে থাকে। তার কারণ for comedy you need a more refined public than for tragedy, since the latter concerns the sufferings and feelings of humanity, even unconscious ones. and awakens these powerfully even in souls that are fast asleep, whereas the former requires for appreciation people who have grown up in a mature civilization.[১১]

উনিশ শতকীয় বাঙালী দর্শকের ছিলো না এমন কিছু subtlety of taste বা an observant mind যা সার্থক কমেডি উপভোগে সাহায্য করে। সম্ভবত সে কারণেই মধুসূদনের অনুবর্তী বাঙালী নাট্যকারগণ রোমান্টিক কমেডি বা comedy of emotion রচনায় বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন নি। গিরিশচন্দ্রের প্রায় আশিটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে মাত্র গুটি দুই তিনেক রোমান্টিক কমেডি, দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাবলীতে একটি (চন্দ্রগুপ্ত) এবং রবীন্দ্রনাথেও অনুরূপ একটি (চিত্রাঙ্গদা) লক্ষ্য করা যায়।

প্রহসন ব্যতিরিক্ত মধুসূদনের তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে দু'টিই রোমান্টিক কমেডি। অথচ পরবর্তী প্রধান নাট্যকারগণ এবিষয়ে অনাগ্রহী কেন হলেন, তা গভীর অর্থবহ।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থে উনিশ শতকের বাঙালী সাধারণ রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত নাটকসমূহের যে বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন, [১২] তাতে দেখা যায় রোমান্টিক কমেডি তুলনামূলকভাবে অভিনীত হয়েছে কম। শর্মিষ্ঠা কয়েকবার অভিনীত হলেও পদ্মাবতী অভিনীত হয়েছে মাত্র একবার। গিরিশ-চন্দ্রের রোমান্টিক কমেডিগুলো বিশেষ জনপ্রিয় ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' পাদপ্রদীপের আলোয় উপস্থিত হয়েছিলো কিনা সন্দেহ। একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' এ শ্রেণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাটক, কিন্তু তার জনপ্রিয়তা অর্জনের কারণ ভিন্ন। এক দিকে দেশপ্রেম ও বাৎসল্যরস এবং অপরদিকে চাণক্যচরিত্রের অতিনাটকীয়তা এ নাটকটিকে দর্শক প্রশংসাধন্য করেছিলো এমন মন্তব্য অযৌক্তিক নয়।

ছয়

মধুসূদন এবং গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যবর্তী স্থলে দীনবন্ধু মিত্রের অবস্থান। বাঙালী নাট্যকারদের মধ্যে সম্ভবত একমাত্র তিনিই সর্বাধিক জনপ্রিয় রোমান্টিক কমেডি রচনা করেছিলেন। তাঁর নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী, কমলে কামিনী এবং জামাইবারিক * উনিশ শতাব্দীর বাঙালী পাঠক ও দর্শকেব কাছে অত্যন্ত পরিচিত নাম। এ নাটকগুলির সার্থকতা ও ব্যর্থতা বাঙলা রোমান্টিক কমেডির সাফল্য ও ব্যর্থতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

নাটকে প্রেমরূপায়ণে দীনবন্ধুর ব্যর্থতা সম্পর্কে উপযুক্ত আলোকসম্পাত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি লিখেছেন—"লীলাবতী বা কামিনী শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিলো না,—কেন না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বঙ্গসমাজে ছিলো না। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টসিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন তাঁহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙলা সমাজে ছিল না" [১৩] কঠোর সামাজিক বিধি অনুশাসিত বাঙলাদেশে যৌবন আগমনের পূর্বেই কন্যার বিবাহ দিবার রীতি ছিলো এবং যেখানে এ রীতির ব্যত্যয় হতো সেখানেও নিজের পরিজন ব্যতীত

---

* জামাই বারিককে যদিও প্রহসনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তথাপি নাটকটির মধ্যে এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যা সাধারণভাবে রোমান্টিক কমেডির লক্ষণাক্রান্ত। বিশেষত শেষদৃশ্যে অভয়কুমার ও কামিনীর মিলন নিঃসন্দেহে প্রহসনেব চাপল্য অতিক্রম করে প্রেমের গভীরতা স্পর্শ করার অভিলাষী হয়েছে।

অপর পুরুষের সঙ্গে কোনো রমণীর পরিচিত হওয়া ছিলো প্রায় অসম্ভব। উনিশ শতকীয় বাঙলা নাটকের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের অবিবাহিত নায়িকাদের বয়স অধিকাংশ স্থলেই অবাস্তব হয়েছে। বার তের বছর বয়সী কন্যাদের ওপর তিনি যেমন প্রগাঢ় যৌবনার অনুভাব আরোপ করেছেন তা সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রকেও রোমান্টিক প্রেমসৃজনে ঐতিহাসিক দূরত্বে প্রস্থান করতে হয়েছে অথবা বিবাহিত জীবনের নিরাপত্তায় প্রবেশ করতে হয়েছে। রজনী চরিত্র অবশ্য সমকালীন সমাজে স্থাপিত, কিন্তু তাকেও উপন্যাসে যৌবনলাভ করতে অন্ধত্ব অর্জন করতে হয়েছে এবং রজনী চরিত্রও এমন কিছু স্বাভাবিক নয়। অথচ নাটকের তুলনায় উপন্যাসে লেখকের স্বাধীনতা অনেক বেশি। কেন না পাঠ্যহিসেবে যা মনোরম দৃশ্যহিসেবে তা স্বাভাবিক নাও হতে পারে। উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে পাঠকের যোগ পরোক্ষ কিন্তু নাটকের চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের যোগ প্রত্যক্ষ। কবিতায় রোমান্টিক প্রেম একান্তভাবেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ, কবির নিজস্ব অনুভূতি ও কল্পনার জগৎ। রোমান্টিসিজমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হারফোর্ড যখন extraordinary development of imaginative sensibilities-এর কথা বলেন, তখন সেখানে সমষ্টিচেতনা প্রাধান্য পায় না। অথচ নাটক একান্তভাবে সমষ্টি চেতনা দ্বারা প্রভাবিত। সেকারণে বাঙলা সাহিত্যে কবিতা বা উপন্যাসে রোমান্টিক প্রেমের প্রকাশ গভীর ও বিচিত্র হলেও নাটকে তার রূপায়ণ সার্থক হতে পারে নি।

রোমান্টিক প্রেমসৃজনে বাঙালী নাট্যকারদের ব্যর্থতার এই কারণটি ব্যতীত অপর একটি গুরুতর কারণ উপস্থিত করেছেন ড সুশীলকুমার দে। তাঁর মতে "নূতন রোমান্টিক সাহিত্যের প্রভাবে রোমান্সের দিকে একটি কৃত্রিম ঝোঁক সেযুগের অনেক লেখকের মতো দীনবন্ধুরও মন অধিকার করিয়াছিল।"[১৪] কিন্তু "রোমান্সের সূক্ষ্মভাব কল্পনা" দীনবন্ধু বা তাঁর অনুগামী নাট্যকারদের অধিগত ছিলো না। রোমান্টিক প্রেম কল্পনা একদিকে প্রগাঢ় সৌন্দর্য অনুভূতি এবং অন্যদিকে গভীর আসক্তি বা passion-এর সম্মিলিত ফসল। তাছাড়া, সৌন্দর্যবোধকে idealized করতে অক্ষম হলে রোমান্টিক প্রেম স্ফূর্তিলাভ করে না। কালিদাসের "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের এই idealized অভিব্যক্তি। শেকস্পীয়র ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে। কিন্তু দীনবন্ধুর কবিকল্পনা কঠোরভাবে বাস্তবতায় সীমাবদ্ধ। তাই তাঁর পক্ষে সৌন্দর্য, প্রেম ও আসক্তির সার্থক সমন্বয় সম্ভব হয় নি এবং তাতে উপযুক্ত ঊর্ধ্বায়ণও অপ্রাপ্য। যেমন—

লীলা। মনে মনে মন যাঁরে অর্পিয়াছে মন,
সংসারে সম্বল যাঁর নির্মল চরণ,
রয়েছে সজীব যাঁর জীবনে জীবন,

জীবন সঞ্চারে যাঁরে প্রিয় দরশন,
যাঁহার গলায় মানসিক স্বয়ম্বরে,
দিয়েছি প্রণয়মালা পবিত্র অন্তরে,
তাঁহারে বলিতে স্বামী যদি নাহি পাই,
কিছুমাত্র প্রয়োজন পৃথিবীতে নাই,
পবিত্র প্রণয় মৃত-দেহের সহিত
সহমরণেতে যাব হয়ে হরষিত ;
এমন আরাধ্যদেব সংসারের সার,
ধরিতে তাঁহার আঁখি কি লাজ আমার ?

ললিত। পীরিতের রীতি এই স্বভাবে ঘটায়,
প্রতিদানে ভালবাসা ভালবাসা পায়—
যদি না তোমার মন হইত এমন,
আমি কেন হব বল এত উচাটন ?
মনে মনে মন মম জেনেছিল মন,
তাই এত করিয়াছে তব আরাধন।
সার্থক জীবন আজ মানস সফল,
পতিত জলস্থানলে জল সুশীতল,
যথায় যেমনে থাকি ভাবি নেকো আর,
তুমি ত আমার প্রিয়ে বলিলে আমার।

[৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক]

উদ্ধৃত সংলাপে ভাষার কৃত্রিমতা ও কবিত্বের দুর্বলতার কথা ছেড়ে দিলেও প্রেম সম্পর্কিত যে কল্পনা প্রকাশ পেয়েছে তা নিতান্তই আড়ষ্ট ও সৌন্দর্য বর্জিত। বিশেষতঃ আসক্তি ও আবেগ চরিত্র দু'টিতে একেবারেই অনুপস্থিত, কাজেই প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের idealized রূপায়ণ এখানে সম্ভব হয় নি। শুধু লীলাবতী ও ললিত নয়, নবীন তপস্বিনীতে বিজয় ও কামিনীর চরিত্র চিত্রণেও অনুরূপ কৃত্রিমতা প্রকাশ পেয়েছে ড. সুশীলকুমার দের মতে দীনবন্ধুর এই অক্ষমতা প্রধানতঃ তাঁর হাস্যরসপ্রবণতা ও বাস্তবপ্রিয়তা থেকে এসেছে।

সাত

দীনবন্ধুর নাটকে রোমান্স নির্ণয়ে সমালোচকের এরূপ বিশ্লেষণ কার্যকরী হলেও গিরিশচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তী নাট্যকারদের সম্পর্কে প্রযোজ্য কিনা সন্দেহ। কেননা, গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুর মতো কখনোই কঠোর বাস্তববাদী ও হাস্যরসপ্রিয় ছিলেন না।

বাস্তবপ্রিয়তা তিনি 'নর্দমা ঘাঁটা'র সমতুল্য মনে করতেন। তিনি সর্বদা নিজের সৃষ্ট সমুচ্চ আদর্শলোকে বিচরণ করতে ভালবাসতেন। তাঁর নাটকের রোমান্টিক প্রেমও এই আদর্শলোকের অন্তর্গত। গিরিশচন্দ্রের বিভিন্ন নাটক থেকে তাঁর প্রেম সম্পর্কিত উক্তি উদ্ধৃত হলো।

১। অচ্যুতানন্দ : স্বার্থ বিসর্জন জেন প্রেমের লক্ষণ।
পরসুখে সুখী যেই প্রেমিক সেজন।
কামগন্ধহীন যে পবিত্র ভালবাসা,—
ভালবাসে, কিন্তু দেছে বিসর্জন আশা!
স্বর্গীয় সে প্রেম। তার তুলনা কি হয়?
হেন প্রেমিকের স্পর্শে ধরা প্রেমময়!
কামের ছলনা কিবা পবিত্র প্রণয়,—
পরীক্ষা করিয়া তার লব পরিচয়।

[মুকুলমুঞ্জরা, ৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

২। ইমান বিনা প্রেমময় ধ্যানে,
প্রেম কেবা জানে, মোহপাত্র ভালবাসা
ভাণ! স্থিরচিত্তে হের, অন্তরে নেহার,
প্রেম নহে কামের বিকার;

[কালাপাহাড়, ৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক]

৩। মাধব : ধন, মান, জীবন, যৌবন—সমস্ত অর্পণ করলে তবে প্রেমলাভ হয়।

[বিষাদ, ৩য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

অনুরূপ বহু গিরিশসুভাষণ তাঁর নাটক থেকে উদ্ধৃত করা চলে। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত গিরিশচন্দ্রের প্রেমবোধকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অনেক উচ্চে স্থান দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের -"ভালবেসে সখী নিভৃত যতনে" সঙ্গীতটির সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের প্রেমবোধ তুলনা করে সমালোচক মন্তব্য করেছেন —"একি সেই প্রেম? গিরিশের প্রেম ইহাপেক্ষা অনেক উচ্চে, আরও মহৎ। রূপ রস-গন্ধ-স্পর্শ হইতে ইহা উদ্ভূত হইলেও ক্রমে গিয়া একেবারে প্রেমের রাজ্যে উপস্থিত হয়, মানুষের সুখদুঃখ হইতে একেবারে ভাগবত সত্যে গিয়া পরিণত হয়।"[১৫] অর্থাৎ সমালোচকের মতে শ্রেষ্ঠ প্রেমবোধ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বিশ্লেষিত শুদ্ধ ভক্তির সঙ্গে জড়িত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যখন লেখেন—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।

কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য মাত্র প্রেম ও প্রবল॥
···সর্বত্যাগ করয়ে করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥ ইত্যাদি—

তখন তাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্ব প্রকাশিত হয় মাত্র, পৃথিবীর সর্ববিধ রোমান্টিক সাহিত্যবিচারে এ সংজ্ঞা নিশ্চয়ই প্রয়োগ করা চলে না। অথচ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাই করেছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন—"প্রেমের লক্ষ্য রক্তমাংসময়ই হউক আর চিন্ময় ভগবানই হউন প্রেমধারা পতিতপাবনী, নিত্যশুদ্ধা। যিনি ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, পরিত্যাগ করিয়া একমনে প্রেমিকের দিকে প্রধাবিত হন, তিনি প্রকৃত প্রেমের সন্ধান পান, প্রেমে তাঁহার সমস্ত মলিনতা ভাসিয়া যায়। এই অনন্যশরণ প্রেমিকের প্রাণই রক্তমাংস হইতে ক্রমে চিন্ময়ে পৌঁছায়। এবম্বিধ স্বার্থশূন্য প্রেম--যাহাতে ক্রমে ভগবদ্দর্শন লাভ হয় সেই প্রেমই শ্রেষ্ঠ প্রেম।"[১৬] সমালোচকের মতে একম্বিধ প্রেম গিরিশ-চন্দ্রের সাহিত্যে প্রকাশিত। "মহাকবি গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন নরনারীর রূপরসজনিত অন্ধকার গণ্ডীতে যে অয়স্কান্তমণি আবরিত, সেই প্রেমরত্নই দেহসম্বন্ধ ঘুচাইয়া অন্তরের ধ্যানে তাহাকে জ্যোতিষ্মান করে, বিশ্বকে প্রেমময় করিয়া তোলে। নদী যেমন মহাসিন্ধুতে বিলয় পায়, নিঃস্বার্থ প্রেমও ক্রমে ভগবত প্রেমে রূপান্তরিত হয়। এই চরমাবস্থায়ই বন্ধনমুক্তি বা নির্বাণ।"[১৭] হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের এই প্রেমতত্ত্ব বিশ্লেষণ ভাগবতপ্রেম সম্পর্কে সঠিক হতে পারে, রোমান্টিক প্রেম সম্পর্কে কখনো নয়। কেননা রোমান্টিক প্রেমে প্রচণ্ড রূপমুগ্ধতার ও সৌন্দর্যপ্রীতি প্রকাশিত, তা আসক্তি বা আবেগ ব্যতিরিক্ত হতে পারে না। এমন কি, বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ কবিতাতেও এই passion-মিশ্রিত সৌন্দর্যচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। বিদ্যাপতির 'জনম অবধি হম রূপনহারলুঁ' যখন 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ'তে পরিব্যাপ্ত হয়েছে তখন সবকিছু অতিক্রম করে এক প্রগাঢ় আসক্তি (passion) বিশিষ্ট সৌন্দর্যচেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। চণ্ডীদাসের 'চলে নীল সাড়ি নিঙারি নিঙারি' পদটির প্রতিও একই বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করা চলে। আসক্তি ও সৌন্দর্য-চেতনাবিহীন প্রেম ঈশ্বরের মহাত্ম্য প্রকাশক নামগান হতে পারে, কিন্তু তাকে রোমান্টিক সাহিত্য বলা চলে কিনা সন্দেহ।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে প্রেমের একটি idealized রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি বটে কিন্তু তা নিতান্তই ব্যবহারিক আদর্শবোধের অভিব্যক্তি। তা বিশিষ্ট সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, জাগতিক পাপপুণ্যবোধের সঙ্গে জড়িত। ফলে তাঁর নাটকে প্রকাশিত প্রেমতত্ত্ব সম্পর্কিত চিন্তাগুলো অধিকাংশ স্থলেই আপ্তবাক্য হয়ে উঠেছে। চরিত্রের মর্মস্থল থেকে উৎসারিত স্বাভাবিক উক্তিতে সেগুলো সঙ্গত হয়ে ওঠেনি। পূর্বে উদ্ধৃত

স্বামী অচ্যুতানন্দের সংলাপটি অনায়াসে কালাপাহাড়ের ইমানে প্রক্ষেপ করা চলে এবং ইমানের সংলাপও অনুরূপভাবে অচ্যুতানন্দ অক্লেশে বলে দিতে পারে।

গিরিশচন্দ্র ব্যতীত সাধারণ রঙ্গালয়-আশ্রিত অপর নাট্যকারেরা রোমান্টিক কমেডি নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত হননি। পূর্বে বলা হয়েছে দ্বিজেন্দ্রলাল মাত্র একটি রোমান্টিক কমেডি লিখেছিলেন। নাটকটির নাম 'চন্দ্রগুপ্ত'। কিন্তু জাতিবিচারে 'চন্দ্রগুপ্ত'কে রোমান্টিক কমেডি হিসেবে চিহ্নিত করলেও তার মুখ্য অবলম্বন প্রেম নয়। নন্দবংশ ধ্বংস করে চন্দ্রগুপ্তের মৌর্যবংশ স্থাপন এবং চাণক্যচরিত্রের নাটকীয়তার পাশে চন্দ্রগুপ্তের প্রতি ছায়ার প্রণয়কাহিনী শীর্ণ হয়ে গেছে, নাট্যকার তাতে সমর্পিত প্রেমের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও তা কখনোই নাটকে প্রধান বিষয় হয়ে দেখা দিতে পারে নি। তাই সৌন্দর্যচেতনার কোনো idealized রূপায়ণ সেখানে সম্ভব হয়নি। আর, চন্দ্রগুপ্ত ও হেলেনের সম্পর্ক রাজনীতির ফসল—বরং বলা যেতে পারে—নাট্যকারের বিশ্বপ্রেমনীতি সম্পর্কিত তত্ত্বচিন্তার প্রকাশ, তাতে মানবিক বৃত্তিসমূহ অপুষ্ট থেকে গেছে এবং প্রেম নিঃসন্দেহে একটি মানবিক বৃত্তি। অতএব রোমান্টিক কমেডি হিসেবে চন্দ্রগুপ্ত কতটা সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছে তা সন্দেহের বিষয়।

আসলে মধুসূদনের পরবর্তী বাঙালী নাট্যকারদের প্রেমচেতনা না ছিলো সঠিক অর্থে রোমান্টিক, সৌন্দর্য চেতনাতেও ছিলো না কোনো idealized form এবং সর্বোপরি আসক্তি বা passion ছিলো অনায়ত্ত। ফলে রোমান্টিক কমেডি সার্থকতা অর্জন করতে তাঁদের প্রায়শই ভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে।

মধুসূদন ও গিরিশচন্দ্রের মধ্যবর্তী পর্বের দু'টি বাঙলা রোমান্টিক কমেডি বিশ্লেষণ করে আমাদের প্রতিপাদ্য উপস্থিত করা যেতে পারে। নাটক দু'টি যথাক্রমে 'কুসুমে কীট নাটক'—লেখক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী'—লেখক উপেন্দ্রনাথ দাস। উভয়ের প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথম নাটকটি কোনো-দিন পাদপ্রদীপের আলো স্পর্শলাভে সমর্থ হয় নি, দ্বিতীয় নাটকটি বাঙলা রঙ্গমঞ্চে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলো। দর্শক প্রশংসা লাভে একের সার্থকতা ও অপরের ব্যর্থতা গভীর অর্থবহ।

দু'টো নাটকের কাহিনীর মূল ছক প্রায় একপ্রকার, সুরেন্দ্র ও বিনোদিনী এবং জিতেন্দ্র ও নলিনী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত। উভয়ক্ষেত্রেই নায়ক সচ্চরিত্র, বিদ্বান ও অর্থবান এবং নায়িকা সরলা মুগ্ধা ও সমর্পিতপ্রাণা। বিপরীত বৃত্তিসমূহের আলো-আঁধারি সকল চরিত্রেই অনুপস্থিত। উভয় ক্ষেত্রে প্রেমের বাধাহিসেবে দেখা দিয়েছে তৃতীয় ব্যক্তির অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ। সুরেন্দ্র বিনোদিনীতে ম্যাক্রেণ্ডেল সাহেবের লোভ ও হরিপ্রিয়ের নির্মম কৌতুক নাটকে বিরোধী শক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছে। 'কুসুমে কীট' নাটকে নলিনীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী বিনোদের আবির্ভাবে সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে। প্রথম নাটকটিতে ম্যাক্রেণ্ডেলের মৃত্যু ও হরিপ্রিয়ের ত্রুটিবিমোচনে নায়ক নায়িকার মিলন সম্ভব

হয়েছে; দ্বিতীয়টিতে বিনোদের মানস পরিবর্তন ও অনুশোচনার পটভূমিতে জিতেন্দ্র-নলিনীর মিলন সম্পন্ন হয়েছে। দু'টি নাটকেরই শেষদৃশ্যে দু'জোড়া বিবাহ নিষ্পন্ন হয়েছে।

উভয় নাটকে উপস্থাপিত প্রণয়তত্ত্ব ও সংলাপের রীতিতে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য রয়েছে। উদ্ধৃতি :

১ [পত্রহস্তে বিনোদিনীর প্রবেশ]

বিনোদিনী : (সাশ্রু নয়নে) শেষে কি এই হল ? স্বেচ্ছাচারিণী ও স্বেচ্ছাগামিনী! নিষ্ঠুর সুরেন, তুমি কোন্ প্রাণে আমাকে এমন কথা বললে ? (অশ্রুত্যাগ) সুরেন্দ্র, তুমি ছাড়া আমি আর কাকেও জানি না, তুমিই আমার হৃদয়েশ্বর, আমার প্রণয়ের একমাত্র দেবতা—তোমার জন্য আমি আত্মীয়, বন্ধু, ধন, ঐশ্বর্য—সমস্ত জগৎ ত্যাগ করতে পারি, তুমি আমাকে এমন নির্দয় কথা বললে ? (অশ্রুত্যাগ) সুরেন, তোমাকে আমি এত ভালোবাসি, একবার আমার মুখ দেখলে তোমার অন্তঃকরণ আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়, তুমি আমাকে স্বেচ্ছাচারিণী বললে ? (অশ্রুবর্জন)

[সুরেন্দ্র-বিনোদিনী ৩য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

২ [পত্রহস্তে নলিনীর প্রবেশ]

নলিনী : এঁ্যা! একি ? আমি যার জন্য কেঁদে পাগল আমার সেই প্রাণনাথ আমাকে এই পত্র লিখেছেন ? (রোদন) হা নাথ! হা প্রাণপতি! হা জীবিতেশ্বর! অভাগিনী নলিনীর অদৃষ্টে কি এই ছিলো ?...একবার এসে খড়্গাঘাতের দ্বারা নলিনীর হৃদয় দ্বিধাচ্ছেদ কর—তা হলেই দেখতে পাবে যে নলিনীর হৃদয়ে শত শত সহস্র সহস্র তোমার নিজের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত রয়েছে কিনা!...নাথ! আমি ত নিজে কুহকিনী নয়—বস্তুতঃ তোমারই প্রণয়কুহকে মুগ্ধ—তোমারই কুহকজালে আবদ্ধ।...এ যন্ত্রণা অপেক্ষা মৃত্যুও যে আমার পক্ষে সহস্রগুণে ভালো ছিল। নাথ! তোমাকে দেখতে দেখতে তোমার হাতে মৃত্যু যে নলিনীর পক্ষে স্বর্গারোহণ তুল্য।...নাথ! একবার এস—এসে নলিনীকে স্বহস্তে বধ কর—ভয় নাই, এ প্রাণ তোমারই / তুমিই দিয়েছিলে, আবার তুমিই নাও। এস—এস—শিগ্যির এস—(পতন ও মূর্চ্ছা)।

[কুসুমে কীট : ২য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক]

অংশ দু'টিতে যে কেবলমাত্র পরিস্থিতির মিল তাই নয়, উভয় নায়িকার অনুভাবেও গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। বরং বলা যায়, প্রথমটিতে বিনোদিনীর প্রণয় প্রকাশে প্রথাগত যান্ত্রিকতা প্রস্ফুটিত, সে তুলনায় নলিনীর আর্ত হাহাকার কিছু passion মিশ্রিত হয়ে গভীরতা স্পর্শ করেছে। এরূপ সাদৃশ্য উভয় নাটকের অনেকস্থলে বিদ্যমান।

অপরপক্ষে, সুরেন্দ্র বিনোদিনীতে ম্যাক্রেণ্ডেল বিষয়ক ঘটনাবলী নাটকে প্রক্ষিপ্ত,

মূল ক্রিয়ার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। উক্ত ঘটনাবলীর নিঃসংশয় বিলোপ নাটকের মূল প্রতিপাদ্যতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। কিন্তু 'কুসুমেকীট' নাটকে বিরোধী শক্তি হিসেবে বিনোদের অবস্থিতি স্বাভাবিক না হলেও অসঙ্গত নয়। এবং সাহিত্য হিসেবে উভয়নাটকের সার্থকতা প্রায় তুল্যমূল্য।

অথচ, 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' বঙ্গীয় নাট্যমোদীর কাছে অত্যন্ত পরিচিত নাম, এবং 'কুসুমেকীট' নাটক তার বিপরীত। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলো। নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন (Dramatic Performance Act) প্রবর্তনে এ নাটকটির অবদান প্রভূত।

'সুরেন্দ্র বিনোদিনীর' এই জনপ্রিয়তা অর্জন ও ইতিহাস সৃষ্টির মূলে কিন্তু নাটকে অপ্রয়োজনীয় ম্যাক্রেণ্ডেল কাহিনী জড়িত। নাটকটির নামপত্রে উদ্ধৃত রয়েছে—

'চাহি না স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন,
মুহূর্তেক যদি পাই স্বাধীন জীবন।'

এবং

"পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে, সহি কিসে মাতৃ দুঃখ ?" স্পষ্টতঃই বোঝা যায় নাটকে বর্ণিত মূল সমস্যার সঙ্গে উদ্ধৃত অংশের জৈবযোগ নেই। সমকালীন দেশপ্রেমের ভাব প্রাবল্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাট্যকার সাধারণ একটি প্রণয় কাহিনীর মধ্যে উক্ত তাৎপর্য আরোপ করতে আগ্রহী হয়েছেন। তারই সূত্র ধরে এসেছে ম্যাক্রেণ্ডেল কাহিনী এবং ম্যাক্রেণ্ডেল নিধন মঞ্চে উপস্থাপিত দেখেই সন্ত্রস্ত বৃটিশ সরকার আইন প্রণয়নে ব্যস্ত হয়েছিলো।

অর্থাৎ নাটকটির গুরুত্ব অর্জন করেছে তার রসপ্রতীতিতে নয়, তার জাতিবিচারেও নয়, নাটকে প্রক্ষিপ্ত দেশপ্রেম বিষয়ক ঘটনা মিশ্রণের ফলে। বাঙলা রোমান্টিক কমেডি রচনার সার্থকতা ও ব্যর্থতা মূলত এই রীতি অনুসরণের দক্ষতার উপর নির্ভর করেছে।

রোমান্টিক কমেডি রচনায় গিরিশচন্দ্র এই রীতি অবলম্বন করেন নি। 'ভ্রান্তি' নাটকে* অবশ্য যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ঘটনার ঘনঘটা যথেষ্টই আছে, কিন্তু দেশপ্রেম নেই। মুকুলমুঞ্জরা'য় তো দেশপ্রেম একেবারেই অনুপস্থিত। একারণেই কি গিরিশচন্দ্রের

---

*ভ্রান্তি নাটকটিকে ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য বিয়োগান্ত বা ট্র্যাজেডি বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু তা সঠিক বলে মনে হয় না। বরং সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় একে বিষাদপূর্ণ মিলনান্ত (Tragi-Comedy) নাটক বলেছেন তা অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়। "যদিও নিরঞ্জন-পুরঞ্জন বা ললিতা মাধুরীর পুর্ণমিলনে নাটকটিকে মিলনান্তরূপ (Comedy) গ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি তাহাদের দুর্দশার স্মৃতি দর্শক বা পাঠকের মনে এরূপ বেদনার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল এগুলি ভুলিয়া গিয়া এটিকে খাঁটি মিলনান্ত নাটক বলিতে স্বভাবত কুণ্ঠা হইতেছে।" (সত্যজীবন)

এই শ্রেণীর নাটকগুলো তাঁর পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটকের তুলনায় হীনপ্রভ? অবশ্য 'ভ্রান্তি' নাটকটি সমকালে খ্যাতি অর্জন করেছিলো, কিন্তু সে তার রসপ্রতীতির জন্য নয়, রঙ্গলাল চরিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়াপাত ও উক্ত চরিত্রে নাট্যকারের অনবদ্য অভিনয়ের জন্য। পণ্ডিতবর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের উক্ত নাটক সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত মন্তব্য তাই প্রমাণ করে।[১৮]

দ্বিজেন্দ্রলাল একটি মাত্র রোমান্টিক কমেডি লিখেছিলেন—'চন্দ্রগুপ্ত'—সেখানেও তিনি দেশপ্রেমকে অন্যতম প্রধানস্থান দিয়েছিলেন। সম্ভবত এ বিষয়ে পূর্ববর্তী নাট্যকারদের অভিজ্ঞতা তাঁকে অনুরূপভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলো।

আট

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা নাটকটিকে বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কমেডি বলে অভিহিত করা যেতে পারে। প্রেমের বিস্ময়, রূপমুগ্ধতা ও কল্পনার প্রগাঢ়তা নাটকটিকে অনন্ত সুষমায় মণ্ডিত করেছে। বিশেষত সৌন্দর্যের idealized form—যা রোমান্টিক কমেডির মূলবৈশিষ্ট্য এবং যা এই শ্রেণীর বাঙলা নাটকের অন্যত্র অপ্রাপ্য—তার অপূর্ব রূপায়ণ অক্লেশে দর্শকচিত্তকে অধিকার করে। অর্জুনের উক্তি—

কাহারে হেরিনু? সে কি সত্য, কিম্বা মায়া?
…হেনকালে ঘনতরু অন্ধকার হতে
ধীরে ধীরে বাহিরিয়া, কে আসি দাঁড়াল
সরোবর সোপানের শ্বেত শিলাপটে।
কি অপূর্ব রূপ! কোমল চরণতলে
ধরাতল কেমনে নিশ্চল হয়ে ছিল।
ঊষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব পর্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি বিকাশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে। নামি ধীরে সরোবরতীরে
কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া,
উঠিল চমকি। ক্ষণপরে মৃদুহাসি
হেলাইয়া বাম বাহুখানি, হেলাভরে
এলাইয়া দিল কেশপাশ; মুক্তকেশ
পড়িল বিহ্বল হয়ে চরণের কাছে

অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন
অনিন্দিত বাহুখানি—পরশের রসে
কোমল কাতর, প্রেমের করুণামাখা।
নিরখিলা নত করি শির, পরিস্ফুট
দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ।
দেখিলা চাহিয়া নব গৌরতনুতলে
আরক্তিম আলজ্জ আভাস, সরোবরে
পা দুখানি ডুবাইয়া দেখিলা আপন
চরণের আভা। বিস্ময়ের নাই সীমা।
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরক বয়স
যাপিল নয়ন মুদি, যেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেইদিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবর জলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে। ক্ষণপরে,
কী জানি কী দুখে, হাসি মিলাইল মুখে।
ম্লান হল দুটি আঁখি, বাঁধিয়া তুলিল
কেশপাশ ; অঞ্চলে ঢাকিল দেহখানি,
নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চলে গেল,
সোনার সায়াহ্ন যথা ম্লান মুখ করি
আঁধার রজনীপানে ধায় মৃদুপদে। [দ্বিতীয় দৃশ্য]

এ সেই সৌন্দর্য যার কাছে মুগ্ধ মনাসজ একদিন পুষ্পধনু সমর্পণ করেছিলো। এ সৌন্দর্যকেই নাট্যকার মার্লো অমর করেছেন নিম্নোদ্ধৃত সংলাপের মাধ্যমে—

Was this the face that launcht a thousand shippes ?
And burnt the toplesse Towers of Ilium ?
Sweet Helen, make me immortall with a kisse :
Her lips suckes forth my soule, see where it flies :
Come Helen, Come give mee my soule againe.

(The Tragical History of Doctor Faustus
Lines : 1328-1332)

অথবা, চিত্রাঙ্গদার উক্তি :

যেন আমি রাজকন্যা নহি ; যেন মোর
নাই পূর্বাপর ; যেন আমি ধরাতলে
একদিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের
পিতৃমাতৃহীন ফুল ; শুধু একবেলা
পরমায়ু, তারি মাঝে শুনে নিতে হবে
ভ্রমরগুঞ্জনগীতি, বনবনান্তের
আনন্দমর্মর ; পরে নীলাম্বর হতে
ধীরে নামাইয়া আঁখি, নুয়াইয়া গ্রীবা,
টুটিয়া লুটিয়া যাব বায়ুস্পর্শভরে
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুমকাহিনীখানি আদি অন্তহারা। [তৃতীয় দৃশ্য]

এ সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে তুলনীয় শেলীর 'She dwells in beauty, beauty that must die। চিত্রাঙ্গদায় প্রকাশিত ইন্দ্রিয়সচেতন (Sensuous) সৌন্দর্যবোধ বিবর্তনের [illegible]ন্দ্রিয়াতিরিক্ত প্রেমসৌন্দর্যলাভ করেছে এবং তার সঙ্গে মিশে গিয়েছে এক অপরূপ কল্যাণ মাধুর্য। এই বিবর্তন ঘটেছে অনিবার্য নাটকীয় সংঘাতের পরিণতিতে। নাটকের শেষদৃশ্যে চিত্রাঙ্গদা যখন বলে—

'আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমনী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়। গর্ভে
আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীর শিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে,
তখন জানিবে মোরে, প্রিয়তমে।—

তখন অনিবার্যভাবে নরনারীর প্রেমের সকল সৌন্দর্য ও সার্থকতা মূর্ত হয়ে ওঠে। এবং সেইসঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয়াশ্রয়ী রোমান্টিক কমেডির তুলনায় 'চিত্রাঙ্গদায়' প্রকাশিত প্রেমবোধ ও সৌন্দর্যচেতনার একটি মাত্রাগত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ এ শ্রেণীর নাটক আর পরবর্তীকালে লেখেন নি। সম্ভবত প্রেমের স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে তিনি সমকালের মধ্যে সমর্থন পাননি কিংবা তাঁর লক্ষ্য ক্রমে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে সমষ্টিমনস্কতায় প্রধাবিত হয়েছিলো যেখানে শেকসপীয়রের কমেডির মতো অবশ্যই পৃথক পদ্ধতিতে—রবীন্দ্রনাথেরও intent was to present a picture of harmonions society in which each persons individuality is fully developed and yet is in perfect tune with all the others.[১৯]

নয়

বাঙলা রোমান্টিক কমেডি সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করা হলো, বাঙলা মিউজিক্যাল কমেডি বা মিলনান্ত গীতিনাট্যের প্রতিও সাধারণভাবে তা প্রয়োগ করা চলে। বাঙলাদেশে প্রচলিত যাত্রায় গানের আধিক্য বরাবরই বিদ্যমান, তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মনোমোহন বসু 'গীতাভিনয়' নামে নতুন একশ্রেণীর নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাকে ঠিক গীতিনাট্য বলা চলে না। বাঙলা গীতিনাট্য রচনায় প্রত্যক্ষতঃ পাশ্চাত্য অপেরাই প্রভাব বিস্তার করেছে। কোলকাতায় অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে যে সকল মঞ্চে ইংরেজী নাটক অভিনীত হতো, সেখানে অপেরাও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলো। বাঙালী নাট্যকারগণ তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম যৌবনে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ইংরেজী অপেরা দেখে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন তার প্রমাণ তাঁদের জীবনীতে রয়েছে।

বাঙলা সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম প্রযোজিত গীতিনাট্য—যতদূর জানা যায়—'নন্দনকানন', ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিলো। নাট্যকার হিসেবে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর শিষ্য প্রখ্যাত অভিনেতা অতুলচন্দ্র মিত্র কিছু গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল' প্রবর্তিত হলে বাঙালী নাট্যকারদের কতকগুলো অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। তাঁরা এমন নাট্যরচনায় ব্রতী হলেন যাতে রাজরোষ বরনের বিপদ দূরীভূত হয়। তাই তাঁরা গীতিনাট্য রচনা ও প্রযোজনার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। কেননা সেকালীন প্রখ্যাত নাট্যকারদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষভাবে মঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাই ব্যবসার ক্ষতি স্বীকার করে নাট্যরচনা তখন সম্ভব ছিলো না। গীতিনাট্য তাঁদের সে সমস্যা অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে। উপরন্তু গাতিনাট্যের জনপ্রিয়তা দ্রুত

বর্ধিত হয়েছে। প্রাপ্ত হিসেবে দেখা যায়, বাঙলা মঞ্চ গীতিনাট্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেছে তুলনামূলকভাবে বেশি। "ক্ষীরোদপ্রসাদের আলিবাবা পড়িতেই থিয়েটারে প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। ২০০'০০ হইতে ১২০০'০০—১৫০০'০০ টাকায় গিয়া দাঁড়াইল।"[২০] "অতুলমিত্র মহাশয়ের হিন্দাহাফেজ, তুফানী ও লুলিয়া প্রভৃতিতেও যথেষ্ট অর্থাগম হইত। হিন্দাহাফেজ্ ও তুফানীর প্রথম রাত্রেই বিক্রী হয় ১২২৮'০০। হাজারের কম বড় হইত না"..[২১] অতুল মিত্রের অপর গীতিনাট্য 'হিরন্ময়ী'র অভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৫০০০'০০ টাকার বেশি লাভ করেছিলেন।[২২]

মিউজিক্যাল কমেডি বা মিলনান্ত গীতিনাট্যের রস প্রকাশ সম্পর্কে সাধারণভাবে রোমান্টিক কমেডির সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা চলে। সাধারণ মঞ্চাশ্রিত গীতিনাট্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করেছিলো যথাক্রমে—গিরিশচন্দ্রের 'আবুহোসেন', 'আলাদীন', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা', 'কিন্নরী', অতুলচন্দ্র মিত্রের 'হিন্দাহাফেজ', 'তুফানী', 'শিরিফরহাদ', 'হিরন্ময়ী' এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'শ্রীকৃষ্ণ', 'দুটি প্রাণ' ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, যে সকল গীতিনাট্য জনোমনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছিলো সেগুলো প্রধানতঃ আরব্য উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। যেখানে তা নয় সেখানেও আরব্যরজনীর বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়েছিলো এবং সে বৈশিষ্ট্যও নাট্যকারের বিশেষ প্রবণতাদ্বারা অনুরঞ্জিত। আরব্যরজনী ব্যতীত অপর যে বিষয় নাট্যকারদের প্রিয় ছিলো তা হলো রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কাহিনী। অমরেন্দ্রনাথের 'দুটি প্রাণ' গীতিনাট্যটি বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

মূলত মুক্তপ্রেম এবং কখনো কখনো অবৈধ প্রণয় এ গীতিনাট্যগুলোর প্রধান অবলম্বন। কিন্তু আরব্যরজনীর কাহিনীতে যে কল্পনার উল্লাস, প্রেমের গভীরতা ও কাব্যের আধিপত্য রয়েছে বাঙালী নাট্যকারগণ তাকে এড়িয়ে শুধুমাত্র অর্থহীন ও অবাস্তব পরিস্থিতি নির্মান এবং উৎকেন্দ্রিক কাল্পনিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রকাশিত প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন—"ইহাতে যে আত্মবিস্মৃতি, নিন্দা ভয় লজ্জা শাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য, কঠিন কুলাচার লোকাচারের প্রতি অচেতনতা প্রকাশ পায় তদ্দ্বারা প্রেমের প্রচণ্ড বল, দুর্বোধ্য রহস্য, তাহার বন্ধনবিহীনতা, সমাজ-সংসার স্থান-কাল-পাত্র এবং যুক্তিতর্ক-কার্য-কারণের অতীত একটা বিরাটভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই কারণে যাহা বিশ্বসমাজে সর্বত্রই একবাক্যে নিন্দিত সেই অভ্রভেদী কলঙ্কচূড়ার উপরে বৈষ্ণবকবিগণ তাঁহাদের বর্ণিত প্রেমকে স্থাপন করিয়া তাহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন।"[২৩] বলা বাহুল্য রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত গীতিনাট্যগুলোতে এরূপ গভীর প্রেমতত্ত্ব অনুপস্থিত।

অমরেন্দ্রনাথ রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ' ও বিদ্যাসুন্দর কাহিনী আশ্রিত 'দুটি প্রাণ' গীতিনাট্যের রসপ্রতীতি সমশ্রেণীক। সেখানে প্রেমের প্রচণ্ড বল, দুর্বোধ রহস্য, বন্ধনবিহীনতা ও বিরাট ভাব নাট্যকারের অন্বিষ্ট ছিলো না। বরং অবৈধ প্রণয়ের প্রতি সাধারণের যে ঔৎসুক্য, নাট্যকার তাকেই মূলধন করেছেন। অর্থাৎ লৌকিক কেচ্ছা থেকে এই গীতিনাট্যগুলোর জগৎ দূরবর্তী নয়। প্রেমের কোনো idealized form তাই এসকল নাটকে প্রকাশিত হতে পারে নি। পক্ষান্তরে 'নলিনী' বা 'মায়ারখেলা' প্রভৃতি গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের একটি idealized form-কেই রূপায়িত করার আগ্রহী। তাই রুচিশুভ্র সুরমাধুর্য রবীন্দ্র গীতিনাট্যকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। ভাব ও ভাষায় যে বিশেষ রবীন্দ্রিক দ্যোতনা রসিকচিত্তকে আকৃষ্ট করে রবীন্দ্রগীতিনাট্যে তারই সার্থক স্ফূরণ সম্ভব হয়েছিলো।

সাধারণ মঞ্চাশ্রিত গীতিনাট্যে বিশেষতঃ 'আবু হোসেন', 'আলাদীন' বা 'আলিবাবা য় একটি উচ্চকণ্ঠ হাস্যময়তা লক্ষ্য করা যায়। চটুল সংলাপ, লঘু সুর ও উচ্ছ্বসিত কৌতুক এগুলোকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে জানা যায় 'আলাদীন' গীতিনাট্যে আলাদীন যখন

কার তোয়াক্কা রাখি আর
বাপ মরেছে, বালাই গেছে
কোন্ শালার বা ধারি ধার"—

বলে মঞ্চে আবির্ভূত হতো দর্শকদের মধ্যে শিহরণ বয়ে যেতো। আলিবাবা গীতিনাট্যেও মর্জিনা ও আবদালার দ্বৈত নৃত্যগীত দর্শককে আনন্দ বিহ্বল করে দিতো। প্রথম দৃশ্যেই মর্জিনার গীত—"ছি ছি এত্তা জঞ্জাল" এককালে গণসঙ্গীতে পরিণত হয়েছিলো। কিংবা প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আবদালা ও মর্জিনার গান—

আয় বাদী তুই বেগম হবি
খোয়াব দেখেছি—
আমি বাদশা বনেছি।
বেশ হয়েছে আয় তবে তোর
ল্যাজটা ছেঁটে দি।...
বাদশ বেগম ঝমঝমাঝম
বাজিয়ে চলেছি।—

দর্শক চিত্তকে উৎফুল্ল করে তুলতো কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্র গীতিনাট্যে এই উচ্চকণ্ঠ হাস্যময়তা, লঘু চাপল্য বা কৌতুক-প্রবণতা অনুপস্থিত। রবীন্দ্রগীতিনাট্য তুলনায় সংযত, গম্ভীর, বিষাদপূর্ণ ও অত্যন্ত লিরিক্যাল। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা' মিলনান্ত হলেও তার মধ্যে বিষাদময়তা ও করুণভাব প্রধান স্থান অধিকার করে আছে।

সাধারণ মঞ্চাশ্রিত মিলনান্ত গীতিনাট্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য যা রবীন্দ্র গীতিনাট্যে বিশেষ নেই—তার ক্রিয়াপ্রাণতা। এই গীতিনাট্যগুলো প্রায় প্রহসনের প্রান্ত ছুঁয়ে গেছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই পরিস্থিতি রচনার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে অধিক। কিন্তু গিরিশচন্দ্র থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদ, অতুলচন্দ্র মিত্র কিম্বা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিস্থিতি রচনায় মনোযোগী থেকে প্লট'বন্যাস পাশ কাটিয়ে গেছেন এবং এই প্লটের অভাবকে তাঁরা পূরণ করেছেন উত্তেজনাকর ক্রিয়ার বাহুল্য ঘটিয়ে। ক্ষীরোদ-প্রসাদের বিখ্যাত 'আলিবাবা' গীতিনাট্যটির কথাই ধরা যাক। আরব্যোপন্যাসের আলিবাবা ও চল্লিশ চোরের শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনা প্রবাহ এখানে প্রায় অনুপস্থিত, শুধু গল্পের কাঠামো (outline)-টিকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাঁর মধ্যেও মাত্র কয়েকটি পরিস্থিতি নির্বাচন করে নাট্যকার কতগুলো বর্ণময় মুহূর্ত উপহার দিতে-চেয়েছেন। ফলে, স্বভাবতই মর্জিনা-আবদাল্লা অংশ প্রাধান্য পেয়েছে। নাট্যকার যে সামান্য কয়েকটি পরিস্থিতি অবলম্বন করেছেন, সেখানেই দ্রুত ক্রিয়া ঘটিয়ে দর্শকদের উত্তেজনা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়েছেন।

রবীন্দ্রগীতিনাট্যে, পক্ষান্তরে, উত্তেজনাপূর্ণ ক্রিয়া তো বটেই, এমন কি সাধারণভাবে ক্রিয়াকেও অবহেলা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যেও প্লট বিন্যাসের প্রতি উদাসীনতা রয়েছে এবং সেখানে ক্রিয়ার পরিবর্তে কিছু অবিস্মরণীয় মুহূর্ত সুরে ব্যক্ত হয়েছে।

গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নাট্যকারদের গীতিনাট্যে ক্রিয়া প্রাধান্য নাটককে সংলাপ বহুল করে তুলেছে। গিরিশচন্দ্র তাঁর নাট্যজীবনের প্রারম্ভে যে সকল গীতিনাট্য —দোললীলা (১৮৭৭), ব্রজবিহার (১৮৮১) প্রভৃতি—রচনা করেছিলেন, তাতে গদ্য বা ছন্দ সংলাপ ছিলো অনুপস্থিত, গীতিনাট্যের সকল চরিত্রই গানের মাধ্যমে সংলাপ ব্যবহার করেছে। কিন্তু এ সকল গীতিনাট্য সম্ভবত দর্শক প্রশংসাধন্য হয় নি। তাই নাট্যক্রিয়ার প্রতি নাট্যকার মনোযোগী হয়েছেন অধিক। ফলে গীতসংলাপ পরিত্যক্ত হয়েছে, গদ্য সংলাপ প্রাধান্য পেয়েছে। গানগুলো এই নাট্যক্রিয়ার পরিপূরক হয়ে দেখা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু গীতিনাট্যে গদ্যসংলাপ ব্যবহার করেন নি, এমন কি ছন্দসংলাপও তাঁর গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হয়েছে খুবই কম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে গীতিনাট্যের প্রচলন করেছিলেন, তা পুরোটাই সুরে গেয়। রবীন্দ্রনাথ সেই ঐতিহ্যই গ্রহণ করেছিলেন। ক্রিয়া ও সংলাপের অপ্রতুলতা তিনি পূরণ করেছিলেন আঙ্গিক অভিনয়ের মাধ্যমে। এবং সে আঙ্গিক অভিনয়ও নৃত্যছন্দের অনুগামী। রবীন্দ্রনাথ প্রযোজিত 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় প্রসঙ্গ এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। এই নৃত্যছন্দের মাধ্যমে রবীন্দ্রগীতিনাট্য বিবর্তনের পথে নৃত্যনাট্যে পরিণতি লাভ করেছিলো।

সাধারণ মঞ্চাশ্রিত গীতিনাট্য ও রবীন্দ্রগীতিনাট্য—এই উভয় ধারার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল গীতিনাট্য বা অপেরা রচনাতে উদ্যোগী হন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সোরাব রুস্তম' রচনার কারণ ব্যাখ্যা করে নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখেছেন—"একদিন মিনার্ভা থিয়েটারের হিন্দু-হাফেজ* নামক অপেরা দেখিতে গিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ও তদীয় বন্ধুবর্গ সেই অপেরার কুরুচি দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। তৎকালে মিনার্ভা থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী নাট্যরসিক ৺মহেন্দ্রকুমার মিত্র এম. এ., মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলে, দ্বিজেন্দ্রের বন্ধুগণ তাহাকে বলেন, এমন অশ্লীল অপেরা আপনারা অভিনয় করেন কেন। তদুত্তরে মহেন্দ্রবাবু বলেন যে, থিয়েটারের দর্শকগণ এরূপ না হইলে নেয় না। তাহাতে দ্বিজেন্দ্রের বন্ধুগণ প্রত্যুত্তর দেন 'আপনারা যেমন দেবেন তাহারা তেমনি নেবে।' তাহাতে মহেন্দ্রবাবু দ্বিজেন্দ্রর বন্ধু শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে বলেন, 'তাহলে রায়সাহেবকে একখানা সুরুচিসঙ্গত অপেরা লিখিতে বলুন না।' 'অধরবাবু দ্বিজেন্দ্রলালকে সেই কথা বলিলে তিনি বলেন 'হইতে পারে ম্যাথ্যু আর্নল্ডের 'সোরাব রুস্তম' হইতে একখানা অপেরা সহজেই লিখিয়া দিতে পারি—।"[২৪] দ্বিজেন্দ্রলালের একমাত্র গীতিনাট্য রচনার পূর্বকথা এই। 'সোরাব রুস্তমে'র ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—"এ পুস্তকখানি রচনা করার একটি উদ্দেশ্য আছে। কিছুদিন হইতে একটি কথা শুনিতে পাইতেছি যে, আমাদের দেশের রঙ্গালয়ের দর্শকবৃন্দ অশ্লীল 'হাবভাবসমন্বিত গ্রাম্য রসিকতা শুনিবার জন্যই রঙ্গালয়ে গিয়া থাকেন, এবং সুরুচিসঙ্গত নাটক বা নাটিকার সম্প্রতি আর আদর নাই। আমি একবার আমার সাধ্যমত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই যে সুরুচিসঙ্গত অপেরা এখন চলে কি না।"

দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, 'সোরাব রস্তম' অপেরা বা গীতিনাট্য হিসেবে বিশেষ সার্থকতা অর্জন করতে পারে নি। এ সম্পর্কে নবকৃষ্ণ ঘোষ যথার্থ মন্তব্যই করেছেন—"বস্তুত সোরাব রুস্তমের বিয়োগান্ত আখ্যান বস্তু নাটক রচনারই উপযুক্ত, নাট্যরঙ্গের নহে। কবি এই গ্রন্থের প্রথমাংশে হাস্যরসের ও নৃত্যগীতের অবতারণা করিবার সুযোগ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু পরে যখন সেই করুণ কাহিনীর আবর্তে আসিয়া পড়িয়াছেন, তখন আর রঙ্গরসের অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই—শেষে নাটকখানিকে চূড়ান্ত ট্র্যাজেডিভাবেই সমাপন করিয়াছেন।"[২৫] অর্থাৎ গীতিনাট্যটি রচনাকালে নাট্যকারের fixity of purpose বিনষ্ট হয়েছে, ফলে রসবিপর্যয় দেখা দিয়েছে। যাই হোক, দ্বিজেন্দ্রলাল মিউজিক্যাল কমেডি বা মিলনান্ত গীতিনাট্য রচনা করেন নি। তাই বক্ষ্যমান নিবন্ধে দ্বিজেন্দ্র আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। কেবলমাত্র দ্বিজেন্দ্রমানসের প্রবণতা দেখানোর জন্যই এখানে সামান্য আলোচনা করা হলো।

---

*গীতিনাট্যটির নাম হিন্দা-হাফেজ, লেখক অতুলচন্দ্র মিত্র। নবকৃষ্ণ সম্ভবত নাম ভুল করেছিলেন।

প্রহসন দিয়ে আধুনিক বাংলা নাট্যাভিনয় শুরু। প্রথম অভিনীত মৌলিক বাঙলা নাটক—কুলীন কুলসর্বস্ব—প্রহসন। প্রহসনই সম্ভবত বাঙলা নাট্যসাহিত্যের একমাত্র শ্রেণী যা প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের প্রতিভাস্পর্শ লাভ করেছে। প্রায় সৃষ্টিলগ্ন থেকেই বাঙলা প্রহসন প্রৌঢ়। উনিশ শতকের বিখ্যাত সমালোচক কালীপ্রসন্ন ঘোষ এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন "...আমাদের দেশে ভাল নাটক হয় নাই অথচ ভাল প্রহসন হইয়াছে। এরূপ প্রহসন অন্য কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ। কবি মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী, পদ্মাবতী, শর্মিষ্ঠা নাটকগণনায় কোথায় স্থান পায় তাহা নির্দেশ করাও কঠিন; কিন্তু দত্তকৃত 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক গ্রন্থদ্বয় প্রহসনের আদর্শ।"২৬ কাজেই যুগ পরিবেশ ও নাট্যকারদের মানসপ্রবণতা কতটা প্রহসনের অনুকূল ছিলো এবং তাতে কতটা সিদ্ধি অর্জিত হয়েছে তা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রহসনের অপ্রতুলতা ছিল না। আচার্য ভরত প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে প্রহসনের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট আছে। সেখানে চরিত্র ও পরিস্থিতির পার্থক্যে প্রহসনকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে—শুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ। সঙ্কীর্ণ প্রহসনের অন্যতম লক্ষণের মধ্যে "লোকোপচারযুক্তা যা বার্তা যশ্চ দম্ভসংযোগ" কে (বিংশ অধ্যায়, ১১০ শ্লোক) নির্দেশ করা হয়েছে। 'সাহিত্য দর্পণে'ও বলা হয়েছে "ভবেৎ প্রহসনং বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবিকল্পিতম্" অর্থাৎ "যাহাতে নিন্দনীয় ব্যক্তিগণের ব্যাপার কবিকল্পনার সাহায্যে উপস্থাপিত হয়, তাহাকে প্রহসন বলে।'২৭

আরিস্তোতল কমেডির সংজ্ঞা নিরূপণ করবার সময় আরিস্তোফেনিসের কমেডিগুলোর কথা মনে রেখেছিলেন। তিনি যখন বলেন—"Comedy is an imitation of characters of a lower type—not, however, in the full sense of the word bad, the ludicrous being merely a subdivision of the ugly"২৮ তখন অনিবার্যভাবেই প্রহসনের কথাই মনে আসে এবং আচার্য বিশ্বনাথ উল্লিখিত ধৃষ্ট ব্যক্তি ধূর্ত ও সুদখোর' ইত্যাদি চরিত্র ও আরিস্তোতল বর্ণিত 'character of a lower type'—উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য সাযুজ্য স্থাপিত হয়। ব্যঙ্গের বিষয় বিশেষ কোনো চরিত্র হলে প্রহসন স্ফূর্তিলাভ করে—প্রাচীন সাহিত্যাচার্যগণের মতে তাই মনে হয়। এবং তার ফলে পরবর্তীকালে একটি বক্তব্য উদ্ভূত হয়েছে যে, প্রহসন রচনায় নাট্যকারের superiority complex কাজ করে। চরিত্রকে ব্যঙ্গ করা প্রহসনের উদ্দেশ্য বলে ধরা হলে এমন সিদ্ধান্ত হয়তো অযৌক্তিক নয়।

আসলে, প্রহসনকার অত্যন্ত সমাজসচেতন। আরিস্তোফেনিস বা ম্যলিয়েরের যখন বিশেষ কোনো চরিত্রকে ব্যঙ্গের বিষয় বলে নির্বাচিত করেন তখন তার সামাজিক

তাৎপর্য তাঁরা কখনোই বিস্মৃত হন না। তাত্পর্যক ব্যক্তি নিশ্চয়ই কিন্তু সে একটি বিশেষ সমাজের প্রতিভূ। এবং সেজন্যেই তার প্রতীকী গুরুত্ব কালান্তরে বিস্তৃত।

প্রহসনের হাস্যরসকে প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত করা হয়—স্যাটায়ার বা খোলাখুলি ব্যঙ্গ, উইট বা বাগ্‌ভঙ্গিমুনিত ব্যঙ্গ তথা পরিস্থিতিগত হাস্যরস এবং হিউমার বা সহানুভূতিশীল তথা অশ্রুসজল হাস্যরস। স্যাটায়ারে লেখক নির্মম, তিনি স্থিত বাস্তবকে তাঁর কল্পিত আদর্শের স্তরে উন্নীত করার প্রয়াসী। এখানেই সম্ভবত superiority complex অপবাদের সুযোগ থেকে যায়। হিউমার এর বিপরীত প্রান্তবাসী। সমস্তরে নেমে না এলে সহৃদয়তা স্থাপিত হতে পারে না।

এখানে 'আয়রনি' সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। সমালোচকের মতে যেখানে লেখকের অভিপ্রায় অত্যন্ত স্পষ্ট সেখানে স্যাটায়ারের আধিপত্য। আর, অভিপ্রায় স্পষ্ট না হলে 'আয়রনি'। অর্থাৎ আয়রনি প্রচ্ছন্ন স্যাটায়ার।'[২৯]

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিচার করে বলা চলে বাঙলা নাট্যসাহিত্যে স্যাটায়ার রচিত হয়েছে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। তার কারণও অবশ্য নিহিত রয়েছে সমকালীন সমাজব্যবস্থায়। কেননা, যেকালে ও যে সমাজে মূল্যবোধ প্রয়োজন ও জোগানের সমানুপাতিক নয়, সেখানে স্যাটায়ারের প্রকোপ। উনিশ শতকীয় বাঙালী সমাজের মূল্যবোধ সম্পর্কে অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞানের সংস্পর্শে এসে বাঙালী নাট্যকারগণ আমাদের সমাজের যুগসঞ্চিত কুসংস্কার ও কুপ্রথা অপনোদনে ব্রতী হয়েছিলেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন যখন 'কুলীনকুলসর্বস্ব' বা 'নবনাটক' লেখেন তখন স্পষ্টতই বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত সমকালীন সমাজআন্দোলন দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন। রামনারায়ণ থেকে মধুসূদন-দীনবন্ধু পর্যন্ত প্রহসনসাহিত্য মূলত প্রগতিপন্থী। ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে তাঁরা যা বাধা বলে মনে করেছিলেন, তাকেই ব্যঙ্গে বিধ্বস্ত করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো। কৌলীন্য প্রথা, পণপ্রথা, বহুবিবাহ, ধার্মিক-লম্পট সবকিছুই তাঁদের লক্ষ্যবস্তু ছিল। এমন কি পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও মধুসূদন-দীনবন্ধু নব্যশিক্ষিত· যুবসমাজের উৎকেন্দ্রিকতাকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছিলেন। এ সময়েই রচিত হয়েছিলো বাঙলা সাহিত্যের এমন তিনটি প্রহসন—'একেই কি বলে সভ্যতা?' 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ,' 'সধবার একাদশী'—যা এখনো শ্রেষ্ঠতম স্যাটায়ারের মর্যাদালাভের উপযোগী। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' নামক প্রহসনে মধুসূদন শুধু যে উৎকেন্দ্রিক নববাবুদের শিক্ষার অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ করেছেন তা নয়, আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রাতিশয়ী গভীরতর সঙ্কটের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। সন্দেহ, অবিশ্বাস, প্রবঞ্চনা ও মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্যহীনতা যদি হয় ব্যাপকভাবে আধুনিক সভ্যতার যুগলক্ষণ, 'একেই কি বলে সভ্যতা?' নাটকে মধুসূদন তাকেই বিদ্রূপাঘাত করতে উদ্যত হয়েছিলেন মনে হয়। কালীনাথ নবকুমারকে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় নেবার

জন্য ব্যাকুল কোনো বন্ধুত্বের টানে নয়, "মনিম্যাটারে সে বিশেষ সাহায্য করে, সে ছাড়লে যে আমাদের সর্বনাশ হবে"—এই স্বার্থপরতার জন্য। সেখানে পিতৃপরিচয়ে সন্তানের পরিচয় হয় না। পিতা সন্তানকে বিশ্বাস করে না, গোপনে গোয়েন্দা লাগায়। পুলিস সার্জেণ্ট অজুহাত সৃষ্টি করে ঘুষ নেয় তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কিন্তু বৈষ্ণব-বাবাজী ঘুষ নিয়ে কর্তাকে যখন প্রবঞ্চনা করে তখন মধুসূদনের অভিপ্রায় অস্পষ্ট থাকে না। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভাতেও অনুরূপ চিত্র প্রকট। সেখানেও কেউ পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে না। অনুপস্থিত নব ও কালীবাবুর বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে কটু মন্তব্য করতে তাদের বাধে না। সর্বোপরি অন্তঃপুরের দৃশ্য। সেখানেও মূল্যবোধের অভাব। নইলে হরকামিনী ও প্রসন্ন—বধূ ও ননদ—পরস্পরের দাদাকে নিয়ে যে রসিকতা করে তা শালীনতা অতিক্রম করত না। অর্থাৎ সবসুদ্ধ মিলিয়ে মধুসূদন পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সভ্যতার এমন একটি নৈরাজ্য উপস্থিত করেন যাতে মনে হয় কর্তামহাশয় 'সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা' করলেও এই অলাতচক্র থেকে উদ্ধারের কোনো আশা নেই। অর্থাৎ 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' নাটকে নাট্যকার স্যাটায়ারের খোলাখুলি বিদ্রূপের সঙ্গে আয়রনির চাপা ব্যঙ্গকে সমানুপাতিক ভাবে মিশিয়েছেন, ফলে নাটকটি শ্রেণীবিচারে একটি নতুন মাত্রা লাভ করেছে। নাটক হিসেবে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' তুলনায় শ্রেষ্ঠ হলেও সেখানে অপরটির মতো অন্যতর গূঢ় বৈশিষ্ট্য নেই।

১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে বাঙলা নাটকের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছিলো। এই পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রয়ে গেছে প্রহসনে। সাধারণভাবে পণপ্রথা বা নব্য সভ্যতার উৎকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে নাট্যকারগণ সোচ্চার হলেও এমন কতকগুলো নতুন ঝোঁক দেখা গেল যাকে প্রগতিপন্থী বলা যায় না। অমৃতলাল বসু এ পর্বের শ্রেষ্ঠ স্যাটায়ার লেখক বলে স্বীকৃত। তাঁর সম্পর্কে অজিতকুমার দত্তের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—'শিক্ষা এবং শিক্ষিতের প্রতি অমৃতলালের সহানুভূতি তো ছিলই না বরং বিদ্বেষ ছিল। ...খুব উচ্চশিক্ষা না হোক, পাশ্চাত্য শিক্ষার স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন; এবং তাঁর জীবনীকারের মতে, শেষ জীবনে শিক্ষার প্রতি তাঁর মমতাও জন্মেছিল। অথচ তাঁর সকল প্রহসনে শিক্ষা ও শিক্ষিতের প্রতি তিনি অতি নিম্নশ্রেণীর বিদ্রূপ প্রয়োগ করতে কখনো বিরত হন নি। এর থেকে মনে হয় যে থিয়েটারী সমাজের সংস্পর্শেই হোক, বা যেভাবেই হোক, তাঁর রুচি ও মতামত অত্যন্ত অনগ্রসর ও সেকেলে হয়ে পড়েছিল। পুরোনো আদর্শ নিয়ে প্রাণহীন উচ্ছ্বাস ছাড়া, কোনো প্রকৃত উচ্চাদর্শ, উচ্চভাব বা উদার মনোবৃত্তি তাঁর কোন নাটকেই চোখে পড়ে না।'[৩০] অমৃতলালের প্রহসনে প্রগতি-বিরোধিতার কারণ নির্ণয়ে সমালোচক ব্যর্থ হলেও তাঁর মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। আশুতোষ ভট্টাচার্য অমৃতলাল সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা—যা পূর্ববর্তী পর্বে নাট্যকারগণ দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলো, তাকেই এ পর্বের প্রহসনে ব্যঙ্গবিদ্ধ করা হয়েছে।

এগার

প্রযোজনার প্রয়োজনে গিরিশচন্দ্র কিছু প্রহসন রচনা করেছিলেন কিন্তু স্বভাবত তিনি আদর্শবাদী ও গম্ভীর ব্যক্তি ছিলেন, হাস্যরস তাঁর স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র ছিলো না, তাই মানসপ্রবণতার বৈপরীত্যহেতু প্রহসনরচনায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি।

প্রহসন রচনার মাধ্যমে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙলা নাট্য-সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন। হাসির গানের তিনি রাজা হলেও প্রহসনে অনুরূপ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হন নি। তার প্রধান কারণ মনে হয়, হাসির গান রচনা করে যে সম্বর্ধনা ও অভিনন্দন লাভ করেছিলেন তাতেই এরূপ বিষয় নিয়ে প্রহসন রচনার সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি সচেতন হন। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়—অন্তত 'কল্কি অবতার' ও 'বিরহ'তে তো বটেই—গানগুলো বহুপূর্বের রচনা এবং পরে তাদের ভাবানুরূপ কিছু চরিত্র ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে, হাসির গানের স্বল্প অবয়ব ও পরিসরে যে ব্যঙ্গরস তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়েছে তাকে কৃত্রিম উপায়ে বিস্তৃত করতে গিয়ে তার তীব্রতা ও মাধুর্য বিনষ্ট হয়েছে। একমাত্র 'পুনর্জন্ম' ব্যতীত তাঁর প্রহসনে উল্লেখযোগ্য কোনো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না।

স্যাটায়ার রচনার সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ হল সেখানে সামান্য ভারসাম্য ও নিরপেক্ষতা বিচ্যুত হলে তা ব্যক্তিগত বিদ্বেষে পরিণত হয়। বাঙলা স্যাটায়ারে তার প্রচুর প্রমাণ আছে। অমৃতলাল বসু যখন সমকালীন নাট্যরচনা ও প্রযোজনার অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে 'তিলতর্পণ' প্রহসনে বিদ্রূপ করেন তখন তার যৌক্তিকতা ও অপূর্ব প্রকাশভঙ্গী পাঠককে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করে। কিন্তু 'থিয়েটার' নামক প্রহসনে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন গিরিশচন্দ্রকে ব্যক্তিগত বিদ্বেষে বিদ্ধ করতে চান তখন স্বভাবতই তা শালীনতার সীমা অতিক্রম করে। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'-এ কেশব সেনকে যে মৃদু ব্যঙ্গ করা হয়েছে তা আপত্তিকর হলেও অবহেলা করা চলে কিন্তু 'গাধা ও তুমি' নামক প্রহসনে এককালের প্রখ্যাত নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাসকে যেভাবে অতুল মিত্র বিদ্রূপাঘাত করেছেন তা ব্যক্তিগত বিদ্বেষে পরিণত হয়েছে। এ পর্যায়ের সুখ্যাততম প্রহসন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আনন্দ বিদায়'। ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছিলেন,—'যদি কোন কবি কোনরূপ কাব্যকে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেইরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য।' 'প্রস্তাবনাতে'ও অনুরূপ বক্তব্য প্রকাশিত—

"প্যারডিতে প্রহসনে পিষিয়ে,
গুলে নিয়ে, অপেরাতে মিশিয়ে
কটু ও মিষ্টে—
(পরে) যা থাকে অদৃষ্টে—

(কাব্যে) কুনীতির পৃষ্ঠে ঝাঁটিকা।
না হি যাঁর কৃষ্ণে ভক্তি
বৈষ্ণব-কবিতার মধ্যে দেখি যাঁর
লালসায় শুধু অনুরক্তি—
এটা তারও মস্তকে ছোটখাট চাঁটিকা॥"

রবীন্দ্রনাথের প্রতি নাট্যকারের এরূপ অশোভন উক্তি সকল শালীনতা অগ্রাহ্য করেছে। বাঙলা স্যাটায়ারের এরূপ পরিণতি নিঃসন্দেহে উদ্বেগব্যঞ্জক।

বার

স্যাটায়ারের সমান্তরালে ভিন্নস্বাদের প্রহসন রচনার সূত্রপাত করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনে সামান্য স্যাটায়ারের ছোঁয়া থাকলেও 'এমন কর্ম আর করবো না' (পরে 'অলীকবাবু' নামে প্রকাশিত) থেকে তিনি ভিন্নতর হাস্যরসের অনুসন্ধানী। পরিস্থিতি সৃজনের অভিনবত্ব ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সংলাপ তাঁর হাতিয়ার। হেমাঙ্গিনী কর্তৃক বঙ্কিম-নায়িকার অনুভাব অথবা অলীকপ্রকাশের চালিয়াতিতে মুগ্ধ সত্যসিন্ধু ও জগদীশবাবু যখন সিদ্ধান্ত করেন ছেলেটি লেখাপড়ায় সত্যই ভাল তখন নাট্যকারের সিদ্ধি সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না। বিশেষত, বিভিন্ন বেশে উপস্থিত হয়ে গদাধর যখন বিচিত্র পরিস্থিতি রচনা করে তা উচ্চাঙ্গের কলাকৌশলপূর্ণ। অবশ্য নাটকে এরূপ কৌশল অবতারণাকে অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রহসন রচনায় নাট্যকারের অস্বাভাবিক চরিত্র ও পরিস্থিতি নির্মাণের স্বাধীনতা আছে। নচেৎ আরিস্তোফেনিসের 'শান্তি' নামক নাটকের নায়ক ত্রাইগেয়ুস যখন গুবরে পোকার পিঠে আরোহণ করে স্বর্গে চলে যায়, তার অবাস্তবতাকেও স্বীকার করা চলে না। কিন্তু সমকালীন গ্রীক দর্শক—যতদূর জানা আছে—তার অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলেনি এবং উত্তরকালের বিদগ্ধমণ্ডলীও তার রসাস্বাদনে বাধাপ্রাপ্ত হন নি।

জ্যোতিরিন্দ্রপ্রবর্তিত হাস্যরস আরও মার্জিত ও কবিত্বগুণসমন্বিত রূপে মূর্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রহসনে। হাস্যকৌতুক বা ব্যঙ্গকৌতুক গ্রন্থদ্বয়ের অন্তর্গত কোনো কোনো নাটিকায় অবশ্য বিশেষ ব্যক্তির প্রতি বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে যা তীব্র স্যাটায়ারের লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ প্রহসনগুলোতে সে জ্বালা অনুপস্থিত। 'চিরকুমার সভা'র আদর্শকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে কোনো কোনো সমালোচক স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তির্যক কটাক্ষপাত অনুমান করেছেন। কিন্তু তা যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বিশেষত 'চিরকুমার সভা'র প্রধান পুরুষ চন্দ্রবাবুর চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও ঋষি রাজনারায়ণ বসুর ছায়াপাত ঘটেছে—গবেষণায় তাই প্রমাণ হয়েছে এবং তাঁরা উভয়েই বিবাহিত ছিলেন। কাজেই 'চিরকুমার সভা'কে স্যাটায়ারধর্মী রচনা বলা চলে না।

আসলে হাস্যরস সৃজনে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত উইটের পক্ষপাতী। অপরূপ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য

এ বিষয়ে তাঁর অবলম্বন। 'শেষ রক্ষায়' চন্দ্রকান্ত, 'চিরকুমার সভায়' অক্ষয় ও রসিকবাবু এবং 'বৈকুণ্ঠের খাতায়' তিনকড়ির সংলাপে অনুরূপ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সর্বাধিক প্রকাশিত। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় প্রহসন একটি নতুন মাত্রা লাভ করেছে। এ নাটকে যদিও 'উইট'ই রবীন্দ্রনাথের প্রধান অবলম্বন, এমন কি কেদার চরিত্র রূপায়ণে স্যাটায়ারও অলক্ষ্য নয়, তবু বৈকুণ্ঠের বাতিকগ্রস্ততা দর্শকচিত্তে কৌতুকহাস্যের সঞ্চার করে। তাঁর বই কেনা, এমন কি পরোপকার প্রবৃত্তিকেও আমরা স্নিগ্ধ হাস্যে গ্রহণ করি কিন্তু যখন কেদারের ষড়যন্ত্রে বৈকুণ্ঠ প্রায় গৃহছাড়া, তখন এমন কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা অকস্মাৎ সমগ্র প্রহসনখানিতে একটি অশ্রুসজল পরিবেশ সৃজন করে দেয়। উদ্ধৃতি :

১. ঈশান।··· আমাদের ছোটোমার খুড়ি না পিসি না কে এক বুড়ি এসে দিদি ঠাকরুণকে যে দুঃখ দিচ্ছে—সে তো আমার আর সহ্য হয় না।

বৈকুণ্ঠ। আমার নিরুমাকে! সে তো কারো কিছুতে থাকে না। তা নিরু কি বলে?

ঈশান। তিনি তো তাঁর বাপেরই মেয়ে, মুখখানি যেন ফুলের মতো শুকিয়ে যায়, একটি কথা বলে না—

বৈকুণ্ঠ। (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া) একটা কথা আছে, 'যে সয়, তারই জয়।'

২. বৈকুণ্ঠ। ভেবেছিলুম, খাতাপত্রগুলো আর সঙ্গে নেব না—শুনে নিরুমা কাঁদতে লাগলো, ভাবলে বুড়োবয়সের খেলাগুলো বাবা কোথায় ফেলে যাচ্ছে। এগুলো নে ঈশেন। —ঈশেন!

ঈশান। কী বাবু!

বৈকুণ্ঠ। ছোটোর উপর বড়োর যে রকম স্নেহ, বড়োর উপর ছোটোর সে রকম হয় না - না ঈশেন?

ঈশান। তাই তো দেখতে পাই।

৩. বৈকুণ্ঠ। অবিনাশ কি এসব জানে?

ঈশান। তা কি আর জানেন না? তিনি যদি এর মধ্যে না থাকতেন, তা হলে কি আর বুড়িটা সাহস করত—

বৈকুণ্ঠ। দেখ ঈশেন্‌ তোর কথাগুলো বড়ো অসহ্য। তুই একটা মিষ্টিকথা বানিয়েও বলতে পারিস নে। এতটুকু বেলা থেকে আমি তাকে মানুষ করলুম—এক দিনের জন্য আড়াল করি নি—আমি চলে গেলে তার কষ্ট হবে না এমন কথা তুই মুখে আনিস হারামজাদা বেটা। সে জেনে শুনে আমার নীরুকে কষ্ট দিয়েছে। লক্ষ্মীছাড়া পাজি, তোর কথা শুনলে বুক ফেটে যায়। [তৃতীয় দৃশ্য]

এ পর্যায়ে প্রহসনটি প্রায় ট্র্যাজেডির সীমা স্পর্শ করেছে। একমাত্র অবিনাশের

স্বাভাবিক অথচ অলৌকিক হস্তক্ষেপে এ নাটকে শাস্তিদায়ক উপসংহার সম্ভব হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, হাস্যরস সৃজন করতে গিয়ে করুণরসের অবতারণায় রবীন্দ্রনাথের fixity of purpose বিনষ্ট হয়েছে, ফলে প্রহসনটিতে রসবিপর্যয় ঘটেছে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন 'বৈকুণ্ঠের খাতা' স্যাটায়ার নয় বরং হিউমারের লক্ষণাক্রান্ত। বৈকুণ্ঠ যে অপরের কাছে কৌতুকের পাত্র সে বিষয়ে বৈকুণ্ঠ নিজেও সচেতন। তিনি যখন বলেন, "আমার লেখা! সে আবার একটা জিনিস। সবাই হাসে আমি কি তা জানি নে ঈশেন? ও-সব রইল পড়ে। সংসারে লেখায় কারও কোনো দরকার নেই" (তৃতীয় দৃশ্য)—তখন তার অন্তর্নিহিত আবেদন হিউমারমণ্ডিত। এ প্রসঙ্গে চার্লি চ্যাপলিনের কথা মনে আসে। অধিকাংশ স্থলে নিজেকেই কৌতুকের পাত্রে পরিণত করে তিনি অশ্রুসজল হাস্যরসের নাটকীয় উপস্থাপনা করেছেন। 'গোল্ড রাশে'র স্বপ্নদৃশ্যে সেই বিখ্যাত চামচ-নৃত্য স্মরণ করা যেতে পারে। বেদনার ঐরূপ হাস্যমুখর অভিব্যক্তি কৌতুক হাস্যের জগতে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধে অনুরূপ সিদ্ধান্তই করেছিলেন। তাঁর মতে—"অসংগতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনি আমাদের কৌতুকবোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়।"[৩১]

'বৈকুণ্ঠের খাতায়' রবীন্দ্রনাথ 'গভীরতর স্তরে আঘাত' করার প্রয়াসী এবং এই আঘাতের মাধ্যমে বাঙলা প্রহসনে এক নতুন হাস্যরস তিনি সৃজন করেছেন। এ প্রসঙ্গে এখানে স্মর্তব্য 'কৌতুক হাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধ ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসন প্রায় সমকালে রচিত, কাজেই উভয়ের মধ্যে প্রতিপাদ্য ও প্রমাণের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে বলা যায়।

বাঙলা প্রহসন, অতএব, মধুসূদনের স্যাটায়ার থেকে যাত্রা করে রবীন্দ্রনাথের উইট-হিউমারে এসে স্থিত হয়েছে এবং বিংশ শতাব্দীতে বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে মধুসূদনের প্রহসন বিশেষ অভিনীত না হলেও রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' ও 'চিরকুমার সভা' প্রযোজিত হয়ে প্রভূত সমাদর লাভ করেছিলো। সম্ভবত তার ফলে এক বিচিত্র টানাপোড়েনে বাঙলা প্রহসন সাহিত্য প্রভাবিত হয়েছে। উইট বা হিউমারের রাবীন্দ্রিক বৈদ্যুতি পরবর্তী নাট্যকার কর্তৃক অনায়ত্ত থেকেছে অথচ স্যাটায়ারের নবতর সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁরা হয়েছেন বীতস্পৃহ। কাজেই বাঙলা নাট্যসাহিত্যের এ শাখাটি বিশ শতকের প্রথমার্ধে—রবীন্দ্রযুগে—তার পূর্বতন ঐতিহ্য বিচ্যুত হয়েছে। অথচ এ পর্বে বাঙালীর সামাজিক পরিবেশে স্যাটায়ারের উপাদান বিলুপ্ত হয়নি। নাট্যকারদের অমনোযোগিতার ফলে কুসংস্কার কুপ্রথার বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়ুধ

প্রায় অব্যবহৃত থেকে গেছে। সমালোচক যখন বলেন—"In the warfare of science against superstition, the satirists have done famously. Satire itself appears to have begun with the Greek 'silioi' which were pro-scientific attacks on superstition. Similarly with religion,…Any really devout person would surely welcome a satirist who cauterized hypocrisy and superstition as an ally of true religion"[৩২] তখন স্যাটায়ারের অমিত শক্তি সম্পর্কে পরবর্তী বাঙালী নাট্যকারদের উদাসীনতা ক্ষোভের সঞ্চার করে।

১ Scholes and Klaus : Elements of Drama [Q. U. P. 1971] P 43
২ Op. Cit P. 43
৩ Northrop Frye : Anatomy of Griticism [Pricnton 1957] P. 162
৪ A. B. Keith : The Sanskrit Drama P. 279 280
৫ Op. Cit. P. 277
৬ রবীন্দ্র রচনাবলী : ১৩শ খণ্ড [পশ্চিম বঙ্গ সরকার, ১৩৬৮] পৃ. ৭১৭
৭ Peter G. Phialas : Shakespeare's Romantic Comedies [Chapel Hill 1966] P. XIII
৮ Op. Cit. P. XIV
৯ John Dover Wilson : Shakespeare's Happy Comedies [Faber 1952] P. 32
১০ Henry Bergson : Laughter—translated by Brereton [Macmillan 1921] P. 4-5
১১ Joseph Macleod : Actors Cross the Volga [Geoage Allen & Unwin] P. 14
১২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস পৃ. ১৭৭-১৮৬
১৩ বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড [সাহিত্য সংসদ ১৩৬৬] পৃ. ৮৩৪
১৪ সুশীল কুমার দে : দীনবন্ধু মিত্র পৃ. ৫৫
১৫ হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত : গিরিশ প্রতিভা পৃ. ৪৪৮
১৬ তদেব : পৃ. ৪৫১
১৭ তদেব পৃ. ৪৬৪
১৮ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : গিরিশচন্দ্র পৃ. ৪৮৭
১৯ Janet Spens : The Elizabethan Dramr P. 32
২০ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : ভারতীয় নাট্য মঞ্চ ২য় খণ্ড পৃ. ১৫৯

২১ তদেব : পৃ. ১৯৭

২২ রমাপতি দত্ত : রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ পৃ. ৩৪৬

২৩ রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩শ খণ্ড : পৃ. ৭২০-৭২১

২৪ নবকৃষ্ণ ঘোষ : দ্বিজেন্দ্রলাল পৃ. ১৫০

২৫ নবকৃষ্ণ ঘোষ : তদেব পৃ. ১৫২

২৬ সমালোচনা সাহিত্য : পৃ. ২০৪

২৭ সাহিত্য দর্পণ : বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনূদিত পৃ. ৫২

২৮ Butcher : Aristatle's Theory of Poetry and Fine Arts (Dover I95I) P. 21

২৯ Northrop Frye : The Anatomy Criticism of P. 223

৩০ ড. অজিত কুমার দত্ত : বাংলা সাহিত্য হাস্যরস পৃ. ১৫৪

৩১ রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪শ খণ্ড পঃ বঃ সরকার পৃ. ৬৯২

৩২ Northrop Frye : Cp. Cit. P. 231-232

———

সপ্তম অধ্যায়

চরিত্র : ব্যষ্টি থেকে সমষ্টি

এক

ভালো নাটক রচনার অন্যতম শর্ত হিসেবে মধুসূদন চরিত্রচিত্রনকে উল্লেখযোগ্য স্থান দিয়েছেন। আরিস্তোতল প্লট ও চরিত্রের মধ্যে প্রথমটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলেও রেনেসাঁস যুগের নাট্যকারগণ চরিত্রচিত্রনেই আগ্রহী হয়েছিলেন অধিক। অধিকাংশ সমালোচকের মতে শেক্সপীয়রের নাটকে প্লট এমন কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়, এলিজাবেথীয় যুগের অনেক নাট্যকারই শেকসপীয়রের তুলনায় প্লট উদ্ভাবন ও নির্মাণে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা কেউ চরিত্রচিত্রন ও কবিত্ব শক্তিতে শেকসপীয়রের সমকক্ষ হতে পারেন নি। প্লটের তুলনায় চরিত্রের এই আধিপত্য নিঃসন্দেহে রেঁনেসাসের অবদান। কেননা রেঁনেসাস যুগেই মানুষ ব্যক্তিত্ববৈচিত্র্যে বর্ণময় হয়ে উঠেছিলো। ব্যক্তিনিরপেক্ষ কোনো অদৃশ্য শক্তি তখন থেকে আর চরিত্রের নিয়ামক হয়ে রইলো না, চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করলো তারই অন্তর্নিহিত প্রবল ইচ্ছা-শক্তি, আবেগ ও আসক্তি। কাজেই কবি যখন লেখেন—

Passions spin the plot

And we are betrayed by the false within—তখন তা রেনেসাঁস যুগের নাটক, বিশেষ করে শেকসপীরীয় ট্র্যাজেডি সম্পর্কে যথার্থ হয়ে ওঠে।

শেকসপীয়রের চরিত্রচিত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক মন্তব্য করেছেন—"Shakespeare's characters are not photographic transcripts of human individual; but neither are they monsters, inconsistent with humanity as we know it. They are as it were, abstracted from humanity, yet functionally related to it: types and humours—even allegorical and symbolic figures,"....[১] সমালোচক অতঃপর বিভিন্ন ধরনের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে লিখেছেন—"A type presents in abstract certain features common to a class; a humour is a human being reduced to a dominant principle; an allegorical figure personalises an abstraction; symbol stands for a greater reality,

human or divine."[২] অবশ্য সমালোচক বিশ্লেষিত এ সকল বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য শেকসপীয়রে যান্ত্রিক প্রতিফলন ঘটে নি, সবগুলো মিশে একটি জৈব সমগ্রতায় পরিণত হয়েছিলো এবং সেখানেই নাট্যকার হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। বাঙালী নাট্যকারদের চরিত্রচিত্রণে কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথাগুলো মনে রাখা প্রয়োজন।

দুই

মধুসূদন পূর্ববর্তী বাঙলা নাটকের চরিত্রগুলো ব্যক্তিত্ব স্ফুরণে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠতে পারে নি। 'ভদ্রার্জুন' বা 'কীর্তিবিলাসের' চরিত্রচিত্রণে সংস্কৃত নাটকের অক্ষম অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। এমন কি, 'কুলীনকুলসর্বস্ব'তেও রামনারায়ণ তর্করত্ন সংস্কৃতানুগ চরিত্র অঙ্কন-পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে চরিত্রচিত্রণে সংস্কৃত নাট্যকারগণের কৌশল নিয়ে সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। 'শকুন্তলায় নাট্যকলা' গ্রন্থে সমালোচক দেবেন্দ্রনাথ বসু মন্তব্য করেছেন—"চরিত্রচিত্রে শেকসপীয়রের সঙ্গে সংস্কৃত নাট্যকারগণের পার্থক্য এই যে সংস্কৃত নাটকে ব্যক্তিগত (Individual) চরিত্রের বিকাশ, শেকসপীয়রের নাটকে প্রায় অধিকাংশ চরিত্রই জাতিগত আদর্শের (Type) অভিব্যক্তি।"[৩] অবশ্য তারপরের পঙক্তিতেই তিনি লিখেছেন—"সংস্কৃত নাটক ব্যক্তিতে পূর্ণ আদর্শের সৃষ্টি করিয়া মানুষকে মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রদর্শন করে। শেকসপীয়রের ধারা ব্যষ্টিতে সমষ্টির—ব্যক্তিতে জাতির লক্ষণ বিকাশ।"[৪]

সমালোচকের সিদ্ধান্ত সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকই যে চরিত্র সৃষ্টি করে থাকেন তার মধ্যে তাঁর দেশ ও কালের বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ মূর্ত হয়ে ওঠে। সে বৈশিষ্ট্য বা আদর্শকে Type চরিত্র বলা যায় না, কেননা সেই অর্থে পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ চরিত্রই Type বলে গণ্য হতে পারে।

মধুসূদন সৃষ্ট রাবণচরিত্রও উনিশ শতকীয় বাঙালীর প্রবৃত্তি ও আসক্তি প্রকাশ করেছে এবং সে হিসেবে রাবণ বাঙালীর আদর্শকেই মূর্ত করেছে। সে কারণে নিশ্চয়ই রাবণচরিত্রকে Type চরিত্র বলা চলে না। অনুরূপ ভুল সিদ্ধান্ত আধুনিক কালের বিখ্যাত নাট্যসমালোচক এরিক বেন্টলেও করেছেন। তিনি লিখেছেন—"What of Hamlet —the classic instance of an individual in world drama? It has been said that Coleridge saw Hamlet in his own image.···And for that matter, later critics of different kinds also saw Hamlet, either in their own image or in the image of their dream self. This would seem to be proof that Hamlet is not limited by his author to one highly individualized Physiognomy···Then is not Hamlet a

type ?"[৫] হ্যামলেট যে বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্রকৃতির মানসে বিপুল আলোড়ন তুলেছে তার কারণ ব্যাখ্যা করে নীরেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন,—"হ্যামলেটের নৈতিক চেতনায় যে কর্মসংকট দেখা দিয়াছিল, বুর্জোয়া সমাজে নীতি-চেতনা-পরায়ণ হইলে তাহা হইতে কাহারো মুক্তি নাই। সে মানবিকতাবাদী বুদ্ধিজীবী। ইহা সত্য নহে যে হ্যামলেটের মানব প্রকৃতি ছিল কর্মবিমুখ, কিন্তু কর্মের চিন্তাগত সমর্থন না থাকিলে তাহার নিকট কর্ম অসার্থক।...সে এমন যুগে জন্মিয়াছে যে তাহার চোখে সমস্তই বিশৃঙ্খল। মানবিক হিসাবে তাহার কর্তব্য, সে জানে, এই বিশৃঙ্খলতাকে সংশোধিত করিয়া সুষমায় প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বিশৃঙ্খলতা যে সর্বব্যাপী। একটি অন্যায়ের প্রতিকার করিতে গেলে সমস্ত সমাজব্যবস্থায় গিয়া টান পড়ে। কোন অন্যায়ই তো একক বিচ্ছিন্ন অন্যায় নয়—প্রত্যেক অন্যায়ের সহিত জড়িত হইয়া আছে এমন অনেক বিষয় যাহার সহিত নিজেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যাহাদিগকে বাদ দিয়া তাহার নিজের জীবনও অর্থহীন। এই অন্তর্দ্বন্দ্বই হ্যামলেট নাটকের প্রধান ঘটনা।"[৬] এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই "হ্যামলেট সমস্ত বুর্জোয়া মানবিকতাবাদীদের অবিসংবাদিত প্রতিনিধি।"[৭] "প্রতিনিধি" ও "Type" নিঃসন্দেহে সমার্থক নয়। তাই দেবেন্দ্রনাথ বসু সংস্কৃত নাটকের চরিত্রচিত্রণ ও শেকসপীয়রে প্রকাশিত চরিত্র সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা যথার্থ নয়। বরং এ সম্পর্কে আরভিং রিব্‌নারের ব্যাখ্যা যুক্তিপূর্ণ। তিনি লিখেছেন—"Drama is built out of individual character and event ; the tragic hero must be a free, conscious agent, capable of deliberate moral choice. But the individual may also be a symbol of mankind, and the problem he faces may be that which all men face. Shakespeare's interest is in mankind more than in individuals. He endows his characters with a convincing illusion of reality, but through them he explores issues of wider significance than the psychological problems of any individual personality."[৮] শেকসপীয়রের হ্যামলেট এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ চরিত্র এরূপ more than individual, তারা symbol of mankind, এরিক বেণ্টলে কথিত type নয়।

ভরতমুনি চরিত্রকে বলেছেন 'প্রকৃতি'। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, তাঁর মতে 'প্রকৃতি' তিন প্রকার—উত্তমাধমমধ্যমা।

জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানবতী নানাশিল্প বিচক্ষণা ॥
দক্ষিণাহ্য ভগালক্ষন দীনানাং পরিশান্তিনী।
নানাশাস্ত্রার্থসম্পন্না গাম্ভীর্যোদার্যশালিনী ॥

ধৈর্যত্যাগগুণোপেতা জ্ঞেয়া প্রকৃতিরুত্তমা ॥

(২-৪, ৩৪ অধ্যায়)

অনুরূপভাবে মধ্যম ও অধম চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও নির্দিষ্ট হয়েছে। আচার্য ভরত নির্দেশিত এ সকল বিশেষত্ব বিভিন্ন type-কেই দ্যোতনা করে। এবং সেজন্যই অধ্যাপক কীথ মন্তব্য করেছেন—"The chief hero in any drama must be essentially true to one or other of those types ; any change would spoil the unity of the development of the drama"[৯] অবশ্য সেজন্যেই সংস্কৃত নাটকে অঙ্কিত চরিত্রের মধ্যে আধুনিক কালের সমালোচক সত্ত্বগুণের প্রকাশ দেখেছেন, ইউরোপীয় চরিত্রকে রজোগুণ সমন্বিত বলে অভিহিত করেছেন। এবং সাত্ত্বিক চরিত্রে তরঙ্গ বিক্ষোভের বিশেষ অবকাশ নেই, রাজসিক চরিত্রে আছে। তাই সমালোচক যখন বলেন—"মৃচ্ছকটিকের মুখপাত্র চারুদত্ত হিন্দু আর্য। তাঁহার ইচ্ছাবৃত্তি শাস্ত্রশাসনের অধীনা। মৃচ্ছকটিকের গৌণপাত্র শর্বিলক ইউরোপীয় ছাঁচের লোক। তিনি সক্ষম পণ্ডিত এবং তীক্ষ্ণধী। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাবৃত্তি অতীব বলবতী, ধর্মশাসনের ততটা বশীভূতা নহে। এককথায় চারুদত্ত সাত্ত্বিক, শর্বিলক রাজসিক পুরুষ।"[১০] শাস্ত্রশাসনের অধীন হলেও শ্রেষ্ঠ নাটকীয় চরিত্র হবে এমন কোনো কথা নেই। বিভিন্নমুখী প্রবণতা ও প্রবৃত্তি না থাকলে চরিত্র বর্ণময় ও নাটকীয় হয়ে উঠতে পারে না। লৌকিক জগতে আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ নাটকীয় চরিত্র এক নয়। লৌকিক জগতে আদর্শ চরিত্র যুধিষ্ঠির, কিন্তু নাটকীয় চরিত্র হিসেবে অনেক বেশি বর্ণময় কর্ণ, কৃষ্ণ, এমন কি দুর্যোধনও। এবং সে কারণেই আরিস্তোতল শ্রেষ্ঠ নাটকীয় চরিত্র হিসেবে the intermediate kind of person, a man not pre-eminently virtuous and just-কে নির্দেশ করেছেন।

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক E M. Forster তাঁর Aspects of the Novel গ্রন্থে individual চরিত্রকে round এবং type চরিত্রকে flat বলে অভিহিত করেছেন। এই বিভিন্নতাই সাহিত্যিক চরিত্রকে প্রকাশধর্মী ও বিকাশধর্মী রূপে বিভক্ত করেছে। সাধনকুমার ভট্টাচার্যের ভাষায়—"প্রকাশধর্মী রূপটি সেখানেই যেখানে চরিত্রে ধরাবাঁধা প্রবণতাই অপরিবর্তিতরূপে বারবার আবৃত্ত হয় যেখানে চরিত্রে রূপ থাকে, কিন্তু রূপান্তর থাকে না। এককথায় বলা যায় চরিত্র যেখানে একহারা সেখানেই তা প্রকাশধর্মী। আর যেখানে প্রবণতাসম্পন্ন চরিত্র, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নানা ঘাতসংঘাতের মধ্যে দিয়ে এগুতে এগুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, চরিত্রের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে, সেখানেই চরিত্র বিকাশধর্মী।"[১১] সমালোচক এরিক বেন্টলেও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন—"The nub of Mr. Forster's definition is that 'round' characters are free and

therefore unpredictable and surprising, whereas 'flat' characters can only do what they do, and one knows what this is in advance; they are fixed qualities."[১২]

কিন্তু নাটকে এই বিকাশধর্মী চরিত্র বা individual character চিত্রণ সম্ভব হয় না যদি না নাট্যকারের সমকালীন যুগে ব্যক্তিত্ববিকাশের বিশেষ সুযোগ থাকে। সংস্কৃত নাট্যকারদের যুগ ছিলো কঠোরভাবে শ্রেণীভিত্তিক, ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনে আবদ্ধ। তাই সেখানে ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের অবকাশ বেশি ছিলো না। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় রেনেসাঁস যুগে ব্যক্তিত্ববিকাশের অনন্ত সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিলো, ফলে বিচিত্র ও বিভিন্ন প্রবৃত্তিকেন্দ্রিক চরিত্রচিত্রণ নাট্যকারদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। রেনেসাঁস যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেকস্পীয়র। প্রধানত চরিত্রচিত্রণে সাফল্যের মাধ্যমেই তিনি এই খ্যাতি অর্জন করেছেন।

তিন

বাঙলা নাট্যরচনার যখন সূত্রপাত হয় তখনও বাঙলার নবজাগৃতির সকল বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয় নি। যতটাও হয়েছিলো নাট্যকারদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা তাকে সম্পূর্ণ প্রকাশে সক্ষম হয় নি। তাই অনিবার্য কারণেই মধুসূদন-পূর্ববর্তী নাট্যকারদের অঙ্কিত চরিত্র প্রকাশধর্মী অর্থাৎ type। এবং সে-typeও অত্যন্ত দুর্বলভাবে অঙ্কিত। ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ বাঙলা সাহিত্যে তথা নাটকে প্রথম সার্থকভাবে সম্ভব হলো মধুসূদনে।

মধুসূদনও 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী'তে এবং প্রহসন দু'টোতে বিকাশধর্মী চরিত্র অঙ্কনে বিশেষ সাফল্য দেখাতে পারেন নি। প্রহসনের স্বল্পপরিসরে অবশ্য সে সুযোগ প্রায় থাকে না, কিন্তু শর্মিষ্ঠা বা পদ্মাবতীতে তাঁর এই বৈশিষ্ট্য আলোচনার অপেক্ষা রাখে। অন্যতম কারণ হিসেবে বলা যায়, এ নাটকদু'টো রচনাকালে মধুসূদন সংস্কৃত নাট্যাদর্শ থেকে বিমুক্ত হতে পারেন নি এবং ফলে নায়ক-নায়িকায় সংস্কৃত চরিত্রের আদর্শ বা type প্রভাব বিস্তার করেছে। অবশ্য তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ ইতস্তত: দেখা গিয়েছে—কলি চরিত্রে eternal evil conception-এ বা নারীচরিত্রগুলোর বিশেষ ব্যক্তিত্ব প্রকাশের প্রবণতায়। কিন্তু তখনও তাঁর মধ্যে গভীরতা দেখা দেয় নি। সে গভীরতা মধুসূদন আয়ত্ত করেছেন কৃষ্ণকুমারী রচনাকালে। কৃষ্ণকুমারী নাটকে তিনটি নারীচরিত্রই বিশেষ ব্যক্তিলক্ষণে চিহ্নিত এবং তাদের মধ্যে প্রবৃত্তির উত্থানপতনে যে বিচিত্র রাগিণীর বিকাশ হয়েছে তা তাদের type-এ সীমাবদ্ধ রাখে নি। তুলনায় পুরুষ চরিত্রগুলোর ব্যক্তিত্ববিকাশ অনেক দুর্বল। দীনবন্ধুর চরিত্রচিত্রণেও অনুরূপ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। নীলদর্পণে তোরাব, আদুরী, ক্ষেত্রমণি বা 'সধবার একাদশীতে' নিমচাঁদ নি:সন্দেহে বিশেষ ব্যক্তিলক্ষণে চিহ্নিত।

পূর্ববর্তীদের তুলনায় মধুসূদন-দীনবন্ধু পারদর্শিতা দেখালেও একথা অনস্বীকার্য বিকাশধর্মী চরিত্রচিত্রণের শ্রেষ্ঠ কৌশল উভয়ের নাটকেই অলভ্য। শেকসপীয়রের সঙ্গে তুলনা না করেও বলা যায় এলিজাবেথীয় যুগের অপর নাট্যকারদের অঙ্কিত চরিত্রের মতো তাঁদের নাটকে চরিত্রগুলোর ব্যক্তিত্ববিকাশ বিশেষ সম্ভব হয়নি। অথচ মধুসূদন নাটকে বিকাশধর্মী individual চরিত্রসৃজনে আগ্রহী হয়েছিলেন। কৃষ্ণকুমারী রচনাকালে বিভিন্ন পত্রে তাঁর সেই ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে।[১৩] শুধুমাত্র যুদ্ধ ও রাজনৈতিক আলোচনায় নাটককে নিবদ্ধ রাখলে তিনি মনে করতেন— weak senses of the audience and reader-কে পরিতৃপ্ত করা যায়। তাই পরিবর্তে to complicate the plot, by the introduction of one or two more characters (male), would be to complicate it in every sense of the word—এই মত তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। অর্থাৎ প্লটের জটিলতা বৃদ্ধি পায় ঘটনার ঘনঘটায় নয়, চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কে। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—মধুসূদন যাঁর নাট্যবোধকে অত্যন্ত গুরুত্ব দান করতেন—সম্ভবত কৃষ্ণকুমারীতে 'ক্রিয়াবৈচিত্র্যে'র অভাব লক্ষ্য করেছিলেন। মধুসূদন তার উত্তরে তাঁকে লিখছেন—As for 'variety of action' there is not much of it এবং তার জন্য অবশ্য 'original barrenness of the plotকেই তিনি দায়ী করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও উল্লেখ করেছিলেন যে As for the male characters, that is another inconvenience of the plot. কিন্তু তবু I have tried to represent Juggut Sing as I find him in history, a some-what silly and voluptuous fellow; Bheem Sing as a sad, serious man. নারী-চরিত্রচিত্রণেও তাঁর বক্তব্য পত্রাবলীতে ব্যক্ত হয়েছে। The position of European females, both dramatically as well as socially are very different. It would shock the audience if I were to introduce a female (a virtuous one) discoursing with a man, unless that man be her husband, brother or father. This describes a circle around me, beyond the boundary line of which I cannot step. কিন্তু তা সত্ত্বেও মদনিকা চরিত্রসৃজন করে সে সীমা তিনি অতিক্রমে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং সেজন্যেই 'Madanika is my favourite'। মদনিকা বাঙলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম বর্ণময় নারীচরিত্র।

কিন্তু মধুসূদন সম্ভবত অনুভব করেছিলেন সমকালীন কর্মজগতে সমর্থন না থাকলে নাটকে ব্যক্তিত্ববিকাশ কঠিন। In the Sarmista, I often stepped out of

the path of the Dramatist, for that of the mere poet. I often forget the real in search of the poetical. অথচ নাট্যকারের real-কে তিনি খুঁজেছিলেন মদনিকা বা কৃষ্ণকুমারীর অকুণ্ঠ স্বতঃস্ফূর্ততায়, ভীমসিংহ বা ভক্ত-প্রসাদের চকিত ব্যক্তিত্বস্ফুরণে, নিছক কবিত্বে নয়।

দীনবন্ধুর চরিত্রচিত্রণ বৈশিষ্ট্য মধুসূদনের অনুগামী। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায়, "নীলদর্পণে ভদ্র চরিত্রগুলি কৃত্রিম হইয়া উঠিবার আর একটি প্রধান কারণ এই যে, ইহাদের কোনটিকেই নাট্যকার যথার্থ নাট্যক্রিয়া (action)-র মধ্য দিয়া বিকাশ করিয়া তুলিবার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। ইহাদের অধিকাংশই বাক্‌সর্বস্ব মাত্র, কেবলমাত্র বক্তৃতার ভিতর দিয়াই তাহাদের গুণের প্রচার হইয়াছে, কর্মের ভিতর দিয়া তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু নাট্যিক ক্রিয়া (action)-র মধ্য দিয়াই চরিত্রগুলির গুণাবলীর যথার্থ প্রতিষ্ঠা হয়, বক্তৃতার ভিতর দিয়া নহে।"[১৪] ডঃ ভট্টাচার্যের এ মন্তব্য শুধু নীলদর্পণ নয়, দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকের প্রধান চরিত্রগুলো সম্পর্কেও প্রয়োগ করা চলে।

এ প্রসঙ্গে ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের নাট্যচরিত্র সম্পর্কিত আলোচনা আবার স্মরণ করা যেতে পারে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, তিনি চরিত্রকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন—প্রকাশধর্মী ও বিকাশধর্মী। প্রকাশধর্মী চরিত্র সরল ও গভীর—দুই-ই হতে পারে। কিন্তু বিকাশধর্মী চরিত্র গভীর হলেও সরল হতে পারে না, তা অনিবার্য-ভাবেই জটিল হতে বাধ্য।

নাটকীয় চরিত্র এই জটিলতা আয়ত্ত করতে পারে তখনই, যখন সে যথার্থ নাট্য-দ্বন্দ্বের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। সমালোচকের ভাষায়—A character stands revealed through conflict; conflict begins with a decision… …No man ever lived who could remain the same through a series of conflicts which affected his way of living.[১৫]

বিকাশধর্মী চরিত্রের সঙ্গে নাট্যদ্বন্দ্বের এই সমানুপাতিক সম্পর্ক কিছুতেই স্থাপিত হতে পারে না, যদি সমকালীন যুগ তার উপযুক্ত পটভূমি রচনা না করে। উনিশ শতকীয় বাঙলাদেশের যুগবৈশিষ্ট্য ও তার বিবর্তন নিয়ে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিত স্মরণে রেখে বলা যায়, কৃষ্ণকুমারীর ঘটনা-বিরলতা[১৬], অথবা নীলদর্পণে ঘটনার ঘনঘটা—উভয়ের মধ্যেই দ্বন্দ্ব ও চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়ে নাট্যকারদ্বয়ের মানসিক অভিঘাত প্রকাশিত। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন—"মধুসূদন ভীমসিংহকে সম্পূর্ণ সজীব চরিত্র করিয়া আঁকিতে পারেন

নাই, কারণ যে ঐতিহাসিক পরিবেশে ভীমসিংহের চরিত্র প্রত্যক্ষ হইতে পারিত, তিনি তাহা পরিবর্তন করিয়াছেন, কৃষ্ণকুমারীর চরিত্রে যে সম্ভাব্যতা ছিল তাহাও তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। বালিকা কৃষ্ণকুমারীর হৃদয়ে মানসিংহের জন্য যে প্রেম অঙ্কুরিত হইতেছে তাহার মধ্যে কোন সারবস্তু নাই; তিনি সেখানে মদনিকার ক্রীড়নক মাত্র"।[১৭] অর্থাৎ সমালোচকের মতে কৃষ্ণকুমারী নাটকে যাদের নিয়ে ট্র্যাজেডি, তাদের উভয়ের মধ্যেই নাট্যক্রিয়ার যথাযথ বিকাশ হয় নি। তিনি অবশ্য মনে করেন, ঐতিহাসিক ঘটনার আবর্তে ভীমসিংহকে স্থাপিত করলে তার চরিত্রটি সজীব হতো। কিন্তু দীনবন্ধু মিত্র তো তাঁর নীলদর্পণের প্রধান চরিত্রগুলোকে ঘটনার আবর্তে ফেলেছিলেন, তা সত্ত্বেও তারা সজীব চরিত্র হয়ে ওঠে নি। উভয় নাট্যকারের প্রতিভার তারতম্য ও ক্ষমতার কথা স্মরণে রেখেও বলা যায়, সমকালীন যুগপরিবেশ তাঁদের নাটকে যথার্থ নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টির অবকাশ দেয় নি, ফলে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া নাটকে উৎসারিত হয় নি। তাই তাঁদের নাটকে বিকাশধর্মী individual চরিত্রচিত্রণ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলো। অতএব এ বাধার উৎস সন্ধান করতে হবে মধুসূদন-দীনবন্ধুর প্রতিভার অক্ষমতায় নয়, সমকালীন যুগের গভীরতায়।

রেনেসাঁস যুগের ইউরোপে মধ্যযুগ অস্তমিত হলো সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে। নতুন money-economy মানুষের ভিন্নতর মূল্যমান আরোপ করলো। সমাজবিজ্ঞানীর ভাষায়—"Now competition becomes a serious factor, whereas the essence of the guild organization, with its price fixing and compulsory corporization, had been the elimination of competition. In those days the individual had been unfree but secure—as in a family But for obvious reasons, that had been possible only in an economy designed to satisfy immediate and local needs Even the professional trader had been able to maintain the characteristics of the artisan owing to his unchanging methods and life. As long as the horizon remained comparatively limited all this was possible, but as soon as the horizon expands, as great money fortunes accumulated, these conditions are bound to disappear.···In Florence they free themselves from the restriction of the guilds and achieve individual freedom to carry on trade, and commerce,[১৮] এবং তখনই The individualist spirit of early capitaliom thus replaces the corporate spirit of the mediaevel burgher[১৯] অর্থাৎ অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজে ব্যক্তিত্ববিকাশ সম্ভব হলো। রেনেসাঁস যুগের সাহিত্য এই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের বন্দনায় মুখর।

এলিজাবেথীয় সাহিত্যে আমরা সে রূপই প্রত্যক্ষ করি। শুধু তাই নয়—"In order to act correctly the individual requires a knowledge of nature and its laws. Only when he possesses such knowledge can he master nature. Such practical learning is needed in order to work one's will. The ability to master the outside world gives the individual an opportunity of rise in the social scale.[২০]

উনিশ শতকীয় বাঙলাদেশের সমাজবিন্যাসে বুর্জোয়াবিকাশ অর্থনৈতিক কারণেই সম্ভব হয় নি। এ সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। পুনরুক্তির বাহুল্য বর্জন করে তাই বলা যায়, ইংরেজ সৃষ্ট অর্থনৈতিক কাঠামো একটি নতুনধরনের সামন্ত-তন্ত্রকে উজ্জীবিত করেছিলো। তাই নবজাগৃতির বাঙালী সমাজে individualist spirit তার সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে বিকশিত হতে পারে নি। তার ফলেই সম্ভব হয় নি an opportunity of rise in the social scale যা মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক ও ধর্মীয় সকল বাধাকে সম্পূর্ণ rational technique দিয়ে অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখে। তাই বাঙলা নাটকেও যথার্থ individual চরিত্র উপযুক্তভাবে সৃষ্ট হতে সক্ষম হয় নি। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, উনিশ শতকীয় বাঙলা-সমাজের প্রকৃতি বিষয়ে যে বিশ্লেষণ করা হলো তা তো তার সমগ্র সাহিত্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। অতএব, নাটকে অনুরূপ চরিত্রের অভাব পরিলক্ষিত হলেও, বাঙলা উপন্যাস গল্প, এমন কি, কাব্যেও individual চরিত্রসৃজন সম্ভব হলো কেমন করে? উত্তরে বলা যায় কাব্যে বা উপন্যাসে ক্রিয়া বা দ্বন্দ্ব থাকলেও তা নাটকের মতো মুখ্য বা determinant factor বলে পরিগণিত হয় না। নাটকের এই ক্রিয়া ও দ্বন্দ্ব—পূর্বেই বলা হয়েছে—সমকালীন যুগের দ্বন্দ্বের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। যথার্থ নাটকীয় চরিত্র ক্রিয়া ও দ্বন্দ্ব থেকেই উদ্ভূত। বাঙলা নাটকে চরিত্রচিত্রণও সেকারণেই সমকালীন যুগের ক্রিয়া ও দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত নাট্যসমালোচক ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য বাঙলা নাটকে চরিত্রচিত্রণ সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন—"এক্ষণে আমাদের দেশে যে সকল নাটক প্রচারিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশের নায়ক প্রভৃতি প্রকৃতিগণ, রক্তমাংসবিশিষ্ট পৃথক পৃথক মনুষ্যের প্রকৃতির ন্যায় দেখাইতে পারে, এরূপ সুকৌশল সহকারে রচিত হয় না। এ বিষয়ে আমাদের নাট্যকারগণ ঠিক আমাদের প্রতিমাকার ও চিত্রকরগণের ন্যায়। প্রতিমাকারেরা দশভুজা ভগবতীর যেরূপ আকার করে পার্শ্ববর্তিনী লক্ষ্মী সরস্বতীও তেমনি করে, এবং প্রতিমার মধ্যে সখী থাকিলে তাহাদেরও সেইরূপ করে। সকলেরই সমান নাক, সমান চক্ষু, মুখের ভাব সমান; তবে হাতের সংখ্যা, বর্ণ ও অঙ্গভঙ্গীর বিষয়ে যে তারতম্য থাকে, এইমাত্র। সে তারতম্যও

কেবল এই সকল দেবমূর্তির ধ্যানে নিরূপিত আছে·বলিয়া ঘটে।…সুতরাং কাব্যের নায়কনায়িকার সদৃশ উত্তমাঙ্গের বাহ্যভাব বর্ণনাতেও যখন আমাদের কবিগণ এই রীতি অবলম্বন করেন, তখন তাহাদের আন্তরিক ভাব বর্ণনাতেও যে সেইরূপ করিবেন, তাহা কোন বিচিত্র!"[২১] সমালোচক এখানে বাঙলানাটকের চরিত্রে "পৃথক পৃথক মনুষ্যের প্রকৃতি" অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তিলক্ষণ তথা ব্যক্তিত্বব্যঞ্জনা বা individuality-র অভাবের কথাই নির্দেশ করেছেন। অথচ নাটকে "·· if we want characters typical enough to seem intelligible we want them also untypical enough to seem individual"[২২] বাঙলা নাট্যকারগণ এরূপ চরিত্রচিত্রণে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন নি। সেকারণেই কি রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে মধুসূদন ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন "Alas! for the drama But this is not the age for the drama to flourish"[২৩]

চার

বাঙালা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে স্বীকৃত গিরিশচন্দ্র যে সকল চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তা নাকি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। তিনি বলেছেন—"আমি চোখে না দেখে কিছু লিখি নি। প্রফুল্লের যোগেশ, রমেশ, হারানিধি, অঘোর সব আমার চোখে দেখা।"[২৪] গিরিশভক্ত সমালোচক দেবেন্দ্রনাথ বসুও এ উক্তি সমর্থন করেছেন। তিনিও কিন্তু গিরিশচন্দ্রে individual চরিত্রচিত্রণের অভাব লক্ষ্য করেছেন। তিনি সাহিত্যকে ভাবতান্ত্রিক idealistic ও বস্তুতান্ত্রিক realistic—দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং লিখেছেন—"এই বস্তুতন্ত্রতা আবার দুইভাগে বিভক্ত: (ক) চরিত্রের কতকগুলি সাধারণ দোষগুণের শ্রেণীবিভাগ করিয়া কেহ কেহ সেই নির্দিষ্ট শ্রেণীর আদর্শ অর্থাৎ type চিত্রিত করেন; (খ) কেহ কেহ অবস্থাবিশেষে বিশিষ্টভাবে পরিপুষ্ট individual বা স্বতন্ত্র ব্যষ্টিচরিত্রের সৃষ্টি করিয়া থাকেন।"[২৫] অর্থাৎ individual চরিত্রচিত্রণ বস্তুতান্ত্রিকেরই শোভা পায়। গিরিশচন্দ্র ভাবতান্ত্রিক বা idealist বলেই সমকালীন গিরিশ-সমালোচকবৃন্দ বিশেষ মুগ্ধ ছিলেন। সেজন্যেই গিরিশচন্দ্রের এই অক্ষমতাকে গৌরবদান করতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথকে একটি অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত করতে হয়েছে—"প্রতিভাপ্রভাবে চিত্রিত স্বতন্ত্র চরিত্র (individual) যতই চিত্তহারী হউক, তাহা নাটকের উপযোগী নহে।"[২৬] অথচ সমালোচক একই গ্রন্থে কিছু পরেই লিখেছেন—"নাটকের লক্ষ্য চরিত্রের বিকাশ। সে স্বতন্ত্র হইয়াও কোন এক অদৃশ্য দৈবশক্তির অধীন। যখন প্রকৃতির প্রেরণা, প্রবৃত্তির উত্তেজনা, রিপুর দুরন্ত আবেগ, সংযমের বাঁধকে বালির বাঁধের মত ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং বাহিরের বাধায় বাধায় প্রবলতর হইয়া উঠে, চরিত্র তখনই নাটকীয় বিকাশের

উপযোগী।"[২৭] এখানে শ্রেষ্ঠ নাটকীয় চরিত্রের লক্ষণ হিসেবে যে বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে তা individuality বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেই নির্দেশ করে। অর্থাৎ সমালোচকের এ বক্তব্য পূর্ব সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। এ বৈপরীত্য কেন হলো ?

আসলে সমালোচক যখন "নাটকের লক্ষ্য চরিত্রের বিকাশ" বলে বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন তখন অনিবার্যভাবেই শেকসপীরীয় চরিত্রচিত্রণ পদ্ধতি তাঁর মনে থাকে। কিন্তু শেকসপীয়র দ্বারা অনুপ্রাণিত নাটকীয় চরিত্রের সংজ্ঞা গিরিশচন্দ্রে প্রয়োগকালে বাঁধে বিরোধ। [কেন না গিরিশসৃষ্ট চরিত্র কখনোই' প্রকৃতির প্রেরণা, প্রবৃত্তির উত্তেজনা, রিপুর দুরন্ত আবেগ সংযমের বাঁধকে 'ভাসিয়ে নিয়ে যায় না, এটি বিশেষ করে শেকসপীরীয় চরিত্রলক্ষণ। তাই সমালোচককে বাধ্য হয়েই নিজের রচিত সংজ্ঞাকে খণ্ডন করে সিদ্ধান্ত করতে হয় individual চরিত্র "নাটকের উপযোগী নহে।" গিরিশচন্দ্রের পক্ষে কেন যে individual চরিত্রচিত্রণ সম্ভব হয় নি, তার ফলে, তা আর বিশ্লেষণের প্রয়োজন থাকে না। আসলে গিরিশচন্দ্রের কাছে নাট্যরচনায় চরিত্র সৃষ্টি প্রধানস্থান অধিকার করে ছিলো না, তিনি বিশেষ আদর্শ প্রকাশের জন্যই বিভিন্ন চরিত্রের আশ্রয় নিয়েছেন এবং সেই আদর্শ ধর্ম ও নীতি দ্বারা আচ্ছন্ন।[২৮] Individual চরিত্র সৃজন গিরিশচন্দ্রের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিলো না।

পাঁচ

দ্বিজেন্দ্রলালও নাটক রচনায় individual চরিত্রসৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'কালিদাস ও ভবভূতি' প্রবন্ধের 'নাটকত্ব' নামক অংশে তিনি লিখেছেন —"অনুকূল বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নাটক লেখা তত শক্ত নহে। তাহাতে মনুষ্যহৃদয় সম্বন্ধে নাটককারের জ্ঞানেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আদর্শ চরিত্র ভিন্ন প্রত্যেক মনুষ্যচরিত্র দোষগুণে গঠিত। দোষগুলি বাদ দিয়া কেবলমাত্র গুণগুলি দেখাইলে একটি সম্পূর্ণ মনুষ্যচরিত্র দেখান হয় না।"[২৯] দ্বিজেন্দ্রলাল এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে Type চরিত্রকেই নির্দেশ করেছেন ও মন্তব্য করেছেন এধরনের চরিত্র নিয়ে নাটক লেখা 'তত শক্ত নহে'। নাটকে তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন individual চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতাকে। তাঁর বক্তব্য—"বিপরীত বৃত্তিসমূহের সমবায় দেখান অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব্যাপার ; এখানে নাটককারের কৃতিত্ব বেশী। যিনি মানুষের অন্তর্জগত উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত দার্শনিক কবি। বল ও দৌর্বল্য, জিঘাংসা ও করুণা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, গর্ব ও নম্রতা, ক্রোধ ও সংযম—এককথায় পাপ ও পুণ্যের সমাবেশে প্রকৃত উচ্চ অঙ্গের নাটক হয়।"[৩০] তিনি আরো লিখেছেন—"যে নাটককার একটি আদর্শ চরিত্র চিত্রিত করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার বিষয়ে স্বতন্ত্র কথা। তিনি মনুষ্য চরিত্র দেখাইতে বসেন নাই। তিনি দেবচরিত্র মনুষ্যচরিত্র কিরূপ হওয়া

উচিত—তাহাই দেখাইতে বসিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি 'নাটককারে ধর্মপ্রচার করিতে বসিয়াছেন। আমি এ গ্রন্থগুলিকে নাটক বলি না। ধর্মগ্রন্থ বলি।"৩১ 'কালিদাস ও ভবভূতি' প্রবন্ধটি ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। তখন বাঙলা নাট্যসাহিত্যে অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠপুরুষ বলে স্বীকৃত গিরিশচন্দ্র। দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশচন্দ্রের নাম উল্লেখ না করলেও নাটকে 'আদর্শ চরিত্র' সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে অনিবার্য ভাবেই গিরিশচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। কেননা গিরিশচন্দ্রের নাটকেই অনুরূপ আদর্শ চরিত্রের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। গিরিশচন্দ্রই ধর্মপ্রচারকে তাঁর নাট্যজীবনের অবশ্য কর্তব্য বলে স্বীকার করতেন। তাই গিরিশযুগের অপর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল সচেতনভাবে পূর্বসূরীর পথ পরিহার করতে চেয়েছেন। তিনি নাটকে 'আদর্শ চরিত্র' বা type রচনায় অনীহা প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর নাটকে চাণক্য, ঔরঙ্গজীব, নূরজাহান প্রভৃতি বিপরীত বৃত্তির সমবায়ে গঠিত চরিত্র সৃষ্টি করতে ব্রতী হয়েছেন। উপরোক্ত চরিত্রগুলোর অসাধারণ মঞ্চসাফল্যে মনে হতে পারে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর উদ্দেশ্যে সিদ্ধি লাভ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রসমালোচক রথীন্দ্রনাথ রায় অনুরূপ সিদ্ধান্তই করেছেন। চাণক্য চরিত্র সম্পর্কে তাঁর অভিমত: "অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতায়, ব্যক্তিত্বে, কুশাগ্রবুদ্ধিতে চাণক্য চরিত্রটি দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র। সংসার-বিতৃষ্ণ চাণক্য সৌন্দর্য, করুণা ও বিশ্বাসের স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। তাই তাঁর ব্রাহ্মণোচিত ক্ষমা সমবেদনা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি তিরোহিত হয়েছে—তার জায়গায় দেখা দিয়েছে জ্বলন্ত প্রতিহিংসাস্পৃহা ও নির্মম অবিশ্বাস। অবিশ্বাসী চাণক্য বীভৎসতার প্রেমিক হয়ে উঠলেন, শ্মশান হলো তাঁর নিত্যবিচরণের ক্ষেত্র। অবিশ্বাসী চাণক্যের মনে ছিল সুদৃঢ় মর্যাদাবোধ ও অহংচেতনার প্রাবল্য। জীবনের এমনি এক চরম মুহূর্তে চাণক্য তাঁর হৃত কন্যাকে ফিরে পেয়েছেন। অভিশপ্ত চাণক্যের এতদিনে মুক্তি ঘটেছে। ঈশ্বর-অবিশ্বাসী সংশয়বাদী চাণক্য জীবনের যে সহজ আনন্দ হারিয়েছিলেন, তাকে আবার যখন ফিরে পেলেন, তখন পৃথিবীর রঙ ও রূপ তার কাছে নূতন মহিমায় উদ্‌ঘাটিত হল।"৩২ অতএব সমালোচকের সিদ্ধান্ত—"চাণক্যের দ্বন্দ্বকুটিল চরিত্রসৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল মানব-জীবন রহস্যেরই এক সার্বজনীন ব্যঞ্জনা উদ্ভাসিত করেছেন।"৩৩ ঔরঙ্গজীব চরিত্র সম্পর্কেও তাঁর মন্তব্য— 'নাট্যকার ঔরঙ্গজীব চরিত্রের মধ্যেও দ্বন্দ্বের সঞ্চার করেছেন।"৩৪ অবশ্য সেই দ্বন্দ্বকে তিনি গভীর রসাশ্রয়ী বলেন নি, তবু চরিত্রটির "আপাত বিরোধী-বৃত্তি -সমন্বিত" বিচিত্রতার কথা উল্লেখ করেছেন।

সাধারণভাবে চরিত্রের গতিরেখা অনুসরণ করলে সমালোচকের সিদ্ধান্ত সঠিক মনে হবে। কিন্তু নাটকীয় চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তার পরিকল্পনায় (conception) নয়, প্রকাশের (execution) ক্ষমতায়। দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্র পরিকল্পনায় বিপরীত-বৃত্তিসমূহের সমবায় দেখিয়ে individuality প্রকাশের অভীপ্সা ছিলো, কিন্তু

ঐ বিষয়ে সাফল্য লাভ করেছিলেন কিনা সন্দেহ। এ প্রসঙ্গে চাণক্যের একটি একোক্তি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে :

চাণক্য। শুকরের মুখ, উর্ণনাভের ত্বক, শবদাহের গন্ধ, এরণ্ডের আস্বাদ, আর গর্দভের চীৎকার—একসঙ্গে কড়ায় চড়িয়েছি। দেখি কি দাঁড়ায়। নূতন রকম ব্যঞ্জন একটা কিছু তৈরী হবেই নিশ্চয়।—হে অদৃশ্য মহাশক্তি! কি মধুর পুঁতিগন্ধময় ভাগাড়ের মাঝখান দিয়ে আমার হাত ধরে নিয়ে চলেছ। বলিহারি! [বাহিরের দিকে চাহিয়া] উঃ। বাহিরে শিশিরবিন্দুগুলো জ্বলছে দেখ, যেন এক একটা স্ফুলিঙ্গ। আকাশ দাউ দাউ করে পুড়ে যাচ্ছে। আর আমি এই অগ্নির প্রবাহে গা ঢেলে দিয়েছি।" [চন্দ্রগুপ্ত : দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য]

সম্পূর্ণ সংলাপটি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় :

১ প্রথম বাক্যে জুগুপ্সা উদ্বেককারী পরিমণ্ডল গড়ে তোলবার জন্য এমন সব বিষয়ের অবতারণা [শুকরের মুখ, উর্ণনাভের ত্বক ইত্যাদি] করা হয়েছে যা খুব সহজে কারো মনে আসে না। এর এক কারণ হতে পারে, চাণক্য চরিত্রের বিকৃত মানসিকতা নাট্যকার এ বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, অথবা অন্য কারণ, কতকগুলো অস্বাভাবিক বস্তুর অবতারণা করে উপস্থিত চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিলো। দ্বিতীয় কারণটাই সঠিক বলেই মনে হয়, কেননা বস্তুগুলোর উল্লেখ বস্তুত সাজানো, স্বতঃস্ফূর্তভাবে চাণক্যের মনে আসে নি, নাট্যকার কৃত্রিম উপায়ে পরস্পরকে গেঁথে দিয়েছেন। উন্মত্ততার মধ্যেও শৃঙ্খলার প্রয়োজন, অতএব এ শেকসপীরীয় মহাবাক্য এখানে ব্যর্থ হয়েছে।

২. 'মধুর পুঁতিগন্ধময় ভাগাড়', 'শিশিরবিন্দুগুলো জ্বলছে'.'যেন এক একটা স্ফুলিঙ্গ' ইত্যাদি বাক্যাংশে বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে অলঙ্কার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু এখানেও নাট্যকারের প্রচেষ্টা খুব পরিণত হতে পারে নি, কেননা এর মধ্যে চমকপ্রদতার আভাস থাকলেও পরিণাম অত্যন্ত সাধারণ, ফলে নাটকীয়তা নিষ্ফল। অর্থাৎ পুরো সংলাপটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এখানে যে বৈপরীত্য সৃষ্টির প্রয়াস করা হয়েছে তা জৈব হতে পারে নি, যান্ত্রিক থেকে গেছে। আসলে চাণক্য চরিত্রটির মূল পরিকল্পনা নাট্যকারের যাই হোক না কেন, প্রকাশে তা দুর্বল। চরিত্রসৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল বিপরীত বৃত্তিসমূহের সমবায়ের ওপর জোর দিয়েছেন, কিন্তু শুধুমাত্র 'সমবায়েই চরিত্রে শ্রেষ্ঠত্ব আসে না,' তার জন্য প্রয়োজন বৃত্তিসমূহের রাসায়নিক মিশ্রণ। চাণক্য চরিত্রে এই রাসায়নিক সংমিশ্রণ ব্যাহত হয়েছে। উল্লিখিত একোক্তি বা সলিলকির পরে মঞ্চে আবির্ভূত হচ্ছে কাত্যায়ন—উদ্দেশ্য কূটনৈতিক আলোচনা। অতঃপর চাণক্য একেবারেই স্বাভাবিক—রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছেন, এমন কি চাণক্য শ্লোক—যা অত্যন্ত গূঢ় চিন্তাশক্তি ও চিরন্তন সত্যের প্রকাশক—"মনসা চিন্তিতং কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ"—নাট্যকার তাঁকে

দিয়ে বলিয়েছেন। তারপরেই আকস্মিকভাবে তাঁর অপ্রকৃতিস্থতার কথা মনে পড়ে গেছে—গণিকা বা প্রেয়সীর উল্লেখ হয়েছে। আবার তারপরেই দীর্ঘ অংশ চাণক্য কাত্যায়নের সঙ্গে পাণিনি নিয়ে অকারণ রসিকতা করেছেন। অর্থাৎ এই দৃশ্যে চাণক্যের একোক্তি থেকে শুরু করে কাত্যায়নের প্রস্থান পর্যন্ত নাট্যাংশে চাণক্য চরিত্রে কোনো রৈব পারম্পর্য নেই। এই পারম্পর্যহীনতা যদি হতো আভ্যন্তরীণ বিকাশের ফল,— তা'হলে তাঁর অপ্রকৃতিস্থতাকে নাটকীয় স্বাভাবিকতা বলে স্বীকার করা যেতো। চাণক্যের উন্মত্ততা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও পরিহাস প্রিয়তা ক্রমানুসারে প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু তা নাট্যকারের আরোপিত বলে সঙ্গতিহীন ও কৃত্রিম হয়েছে। উপরন্তু তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা বা পরিহাসপ্রিয়তার মধ্যেও বিশেষ স্বকীয়তার সুযোগ নাট্যকার দেন নি। কেন না, নন্দের বৃদ্ধমন্ত্রী পরাজয় অনিবার্য জেনে চন্দ্রগুপ্তের কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসবে তা স্বাভাবিক। সেখানে চাণক্যের উপস্থিতি বিরোধীপক্ষের কাম্য হতে পারে না, যেহেতু তারা জানে এই যুদ্ধযজ্ঞের মূল হোতা চন্দ্রগুপ্ত নয়, চাণক্য। অসাধারণ বুদ্ধিমান ও কূটনীতিবিশারদ চাণক্য—নাট্যকার যাঁকে মেকিয়াভেলীর সমতুল্য মনে করেন—তাদের এই কার্যে 'খাসা চাল চেলেছে' সংলাপটি বার বার বলে উৎফুল্ল হয়েছেন, অথচ এটা যে বিরোধীদের খুবই একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক চাল তা স্বীকার করেন নি। এবং সাধারণ একটি চালকে 'খাসা' বলে বার বার অভিহিত করায় চাণক্যের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা খুব একটা প্রকাশ পায় না। অথচ নাট্যকার চাণক্যকে দিয়ে তাই করিয়েছেন, ফলে কূটনীতিজ্ঞ হিসেবে চাণক্য চরিত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না।

অথবা, ধরা যাক, পরবর্তী অংশে পাণিনি নিয়ে কাত্যায়নের সঙ্গে তাঁর রসিকতা। রসিকতাটি নাটকে তখন স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে না। চাণক্যের প্রশ্ন—'তুমি নন্দের এই মন্ত্রীকে জান ?'—রাজনৈতিক প্রশ্ন। কিন্তু তারপরেই পাণিনির প্রবেশ ও রসিকতার শুরু। দ্বিজেন্দ্রলাল কাত্যায়ন চরিত্রটিকে পাণিনিপাগল করেছেন এবং স্থানে অস্থানে তা দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করার প্রয়াসী হয়েছেন। এখানেও তার ব্যত্যয় হয় নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, তারপর ছাব্বিশটি সংলাপে—তার মধ্যে কিছু দীর্ঘ সংলাপও রয়েছে—তাঁরা রাজনীতি ভুলে পাণিনিতে মত্ত থেকেছেন এবং কাত্যায়নের প্রস্থানের সময় পর্যন্ত চাণক্যের আর নন্দের মন্ত্রী সম্পর্কে কোনো কৌতূহল জাগে নি। নাট্যকারবর্ণিত পূর্ববর্তী অংশের বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ চাণক্যের এই বিস্মৃতি তাঁর চরিত্রটিকে বিশেষ গভীর করে তোলে নি।

অর্থাৎ চাণক্যের মধ্যে 'বিপরীত বৃত্তির সমবায়' দেখিয়ে নাট্যকার একটি বিকাশশীল individual চরিত্রসৃষ্টিতে আগ্রহী হয়েছিলেন, কিন্তু উপরোক্ত কারণে তাতে বিশেষ সাফল্যলাভ করেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রচিত্রণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"শেকসপীয়রের নাটক রচনার অনুকরণে বাঙলাদেশে

অনেকেই নাটক রচনা করিয়াছেন। শেকসপীয়রের চরিত্র-সৃষ্টির আদর্শ বাঙলার অনেক নাটকেই দেখিতে পাওয়া যায়।...দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রগুলি অনেকক্ষেত্রে উজ্জ্বল, কিন্তু সেগুলি রসসৃষ্টির বিচারে শেকসপীয়রের অনেক নিম্নে। শেকসপীয়রের চরিত্র-সৃষ্টিতে মানস-আদর্শ প্রধান হইলেও সেগুলির স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রগুলি সবই যেন একই প্রকারের। দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মকেন্দ্রিক মনোধর্ম মনুষ্যত্ব বিকাশের দিকে যতটা সচেতন, বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির দিকে ততটা নয়। তাই চাণক্য, সাজাহান, নূরজাহান, শক্তসিংহ প্রভৃতির যে রূপ ফুটিয়াছে, তাহা তাহাদিগের স্বধর্মে ততখানি হয় নাই, যতখানি হইয়াছে দ্বিজেন্দ্রলালের মনোধর্মে।"[৩৫] সমালোচকের এ মন্তব্য দ্বিজেন্দ্রলালের individual চরিত্রসৃষ্টির অক্ষমতার প্রতি নির্দেশ করে।

ছয়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যজীবনের প্রথম পর্বে individual চরিত্রসৃষ্টির প্রতি আগ্রহী ছিলেন। বিক্রম, সুমিত্রা, গোবিন্দমানিক্য, রঘুপতি, জয়সিংহ, ক্ষেমঙ্কর-মালিনী-সুপ্রিয়, চিত্রাঙ্গদা-অর্জুন-তাঁর সেই প্রয়াসেরই প্রকাশ। উপরোক্ত পুরুষচরিত্রগুলোর মধ্যে বিক্রম, রঘুপতি বা ক্ষেমঙ্কর অত্যন্ত assertive, গোবিন্দমানিক্য ব্যক্তিত্বপূর্ণ কিন্তু মৃদুস্বভাবসম্পন্ন এবং জয়সিংহ ও অর্জুন Passive চরিত্র। কাজেই উগ্র ব্যক্তিত্ব প্রথম তিনজনের মধ্যে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, পরবর্তী তিন চরিত্রে তার প্রকাশভঙ্গী পৃথক। এদের মধ্যে আবার গোবিন্দমানিক্য ও অর্জুন প্রকাশধর্মী চরিত্র—অর্থাৎ নাট্যক্রিয়ার ঘাতপ্রতিঘাতে উভয়ের চরিত্রে এমন কিছু গুণগত পরিবর্তন ঘটে নি। জয়সিংহেও পরিবর্তন সামান্যই—তাকে অবশ্য প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়তে হয়েছে, কিন্তু তাতে চরিত্রের গুণগত পরিবর্তন বিশেষ ঘটে নি। ক্ষেমঙ্কর উগ্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন assertive চরিত্র হলেও বিকাশধর্মী নয়, কেননা তার চরিত্রেও গুণগত পরিবর্তন অলক্ষ্য। বিক্রমদেব ও রঘুপতি প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, assertive এবং বিকাশধর্মী চরিত্র—নাট্যক্রিয়ার ঘাত-প্রতিঘাতে তাদের গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। উভয়ের মধ্যে রঘুপতি নাট্যকারের মানস সমর্থন পায় নি। একটি আকস্মিক ঘটনা—জয়সিংহের আত্মদান—তাকে নতুনতর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করেছে, তাই তার উত্তরণ আরোপিত, আভ্যন্তরীণ বিকাশের ফল নয়। বিক্রমদেব নানাদিক থেকেই রবীন্দ্রসৃষ্ট নাট্যচরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। বিক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক নানা মন্তব্য করেছেন। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেন মনে করেন, "ট্র্যাজেডির, বিশেষত রোমান্সমূলক ট্র্যাজেডির নায়কের খানিকটা মানসিক ঔদার্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব থাকা দরকার। বিক্রমের চরিত্রে তাহা নাই"—[৩৬]

নাট্য—১১

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—"বিক্রমদেবের চরিত্রের মধ্যে এমন কোন গুণ নাই, যাহা পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে ; অথচ এই শ্রেণীর নায়ক চরিত্রের বিশেষ কোন না কোন গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন।"[৩৭] বিক্রম চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য তার আসক্তি ও আবেগ। এই আসক্তি ও আবেগ তার চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করেছে ফলে যেদিকেই তার মন প্রধাবিত হয়েছে—রানী সুমিত্রার প্রতি রূপজ মোহই হোক বা তার বিরুদ্ধে অভিমানই হোক—তার গতিবেগ অত্যন্ত তীব্র হয়েছে। এই একাভিমুখী চৈতন্য-আচ্ছন্নকারী চরিত্রবেগ সংবৃত হয়েছে, প্রথমত,—রেবতীর মুখদর্পণে আত্মপ্রতিকৃতির বিম্বদর্শনে, দ্বিতীয়ত—ইলার একনিষ্ঠ প্রেমের মাধুর্য উপলব্ধি করে। রাজগৃহ ছেড়ে সুমিত্রার পলায়ণ তার মনে এই সন্দেহ রোপিত করেছিলো যে সম্ভবত জীবনে প্রেমের এক নষ্ঠতার কোন মূল্য নেই এবং সেজন্যেই সে পৃথিবীর ধ্বংসসাধনে উন্মত্ত হয়েছিলো। কিন্তু ইলার সঙ্গে পরিচয়ে প্রেমের এক নষ্ঠতার প্রতি তার আস্থা ফিরে এসেছে। এবং নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই অস্তিবাচক জীবনদর্শনে সে উপনীত হয়েছে বলে নাটকের প্রথম দিকে তার চরিত্রের মধ্যে যে অবিমৃষ্যকারিতা ও আবেগের অন্ধত্ব, শেষ দৃশ্যে তা বিদূরিত হয়েছে। তাই পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে সে যখন সুমিত্রার জন্য মানসিক প্রস্তুত নিয়ে অপেক্ষা করছিলো তার চরিত্রের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিলো। অবশ্য তার পরবর্তী বিপর্যয়—সুমিত্রার মৃত্যু—পরিস্থিতির অবদান, বিক্রমের পূর্বকৃত কার্যাবলীর ফল, তাই তার পক্ষে সুমিত্রার প্রেমস্পর্শলাভ করা আর সম্ভব হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিক্রম চরিত্রের উত্তরণ তাকে বিকাশধর্মী individual চরিত্রে পরিণত করেছে।

এ পর্যায়ের রবীন্দ্রনাটকে উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র সুমিত্রা, চিত্রাঙ্গদা ও মালিনী। এদের সকলের মধ্যেই বিকাশধর্মী ঝোঁক থাকলেও তারা মূলত প্রকাশধর্মী চরিত্র। অবশ্য ত্রয়ীচরিত্রই বিশিষ্ট রবীন্দ্রজীবনাদর্শের প্রকাশক, ফলে তাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব থাকলেও ভাবপ্রাধান্য লক্ষ্য করার মতো এবং সম্ভবত সেকারণেই Edward Thompson রবীন্দ্রনাটককে Vehicle of ideas[৩৮] বলেছেন। 'রাজা ও রানী' সম্পর্কে তিনি আরো মন্তব্য করেছেন—"The drama is concentrated, living in the hearts and thoughts and words of a very few characters, sometimes one or two only. There is little differentiation of characters.[৩৯]

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মালিনী রচনার সঙ্গে রবীন্দ্র নাটকের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি। এর পর থেকেই, পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, রবীন্দ্র নাট্যমানসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিলো। তিনি বুঝেছিলেন সমকালীন সমাজের কর্মজীবনে পুরুষের সক্রিয়তা যথার্থ না হলে উপযুক্ত individual চরিত্র নাটকে চিত্রণ করা সম্ভব নয় এবং বাঙালীর সমাজগঠন এরূপ তাতে নারীচরিত্রের বিকাশ অন্তঃপুরের বাইরে সঠিক ব্যক্তিত্ব লাভে

সক্ষম হয় না। এ সম্পর্কে তাঁর সমকালীন চিন্তা 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের অন্তর্গত 'নরনারী'[৪০] প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'নরনারী' প্রবন্ধটি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। 'চিত্রাঙ্গদা'ও প্রকাশিত হয়েছিলো একই বছরে। 'চিত্রাঙ্গদা' রচনার সমকালেই রবীন্দ্রনাথ বাঙলা নাটকের চরিত্র চিত্রণে ব্যক্তিত্ব বিকাশের দুর্বলতা নিয়ে চিন্তিত হয়েছিলেন। নরনারী প্রবন্ধটি তারই প্রকাশ। অবশ্য প্রবন্ধটি বিভিন্ন ব্যক্তির কথোপকথনরূপে লিখিত বলে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে। তাহলেও রবীন্দ্র বক্তব্যের সূত্র ধরে কিছু প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া হল :—

১। ···বাঙলা সাহিত্যে দেখা যায় নায়িকারই প্রাধান্য। কুন্দনন্দিনী এবং সূর্যমুখীর নিকট নগেন্দ্র ম্লান হইয়া আছে, রোহিণী এবং ভ্রমরের নিকট গোবিন্দলাল অদৃশ্যপ্রায়, জ্যোতির্ময়ী কপালকুণ্ডলার পার্শ্বে নবকুমার ক্ষীণতম উপগ্রহের ন্যায়। প্রাচীন বাঙলা কাব্যেও দেখো।···কবিকঙ্কণ চণ্ডীর সুবৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থাণু মাত্র এবং ধনপতি ও তাঁহার পুত্র কোন কাজের নহে।

২। মানসজগতে স্ত্রীলোকের প্রভাব অধিক, কার্যজগতে পুরুষের প্রভুত্ব। যেখানে কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তির কথা সেখানে পুরুষ স্ত্রীলোকের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কেন কার্যক্ষেত্রেই তাহার চরিত্রের যথার্থ বিকাশ হয়।

৩। মনুষ্য চরিত্র বড়ো সিধা জিনিষ নহে। তুমি যুক্তিবলে ভাবপ্রধান কর্মপ্রধান প্রভৃতি তাহার যেমনই অকাট্য সীমা নির্ণয় করিয়া দেও না কেন, বিপুল সংসারের বিচিত্র কার্যক্ষেত্রে সমস্তই উলট পালট হইয়া যায়। সমাজের লৌহকটাহের নিম্নে যদি জীবনের অগ্নি না জ্বলিত, তবে মনুষ্যের শ্রেণীবিভাগ ঠিক সমান অটলভাবে থাকিত। কিন্তু জীবনশিখা যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন টগবগ করিয়া সমস্ত মানবচরিত্র ফুটিতে থাকে তখন নব নব বৈচিত্র্যের আর সীমা থাকে না। সাহিত্য সেই পরিবর্তমান মানবজগতের চঞ্চল প্রতিবিম্ব।·· হৃদয় বৃত্তিতে স্ত্রীলোকই শ্রেষ্ঠ এমন কেহ লিখিয়া পড়িয়া দিতে পারে না। ওথেলো তো মানসপ্রধান নাটক, কিন্তু তাহাতে নায়কের হৃদয়াবেগের প্রবলতা কী প্রচণ্ড! কিং লিয়ারে হৃদয়ের ঝটিকা কী ভয়ংকর।

৪। বঙ্গদেশে পুরুষের কোনো কাজ নাই। এ দেশে গার্হস্থ্য ছাড়া আর কিছু নাই সেই গৃহগঠন এবং গৃহবিচ্ছেদ স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে।·· আমাদের দেশে পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্নীচালিত। কোনো বৃহৎ ভাব, বৃহৎ কার্য, বৃহৎ ক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদের জীবনের বিকাশ হয় নাই; অথচ অধীনতার পীড়ন, দাসত্বের হীনতা, দুর্বলতার লাঞ্ছনা তাহাদিগকে নতশিরে সহ্য করিতে হইয়াছে।

৫। পুরুষের জীবনের ক্ষেত্র বৃহৎ সংসারে, সেখানে সাধারণ মানুষের ভুলচুক ত্রুটি

বেশি পরিমাণেই হইয়া থাকে। বৃহত্তের উপযুক্ত শক্তি সাধনাসাপেক্ষ, কেবলমাত্র সহজ বুদ্ধির জোরে সেখানে ফল পাওয়া যায় না।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে কয়েকটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত অভিমত অত্যন্ত স্পষ্ট। পুরুষ চরিত্র তখনই সাহিত্যে, বিশেষ করে নাটকে সার্থকভাবে বিকাশলাভ করতে পারে, যখন সমকালীন সমাজ কর্মমুখর। নারীচরিত্র বাইরের কার্যক্ষেত্রে বিকশিত হতে পারে বটে কিন্তু তার স্বচ্ছন্দ বিহারের ক্ষেত্র অন্তঃপুর। মনে রাখতে হবে, এই প্রবন্ধের রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দী, তখনো বহির্বিশ্বে বাঙালী রমণীর বিচরণ সম্ভব হয় নি। স্ত্রী-চরিত্রের প্রাধান্য নিয়ে উপন্যাস রচিত হতে পারে, কেন না ক্রিয়া ও দ্বন্দ্ব উপন্যাসের মূল উপজীব্য নয়। কিন্তু নাটকে পুরুষ চরিত্রের প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী এবং কোনো নাট্যকার স্ত্রীচরিত্র অবলম্বনে নাটক লিখলেও তাকে বহির্বিশ্বের বিচিত্র কর্মতরঙ্গে স্থাপিত করতে হয়। বাঙলাদেশে তা কখনোই সম্ভব ছিলো না, এমন কি "বঙ্গদেশে পুরুষের কোনো কাজ নাই'। অথচ "পুরুষের জীবনের ক্ষেত্র বৃহৎ সংসারে।" 'প্রসঙ্গত পাশ্চাত্য সাহিত্যের ওথেলো এবং লিয়রের কথা উল্লিখিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে না বললেও আলোচনায় একথা প্রকাশিত যে তিনি মনে করেন পাশ্চাত্য জীবনদ্বন্দ্ব অনুরূপ চরিত্রসৃজনে সহায়তা করেছিলো।

সমকালীন বাঙালীর সমাজজীবনে সঙ্গত কারণেই বিচিত্র কর্মদ্বন্দ্বের বিশেষ সুযোগ ছিলো না।* তাই বাঙলানাট্যসাহিত্যে উপযুক্ত পুরুষ চরিত্র সৃজন ছিলো অসম্ভব, কারণ—"কার্যক্ষেত্রেই তাহার চরিত্রের যথার্থ বিকাশ হয়।" মালিনী রচনার পর, পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, প্রায় এগারো বারো বছর রবীন্দ্রনাথ কোনো পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন নি। এত দীর্ঘ বিরতি তাঁর নাট্যজীবনে আর আসেনি। অন্তর্বর্তী সময়ে নাটকের form ও content-য়ের সমস্যা তাঁকে নিশ্চয় ভাবিয়েছিলো। অবশেষে তিনি বাঙলাদেশে প্রচলিত নাট্যরচনাপদ্ধতি পরিহার করলেন। ব্যক্তিতে কেন্দ্রীভূত জীবনদ্বন্দ্ব থেকে দৃষ্টি ফেরালেন সমষ্টির দ্বন্দ্বতে, শ্রেণীগত সমস্যায়। অবশ্য এই সমস্যা বিশেষভাবে রবীন্দ্রমানসজাত শ্রেণীসমস্যা, কোনো প্রচলিত রাজনৈতিক সংজ্ঞায় একে স্থাপিত করা চলে না। শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রাধান্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যকারের লক্ষ্য ব্যক্তিচরিত্র থেকে চ্যুত হয়ে সমষ্টি চরিত্রে স্থাপিত হলো। বাঙলা নাট্যসাহিত্যে শুরু হলো নতুন ধরনের চরিত্র চিত্রণ।

সাত

রবীন্দ্রনাটকে চরিত্রচিত্রণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশ্লেষণের পূর্বে সমকালীন ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ইউরোপের

---

* প্রথম অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে।'

বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে জার্মানী ও ফ্রান্সের নাট্যসাহিত্যে তখন সাধারণ মানুষের পদধ্বনি শোনা গিয়েছে। এর আগে যে সকল নাটক রচিত হয়েছিলো তার নায়ক ও প্রধান চরিত্রগুলো ছিলো মূলত উচ্চ বা নিম্নমধ্যবিত্ত, কিন্তু ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে খ্যাতনামা জার্মান নাট্যকার গেরহার্ট হাউপটম্যান রচিত The Weavers বা 'তাঁতি সম্প্রদায়' নাটকটি দ্বন্দ্ববিকাশ ও চরিত্রচিত্রণের প্রচলিত সকল ধারণাকে বিপর্যস্ত করে দিলো। "The Weavers was utterly unique both in concept and technique. In general the realistic drama had been tending in the direction of economy in the use of characters; it was no uncommon thing to find, in the early nineties, dramas restricted to three or four main persons; here Hauptmann suddenly set a whole crowd upon the stage, and, in addition, made that crowd the hero of the drama.[৪১] ' অবশ্য এর আগে শীলার বা বুখনার জনতাকে নাটকের কেন্দ্রে স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, কিন্তু হাউপটমানে এসে তা একটি বৈপ্লবিক তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিলো। সম্ভবতঃ এর থেকেই প্রভাবিত হয়ে বিখ্যাত ফরাসী লেখক রোমাঁ রোলাঁ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে একটি নাটক লিখলেন The Fourteenth of July। তাঁর রচিত পূর্ববর্তী নাটক Danton-য়ের সঙ্গে এ নাটকটির তুলনা প্রসঙ্গে ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—"In that play, he applied himself to the development of the psychology of certain characters, for the whole drama is concentrated in the souls of three or four great men. It is otherwise with the present work: individual disappear in the great ocean of the people.[৪২] এখানে থেকেই রোমাঁ রোলাঁ নাট্য আন্দোলনের একটি নতুন সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে The People's Theatre বা 'গণনাট্য' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। এবং এ সিদ্ধান্ত সম্ভবত অযৌক্তিক হবে না যে রোলাঁর People's Theatre থেকেই ইউরোপীয় নাট্য আন্দোলনের একটি ধারা জর্মান প্রযোজক এরউইন পিসকাতোরের The Political Theatre-য়ের প্রান্ত ছুঁয়ে বেরটোল্ট্ ব্রেখটের Epic Theatre-য়ে পৌঁছেছিলো।

ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধকালে জর্মানীতে একটি নতুন নাট্য আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেছিলো। ইতিহাসে তা Expressionism বা 'অভিব্যক্তিবাদ' বলে বিখ্যাত হয়ে আছে। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন খ্যাতনামা নাট্যকার কাইজার, টলার প্রভৃতি অনেকেই এ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বেরটোল্ট্ ব্রেখটও তাঁর নাট্যজীবনের প্রারম্ভে অভিব্যক্তিবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

Expressionism বা অভিব্যক্তিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে Lynton Hudson একটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন—"The 'dramatis personae' are rather abstractions than individuals, and are supplemented by Group Figures."[৪৩] রবীন্দ্র সাংকেতিক নাটকে অভিব্যক্তিবাদ প্রভাব বিস্তার করেছিলো বলে অশোক সেন একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন। অভিব্যক্তিবাদের অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে না মিললেও অন্তত চরিত্রচিত্রণে Group Figure-য়ের প্রাধান্য রবীন্দ্র সাংকেতিক নাটকে লক্ষণীয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে হাউপটমানের The Weavers নাটকটি রচিত হয়েছিলো ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে। নীলদর্পণের রচনাকাল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ The Weavers-য়ের বত্রিশ বছর আগে। উভয় নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে দূরান্বয়ী সাদৃশ্য সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। হাউপটমানের নাটকের মতো নীলদর্পণেও সাধারণ মানুষের ভিড় লক্ষ্য করার মতো। বস্তুত নাটকটিতে রাইয়তগণ একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে আছে। নাটকে উপস্থাপিত সমস্যাও মূলত শ্রেণীগত। তা সত্ত্বেও দীনবন্ধু মিত্র, গোলোকচন্দ্র বসু ও তার পরিবারের উপর অধিক মনোযোগ প্রকাশ করেছেন। ফলে নাটকের দৃষ্টিকোণ সঠিকস্থানে নিবদ্ধ হতে পারে নি। সে কারণেই গোলোকচন্দ্র ও তার পরিবারের অন্তর্গত চরিত্রগুলোকে নাটকটিতে ভারস্বরূপ মনে হয়। দীনবন্ধু যে বিষয় (Content) অবলম্বন করেছিলেন, অভ্যস্ত শেকসপীরীয় আঙ্গিকে (form) তিনি নিবদ্ধ না থেকে যদি নতুনতর আবিষ্কার করতেন —যেমন করেছিলেন হাউপটমান—তাহলে বাঙলানাট্য-সাহিত্যের সৃষ্টিলগ্নেই এক বিরাট সম্ভাবনার সূত্রপাত হতো। এবং তা ইউরোপের পূর্বেই।

আট

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাংকেতিক নাটক 'শারদোৎসব'। রচনাকাল ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ। এ নাটকটি থেকেই রবীন্দ্রনাথের চরিত্রচিত্রণে গুরুতর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন' প্রভৃতি নাটকে জনতার ভিড় থাকলেও তারা সেখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকারে সক্ষম হয় নি। কখনো কমিক রিলিফ, কখনো বৈচিত্র্যের জন্য তারা নাটকে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু শারদোৎসবে ছেলেদের ভিড় Group Figure হিসেবে নাটকে প্রধান স্থান অধিকার করেছে। এবং উপনন্দ, লক্ষেশ্বর, ঠাকুরদা বা রাজা বিজয়াদিত্য কিছু ব্যক্তি লক্ষণে চিহ্নিত হলেও ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। তারা কেউ নাটকে individual হয়ে দেখা দেয়নি, পরস্পরের মধ্যে একটি আশ্চর্য সঙ্গতিস্থাপন করে দ্যুতিময় ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পরবর্তী নাটক 'রাজা' (১৯১০)। সমগ্র নাটকটিতে ক্রিয়া সুদর্শনা ও অদৃশ্য রাজা (এবং সুরঙ্গমা)-কে ঘিরে আবর্তিত হলেও তারা নাটকে খুবই স্বল্প পরিসর

অধিকার করে আছে। নাটকটিতে সর্বসাকুল্যে বিশটি দৃশ্য আছে, তিনটি মাত্র অন্ধকার ঘরে। কিন্তু নাটকটির অধিকাংশ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়েছে বহিরাঙ্গনে (outdoor), সাতটি দৃশ্যই পথে স্থাপিত। এবং সেখানে ঠাকুরদাদা ও তার দলবল প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। Edward Thompson যখন লেখেন…"…Grandfather in just a nuisance [88], তার দলবলের সাহায্যে সে spoils everything [8৫], তখন স্পষ্টই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় সম্পর্কে সমালোচক নিদারুণভাবে অজ্ঞ।

আসলে, 'শারদোৎসব' বা 'রাজা' রবীন্দ্রনাট্য ধারার ক্রান্তিকালে অবস্থিত। তখন পুরোনো পথ পরিত্যক্ত হয়েছে, নতুন সরণী অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি। কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথ সমষ্টির সমস্যায় প্রবেশে উন্মুখ হয়ে ব্যক্তিচরিত্র নিয়ে ব্যস্ত না থেকে যখন Group Characters-এর প্রতি মনোনিবেশ করেন, তখন তিনি নির্ভুলভাবেই আধুনিক যুগের অন্ততঃ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তাঁর নাটকে প্রতিফলিত করেন।

খ্যাতনামা মার্কিন সমালোচক আধুনিক নাটকে চরিত্রচিত্রণে অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—We cannot deny that modern authors employing a mass-hero have tended to reduce the dimensions of individual characters…And the granting of primacy to environment has reduced the stature of the individual even in other plays in which there is no collective hero…Many characters have represented men rather than Man"[8৬] এবং সমালোচকের মতে এ সূত্র ধরেই এপিক থিয়েটারের চরিত্রচিত্রণ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। জন গ্যাসনারের মতে— "Whether factual on imaginative in subject-matter as well as treatment, epic theatre represents a revolutionary twentieth-century departure from the essentially settled, individually oriented, emotion-based middle-class world of realistic drama of the nineteenth century. That drama tended to present the individual as an end in himself ; epic realison, however, may be in some jeopardy whenever the sympathy of the playwright creates rounded and moving characterization.[8৭] রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, এপিক থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিলো কিনা সন্দেহ, কিন্তু তবু তিনি যখন চরিত্রচিত্রণে, অবশ্যই স্বকীয় পদ্ধতিতে, বিশ শতকীয় নাট্যবৈশিষ্ট্যে উপনীত হন, তখন তাঁকে সমকালীন নাট্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না।

রবীন্দ্রনাথের এ পর্যায়ের নাটকের মধ্যে একমাত্র 'ডাকঘর' ব্যতীত প্রত্যেকটিতেই Group character-এর প্রাধান্য। এবং ডাকঘরেও অমলের উজ্জ্বল উপস্থিতি সত্ত্বেও বহির্বিশ্বের জনজীবন উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। অতঃপর 'অচলায়তন'

থেকে শুরু করে 'রক্তকরবী' পর্যন্ত, নাটকগুলিতে ধীরে ধীরে ব্যক্তিনাম হ্রাস পেয়েছে, মানুষ তার ব্যক্তি-পরিচয় (individual identity) হারিয়ে সমগ্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং 'কালের যাত্রা'তে উপনীত হয়ে ব্যক্তিনাম একেবারে বিলুপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ চরিত্রগুলো সম্পূর্ণরূপে শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়েছে।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের চরিত্রচিত্রণ পদ্ধতি Group characters বা Collective hero—যা বিশ শতকীয় ইউরোপীয় নাটকেও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—সাম্প্রতিক কালে কিছু সমালোচকের অনুমোদন লাভ করে নি। জন গ্যাসনার মন্তব্য করেছেন—"With dissolution of character in our century, we come to the true age of decadence. It is not obscenity, morbidity or 'undue fascination with death and decay that undermines the drama—these are but concomitant characteristics—but the disappearence of man himself, in the theatre.[৪৮] এবং তার মতে "Depersonalization has been the gravest threat to our theatre.[৪৯] অর্থাৎ নাটকের চরিত্রচিত্রণে রবীন্দ্রনাথ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন সমালোচক তাকেই আধুনিক থিয়েটারের পক্ষে gravest threat বলে অভিহিত করেছেন। সমালোচকের এ উৎকণ্ঠার কারণ আছে। বিশ শতকীয় নাট্য আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী পুরুষ হলেন বেরটোল্ট ব্রেখ্‌ট। তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী। তাই অনিবার্যভাবেই তাঁর নাটকে সাধারণ মানুষের পদসঞ্চার ও বিজয়বার্তা কোনো কোনো মহল অপছন্দ করে থাকেন। নাট্যকার G. B. Priestly লিখেছেন—So Bert Brecht because of his Marxist outlook, wanted to remove the drama from the private life, give it an historical sweep, make it suggest the fate of whole classes, and poduced his so-called Epic Theatre, which sacrifices mearly everything I want in a play-house.[৫০] এবং তাঁর ঘোষণা—"If I were beginning again, I would move in opposite direction, towards more elaborate construction and even a greater intimacy, taking a few characters through an intricate and ironic dance of relationships.[৫১] অর্থাৎ প্রিস্টলী সাহেব মনে করেন এপিক থিয়েটারে সমগ্র শ্রেণীর ওপর গুরুত্ব দেবার ফলে নাটক Sacrifices nearly everything, কাজেই তিনি বিপরীত দিকে সঞ্চরণ করবেন এবং সামান্য কয়েকটি চরিত্র ও তাদের intricate and ironic dance of relationship-এর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবেন। প্রিষ্টলি সাহেবের এই অভিমত যথার্থ কি না সে বিচারে না গিয়েও আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি আধুনিক কালের দুটি বিশেষ, নাট্য আন্দোলনের ধারার কথাই ব্যক্ত করেছেন। এবং রবীন্দ্রনাট্যধারা নিঃসন্দেহে প্রিস্টলিসাহেব ও তাঁর সহগামীদের বিপরীত। সাংকেতিক নাটকের চরিত্রচিত্রণে Group characters বা Collective hero-র প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনস্কতা সেই ইঙ্গিতই বহন করে।

১ S. L. Bethell :—Shakespeare & The Popular Dramatic Tradition.
(P. S. King & Staples : 1944) P. 79

২ Op. cit—P. 79
৩ দেবেন্দ্রনাথ বসু শকুন্তলায় নাট্যকলা (বরেন্দ্র লাইব্রেরী : তারিখ নেই) পৃ. ১৩৮
৪ তদেব—পৃ. ১৩৮
৫ Eric Bentby : The Life of Drama. (Mathuen & Co : 1965) P. 14
৬ নীরেন্দ্রনাথ রায় : সাহিত্যবীক্ষা—. ৬৫
৭ তদেব—পৃ. ৬৪
৮ Inving Ribner : Patterns in Shakespearian Tragedy—P. 4
৯ A. B. Keith : The Sanskrit Drama—P. 306
১০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় : মৃচ্ছকটিক (সমালোচনার সাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) পৃ. ৪১০
১১ সাধনকুমার ভট্টাচার্য : নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা (বিদ্যোদয় ১৯৬৩)—পৃ. ২৩২
১২ Bentley : op. cit—P. 41
১৩ ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত : কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী
১৪ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—পৃ ৩৩৯
১৫ Lajos Egri : The Art of Dramatic Writing—P. 60-61
১৬ ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত : নাট্যকার মধুসূদন [গ্রন্থনিলয়]
১৭ ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত : মধুসূদন, কবি ও নাট্যকার—পৃ. ১৪১
১৮ Alfred Von Martin : Sociology of the Renaisoance
(Kegan Paul : 1945) P. 5-6

১৯ Op. cit—P. 6
২০ Op. cit—P. 20
২১ ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য : নাটক ও নাটকের অভিনয়—পৃ. ১৭-১৮
২২ F. L. Lucas : Tragedy (Hogarth Press : 1935) P. 113
২৩ ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত : কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী—পৃ. ১৪৯
২৪ কুমুদবন্ধু সেন : গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য—পৃ. ৭৩
২৫ দেবেন্দ্রনাথ বসু : গিরিশচন্দ্র (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৩৯) পৃ. ২৩ ২৪
২৬ তদেব—পৃ. ২৪
২৭ তদেব—পৃ. ২৮-২৯
২৮ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ : বাঙলা নাটকের ইতিহাস—পৃ. ১৩৮
২৯ দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী—পৃ. ৬৫৩
৩০ তদেব—পৃ, ৬৫৩
৩১ তদেব—পৃ. ৬৫৩
৩২ রথীন্দ্রনাথ রায় : দ্বিজেন্দ্রলাল, কবি ও নাট্যকার—পৃ. ৩৩১-৩৩৩
৩৩ তদেব—পৃ. ৩৩৩
৩৪ তদেব—পৃ. ৩৩৪
৩৫ বিভাস রায়চৌধুরী—নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা (বুক এম্পোরিয়ম : ১৩৫৩)—পৃ. ৩৬
৩৬ ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : তদেব—পৃ. ২২২

৩৭ ডা আশুতোষ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রনাট্যধারা—পৃ. ১৬৭

৩৮ Edward Thompson : Rabindranath Tagore—Poet & Dramatist (O. U. P.—1926)—P. 94

৩৯ Op. cit—P. 95

৪০ রবীন্দ্ররচনাবলী : ১৪শ খণ্ড—পৃ. ৬৪০-৬৪৮

৪১ Nicoll : Wo1ld D1ama (Harrap : 1961) P. 578

৪২. Romain Rolland : The Fourteenth of July (Geo1ge Allen : 1928) P. 19

৪৩ Lynton Hudson : Life and the Theatre (Harrap : 1949)—P. 68

৪৪-৪৫ Edward Thompson : op. cit—P. 219

৪৬ John Gassner : Form and Idea in Modern Theatre—P. 37

৪৭ Op. cit—P. 116

৪৮ Theatte Arts : January, 1964 (N. Y.) P. 73

৪৯ Op. cit—P. 73

৫০ J. B Priest ley—The Art of the Dramatist (Heinemann—1957)—P 30

৫১ Cp cit—P 30

———

অষ্টম অধ্যায়

অঙ্ক ও দৃশ্যবিষয়ক

এক

মৌলিক বাঙলা নাট্যরচনার উষাকালে বাঙালী নাট্যকারগণ অঙ্ক ও দৃশ্য সংস্থাপনা বিষয়ে কিছু দ্বিধার পরিচয় দিয়েছেন। 'ভদ্রার্জুন' নাটকটিকে নাট্যকার পঞ্চাঙ্কতে বিভক্ত করেছেন এবং Scene-কে করেছেন "সংযোগস্থল"। এবং নাট্যারম্ভের পূর্বে "আভাস" অংশে ইংরেজী Prologue-এর অনুকরণে নাট্যবীজ সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে। কীর্তিবিলাস নাটকেও লক্ষ্য করি "সংস্কৃত নাটকের অনুযায়ী নান্দী ও নান্দ্যান্তে সূত্রধার দ্বারাই তাঁহার নাটকের সূত্রপাত হইতেছে।...নাট্যকার এখানে ইংরেজী Scene কথাটিকে 'অভিনয়' বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন; যেমন প্রথমাঙ্ক প্রথমাভিনয়, প্রথমাঙ্ক 'দ্বিতীয়াভিনয়' ইত্যাদি"[১] তারাচরণ শিকদার 'ভদ্রার্জুন' নাটকের বিজ্ঞাপনে লিখেছেন—"সংস্কৃত নাটক প্রথমত অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইঙ্গরাজি ভাষায় (Act) এক্ট কহে; কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট যেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) সিন্ শব্দের পরিবর্তে সংযোগ ব্যবহার করা গেল।"[২] অভিনীত বাঙলা নাটক হেরাসিম লেবেডভকৃত বঙ্গানুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' নাটকটিতে Act ও Scene-এর বাঙলা করা হয়েছে যথাক্রমে 'ক্রীয়া' ও 'ব্যক্ততা'। হরচন্দ্র ঘোষ আবার Scene-এর অনুবাদ করেছেন 'অঙ্গ'। 'কুলীনকুলসর্বস্ব'তে সর্বসাকুল্যে ছয়টি অঙ্ক আছে, কিন্তু কোনো দৃশ্য' বিভাগ নেই।

অর্থাৎ অঙ্কবিন্যাসের তুলনায় দৃশ্যবিভাজনে বাঙালী নাট্যকারগণ দ্বিধার পরিচয় দিয়েছেন অধিক। কারণ, সংস্কৃত নাটকে অঙ্কবিন্যাস থাকলেও দৃশ্যবিভাগ নেই, আবার ইংরেজী নাটক অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ মেনে চলে। তাই নাট্য রচনাকালে নতুনত্বের সন্ধানে বাঙালী নাট্যকার যখন ইংরেজী নাটকের শরণাপন্ন হয়েছেন তখনই Scene নিয়ে বিব্রত হয়েছেন। কোন্ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়ে অঙ্ককে দৃশ্যে বিভক্ত করা চলে তা নিয়ে তাঁরা চিন্তিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তারাচরণ শিকদার তাঁর নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন—"যে স্থানঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) সিন্ কহে। যথা, কবিবর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর নামক গ্রন্থের প্রথমে কাঞ্চীপুরে ভট্টের গমন ও সুন্দরের সহিত তাহার কথোপকথন, যদ্যপি ঐ কাব্যনাটক

প্রণালীতে রচিত হইত, তবে কাঞ্চীপুরের রাজপুরী প্রথম অঙ্কের প্রথম সংযোগস্থল হইত। নাটক নির্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি প্রায় ইওরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়।"৩

গ্রীক নাটকে অঙ্ক বা দৃশ্যবিভাগ নেই, তা উপসংহার পর্যন্ত একটানা প্রবাহিত হয়ে চলে। গ্রীক নাটকের উপস্থাপনা বা প্রযোজনা পদ্ধতির ফলেই অনুরূপ অঙ্গবিন্যাস সম্ভব হয়েছিলো। কোরাস আদ্যন্ত মঞ্চে উপস্থিত থাকে এবং নাটকের ক্রিয়া ও পাত্রপাত্রীদের মধ্যে সংযোগস্থাপন করে দেয়। ফলে, দৃশ্যান্তরের আর প্রয়োজন থাকে না। এবং এজন্যেই গ্রীক নাটকে পরবর্তী সমালোচকগণ ত্রয়ী ঐক্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। ত্রয়ী ঐক্যের অন্যতম হলো স্থান ঐক্য (unity of place)। দৃশ্যান্তর না থাকায় গ্রীক নাট্যকারগণ একই স্থানে ক্রিয়াবিন্যাস করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

সংস্কৃত নাট্য প্রযোজনায় মঞ্চরীতি ও অভিনয় পদ্ধতি অনুরূপ ছিলো। অবশ্য 'যবনিকা'—যা নিয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ সংস্কৃত নাটকে গ্রীক প্রভাব অনুমান করেছেন—আধুনিক অর্থে সংস্কৃত বা গ্রীক নাট্যপ্রযোজনায় ব্যবহৃত হতো না। তবু সংস্কৃত নাটকের অভিনয়-রীতিতে স্থানান্তর বা কালান্তব দেখানোর সুযোগ ছিলো। প্রধানতঃ আঙ্গিক অভিনয়ের তাবতম্য দিয়েই তা বোঝানো হতো। কাজেই সংস্কৃত নাটকে প্রথম থেকেই অঙ্কবিন্যাস একটি নির্দিষ্টমানে পৌঁছে গিয়েছিলো। অন্যান্য প্রাচ্যদেশীয় নাটকে —যথা চীন, জাপান বা ব্রহ্মদেশে—কোবাসের প্রচলন ছিলো। ফলে সেখানেও নাট্যকারগণ অঙ্ক বিভাগেব প্রয়োজনীয়তা অনুভব কবেন নি।

বাঙালী নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাটকের অনুযায়ী শুধুমাত্র অঙ্কবিভাগে তৃপ্ত থাকেন নি, তাঁরা ইংরেজী নাটকের অনুসবণে অঙ্ককে দৃশ্যবিভাগেও বিন্যস্ত কবেছিলেন। মধুসূদনের প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠাতে Act ও Scene যথাক্রমে গর্ভ ও গভাঙ্ক নামে অভিহিত হয়েছে। রামনারায়ণের কুলীনকুলসর্বস্বতে দৃশ্যবিভাগ না থাকলেও নবনাটক বা রুক্মিণীহরণ নাটকে ইংবেজী অনুকরণে গর্ভাঙ্ক প্রয়োগ দেখা যায়। সমকালীন সমালোচক প্রাচীনপন্থী রামগতি ন্যায়রত্নের এ বিভাজন মনঃপূত হয় নি। তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন—"এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকেই নাটকীয় অঙ্ক সকলের প্রথমে 'প্রথম গর্ভাঙ্ক' 'দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক' ইত্যাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা বিলক্ষণ বুঝিয়া দেখিলাম যে, সেইগুলি সেই সেই অঙ্কের অবান্তর ভাগ। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ঐ সকল 'গর্ভাঙ্ক' শব্দদ্বারা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত নহে। কারণ সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা 'গর্ভাঙ্ক' শব্দের অন্যরূপ অর্থের বোধনার্থ লক্ষণ করিয়াছেন—সাহিত্যদর্পণকার লেখেন যে, অঙ্কের মধ্যেই রঙ্গদ্বার, প্রস্তাবনা, বীজ ও ফলোৎপত্তি সমেত যে, অপর এক অঙ্ক প্রবিষ্ট হয়, তাহাকেই গর্ভাঙ্ক বলা যায়। এতদ্রূপলক্ষণ গর্ভাঙ্কের সহিত এক্ষণকার নাটক রচয়িতাদিগের গর্ভাঙ্কের একতা হয় না।"৪ সংজ্ঞা মিলিয়ে বিচার করলে রামগতি ন্যায়রত্নের বক্তব্যই সত্য বলে প্রমাণিত হবে, কিন্তু

'গর্ভাঙ্ক' শব্দটির অর্থান্তর ঘটিয়ে Scene অর্থেই বাঙালী নাট্যকারগণ প্রয়োগে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে 'গর্ভাঙ্কে'র পরিবর্তে 'দৃশ্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মধুসূদন-দীনবন্ধু Scene অর্থে 'গর্ভাঙ্ক', দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথ 'দৃশ্য' এবং গিরিশচন্দ্র 'গর্ভাঙ্ক' ও 'দৃশ্য' উভয়ই ব্যবহার করেছেন। আধুনিককালে সাধারণতঃ 'দৃশ্য' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

দুই

নাটককে অঙ্ক এবং অঙ্ককে দৃশ্যে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা নাট্যকারগণ কেন অনুভব করলেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। এসকাইলাস থেকে আরিস্টো ফেনিস পর্যন্ত গ্রীক নাটকে অঙ্ক বা দৃশ্যবিভাগ ছিলো না। অথচ পরবর্তীকালের খ্যাতনামা গ্রীক নাট্যকার মেনান্দারের নাটকে অঙ্ক বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। রোমক নাটকে অঙ্কবিভাগ আছে। রোমক সাহিত্যাচার্য হোরেস তো সিদ্ধান্তই প্রকাশ করেছিলেন যে নাটককে পাঁচ অঙ্কের কম বা বেশী করা চলবে না।

গ্রীক প্রধানদের নাটকে অঙ্কবিভাগহীনতা এবং পরবর্তী গ্রীক ও রোমক নাটকে তার উপস্থিতি আমাদের একটি সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এ দু'পর্বের নাট্য সাহিত্যের মধ্যস্থলে রয়েছে আরিস্তোতলের কাব্য তথা নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রন্থ—পোয়েটিকস্। আরিস্তোতল নাটকের প্লটকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছিলেন—Reversal of the situation and Recognition। অতঃপর তাঁর সিদ্ধান্ত—"We now come to the quantitative parts—the separate parts into which Tragedy is divided—namely, Prologue, Episode, Exode, Choric Song; this last being divided into parode and stasimon.[৫] ট্র্যাজেডির অবয়বে আরিস্তোতল নির্দেশিত পঞ্চ বিভাগ পরবর্তীকালে পঞ্চ অঙ্কে রূপান্তরিত হয়েছে বলে সমালোচকগণ সিদ্ধান্ত করছেন এবং সেই পঞ্চ অঙ্ক প্লতাস, তেরেন্স, সেনেকার মাধ্যমে এলিজাবেথীয় নাট্য সাহিত্যে উপনীত হয়ে একটি নির্দিষ্ট নিয়মের সৃষ্টি করেছে। নাটকের অবয়বে পঞ্চ বিভাগ নির্দেশ করলেও আরিস্তোতল কিন্তু নাট্যক্রিয়ায় পঞ্চসন্ধির উল্লেখ করেন নি। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—Tragedy is an imitation of an action that is complete, and whole, and of a certain magnitude; for there may be a whole that is wanting in magnitude. A whole is that which has a beginning, a middle, and an end.[৬] এখানে স্পষ্টতঃই নাট্যক্রিয়ায় তিনসন্ধি নির্দেশিত হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন—"A beginning is that which does not itself follow anything by causal necessity, but after which something naturally is or comes to be. An end, on the contrary, is that which itself naturally

follows some other thing either by necessity, or as a rule, but has nothing following it. A middle is that which follows something as some other thing follows it.[৭] আরিস্তোতলের এ বিবৃত বিশ্লেষণ নাটকের নির্দিষ্ট সন্ধি বিভাগকেই বোঝায়।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। আরিস্তোতলকৃত সন্ধি বিভাগ ও নাট্যাবয়বের অঙ্ক বিভাগ উভয়ের মধ্যে সমানুপাতিক সম্পর্ক বিদ্যমান নেই। এলিজাবেথীয়, বিশেষ করে শেকসপীরীয়, নাটকে কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ সন্ধি বিভাগ ও অঙ্কবিন্যাসের মধ্যে একটি সমানুপাতিক সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন। গুস্তাফ ফ্রেতাগ্‌—নাটকে Pyramidal structure-এর আবিষ্কর্তা—শেকস্‌পীয়রের রচনায় উভয়ের মধ্যে একটি মেলবন্ধন খুঁজে পেয়েছেন। তিনি নাট্যক্রিয়াকে যথাক্রমে (a) introduction, (b) rise (c) climax (d) return or fall (e) catastrophe —এই পাঁচটি নির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত করেছেন।[৮] এবং সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই পাঁচ অংশ নাটকে পাঁচটি অঙ্কে বিধৃত থাকে। এ সূত্র অনুযায়ী শেকসপীরীয় নাটকের ক্লাইম্যাকস সচরাচর তৃতীয় অঙ্কে সংঘটিত হয়। Richard Moulton[৯] ও Wilbraham Trench.[১০] তাঁদের গ্রন্থদ্বয়ে মোটামুটিভাবে এ পদ্ধতি অবলম্বন করে নাটকের মধ্য অংশে ক্লাইম্যাকস অনুসন্ধান করেছেন।

সমালোচক ব্রাড্‌লে আবার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শেকসপীরীয় ট্র্যাজেডি may roughly be divided into three parts[১১] তাঁর বিশ্লেষণ সূত্রাকারে সাজালে মোটামুটি এ রকম দাঁড়ায় :—

(১) Exposition : expounds the situation or state of affairs out of which conflict arises : [প্রথম অঙ্কের কিছু অংশ]

(২) Definite beginning : the growth and the vicissitudes of the conflict.

[দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্ক সম্পূর্ণ এবং প্রথম ও পঞ্চম অঙ্কের কিছু অংশ]

(৩) Catastrophe : [পঞ্চম অঙ্কের শেষ অংশ]।

অনুরূপভাবে কমেডিকেও তিনি তিন অংশে বিভক্ত করেছেন এবং যথাক্রমে তাদের নাম দিয়েছেন—situation, complication or entanglement and the denouement বা solution[১২] এ বিভাজন সম্পর্কে তিনি অবশ্য কিছু পরেই মন্তব্য করেছেন—The application of this scheme of division is naturally more or less arbitrary.[১৩] তাছাড়াও আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি উপরোক্ত তিন অংশকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করার যৌক্তিকতাও অস্বীকার করেন নি।[১৪] কিন্তু তিন বা পাঁচ—যেভাবেই বিভক্ত করা হোক না কেন, তাঁর মন্তব্য

Crises, as a rule, comes somewhere near the middle of the play.[১৫]—শেষ পর্যন্ত ফ্রেতাগ্ নির্ধারিত অংশবিভাগকেই নির্দেশ করে।

গ্রীক ট্র্যাজেডি বিশ্লেষণ করে সমালোচক W. Basil Worsfold তাঁর গ্রন্থে একটি নকশা সন্নিবেশ করেছেন। তার মধ্যে নাটকের ক্রিয়া ও অঙ্ক বিভাগে:[১৬] একটি পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ গ্রীক ট্র্যাজেডিতেও তিনি পাঁচ অঙ্ক সমন্বিত নাটকের রূপ কল্পনা করেছেন।

তিন

সংস্কৃত নাটকের সন্ধি বিভাগেও সুনির্দিষ্ট পাঁচটি অংশ কল্পিত হয়েছে। বস্তুর অর্থ-প্রকৃতি সঞ্চার অনুসরণে সন্ধি বিভাগ নিম্নরূপ—*

১। আরম্ভ+বীজ=মুখসন্ধি

২। যত্ন+বিন্দু=প্রতিমুখসন্ধি

৩। প্রাপ্ত্যাশা+পতাকা=গর্ভসন্ধি

৪। নিয়তাপ্তি+প্রকরী=বিমর্ষসন্ধি

৫। ফলাগম+কার্য=নির্বহণ সন্ধি।

অর্থাৎ এখানে ক্রিয়া ও সন্ধির মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। আবার, মাতৃগুপ্ত নির্দেশিত সন্ধি বিভাগকে সমালোচক এভাবে সাজিয়েছেন;[১৭]

১। আরম্ভ
বীজ
সাধ্যোপগম | =মুখসন্ধি

২। সাধন, সম্পত্তি
প্রসার
সাধন সম্বন্ধ | =প্রতিমুখসন্ধি

৩। উদ্ভেদ
সিদ্ধি-দর্শন
মিত্র-সম্পৎ | =গর্ভসন্ধি

৪। বৈদূর্য
শ্রেয়
বীজ-সম্পত্তি | =বিমর্ষসন্ধি

৫। অর্থ-সম্পত্তি
সাধ্য সিদ্ধতা
নির্বাহ =উপসংহার সন্ধি

*এ বিষয়ে বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে সামান্য আলোচনা হয়েছে।

লক্ষণীয়, সংস্কৃত নাটকে সন্ধিবিভাগ ও অঙ্কবিন্যাস সমানুপাতিক নয়। সংস্কৃত-নাট্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে সাধনকুমার ভট্টাচার্য একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। আলোচনার সুবিধের জন্য এখানে তা উদ্ধৃত হলো :[১৮]

	রূপক	অঙ্ক সংখ্যা	সন্ধি
এক ॥	নাটক	পাঁচ থেকে দশ	মুখ-প্রতিমুখ-গর্ভ-বিমর্ষ-নির্বহণ
দুই ॥	প্রকরণ	ঐ	ঐ
তিন ॥	সমবকার	তিন	মুখ-প্রতিমুখ-গর্ভ- × -নির্বহণ
চার ॥	ঈহামৃগ	চার	মুখ-প্রতিমুখ × - × নির্বহণ
পাঁচ ॥	ডিম	চার	মুখ-প্রতিমুখ-গর্ভ- × -নির্বহণ
ছয় ॥	ব্যায়োগ	এক	মুখ প্রতিমুখ- × - × -নির্বহণ
সাত ॥	উৎসৃষ্টিকাঙ্ক	এক	মুখ- × - × - × নির্বহণ
আট ॥	প্রহসন	এক	ঐ
নয় ॥	ভাণ	এক	ঐ
দশ ॥	বীথি	এক	ঐ

পাশ্চাত্য নাটকে ক্রিয়াবিন্যাস অনুযায়ী সন্ধিবিভাগ কল্পিত, কিন্তু সংস্কৃত নাটকে সন্ধিবিভাগ কাহিনীবিন্যাসের সঙ্গে জড়িত। সাধনকুমার ভট্টাচার্য সংস্কৃত নাটকে সন্ধি ও অঙ্কবিন্যাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে উপস্থিত করেছেন,[১৯] যথা,

ক ॥ সংস্কৃত রূপক মাত্রেই পঞ্চসন্ধি সমন্বিত নয়

খ ॥ যে কয়টি সন্ধি সেই কয়টি অঙ্ক, এটিও নিয়ম নয়

গ ॥ সন্ধির সংখ্যা কম অথচ অঙ্কের সংখ্যা বেশি এমন হতে পারে
[যেমন, নাটক, প্রকরণ, ঈহামৃগ]

ঘ ॥ সন্ধির সংখ্যা বেশি অথচ অঙ্কের সংখ্যা কম—তাও সম্ভব
[যেমন : সমবকার, ব্যায়োগ, উৎসৃষ্টাঙ্ক, প্রহসন, ভাণ, বীথি]

উপরোক্ত তালিকায় দেখা গেল, একমাত্র ডিম ব্যতীত অপর সকল রূপকে সন্ধি ও অঙ্কবিন্যাসে বিশেষ সমতা নেই। ডিম-এ চার সন্ধি ও চার অঙ্ক নির্দিষ্ট হয়েছে। অবশ্য নাটক ও প্রকরণে পাঁচ অঙ্ক ও পাঁচ সন্ধি হতে পারে যদিও সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত নাটক ও প্রকরণের মধ্যে অধিকাংশেই অঙ্ক সংখ্যা পাঁচের ঊর্ধ্বে।

উপরোক্ত আলোচনায় একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট যে সংস্কৃত পঞ্চসন্ধি এবং ফ্রেতাগ্ প্রবর্তিত pyramidal structure সমশ্রেণিক নয়। Pyramidal Structure-এ একটি সুনির্দিষ্ট আরোহ-অবরোহ কল্পিত হয়ে থাকে যা 'পঞ্চসন্ধি'তে আভাসিত হয় না। এই আরোহ-অবরোহ নাট্যক্রিয়া ও দ্বন্দ্বের উত্থান পতনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। Lewis Cambell-এর ভাষায়—"The action is carried through five stages, corresponding roughly to the five acts of an Elizabethan

play.[২০] লুই ক্যামবেল অবশ্য ফ্রেতাগের pyramidal structure-কে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন নি। তিনি পঞ্চসন্ধির নাম দিয়েছেন যথাক্রমে–(1) The opening (2) The climax (or gradual ascent), (3) The Acme (or chief crises), (4) The sequel, (5) The close এবং তাঁর মতে—'I should rather compare the rise and fall of tragic intensity to a 'parabola' the natural path of a projectile in rapid motion of which the 'acme' lies somewhere beyond the central point.[২১] কিন্তু সংস্কৃত নাটকের পঞ্চসন্ধিকে pyramidal বা parabola কোনোরূপেই বিন্যস্ত করা সম্ভব নয়। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, একমাত্র ট্র্যাজেডি আলোচনার ক্ষেত্রেই সমালোচকগণ pyramidal বা parabola structure কল্পনা করেছেন। সংস্কৃত নাটকে ট্র্যাজেডি নেই, তাই rise and fall of tragic intensity সেখানে অপ্রাপ্য, ফলে সংস্কৃত পঞ্চসন্ধিকে ফ্রেতাগ বা ক্যামবেলের পদ্ধতিতে বিন্যাসের প্রয়োজন হয় না।

ফ্রেতাগীয় Pyramidal বা ক্যামবেলীয় Parabola structure-এর তুলনায় সংস্কৃত পঞ্চসন্ধি অনেক বেশি নমনীয় (flexible)। পূর্বেই বলা হয়েছে, ফ্রেতাগ বা ক্যামবেলের পদ্ধতি ট্র্যাজেডি ব্যতীত অন্যান্য নাটকে প্রয়োগ করা কঠিন এবং সেজন্যই ব্রাডলে কমেডির ক্রিয়াবিন্যাসকে পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, কিন্তু সংস্কৃত পঞ্চসন্ধিকে সর্ববিধ নাটকের ক্ষেত্রে অক্লেশে প্রয়োগ করা চলে।

আধুনিককালে কোনো কোনো সমালোচক অঙ্ক ও দৃশ্যবিন্যাসের নিগূঢ় তাৎপর্য স্বীকার করেন না। Marjorie Boulton লিখেছেন—"Acts and scenes are, in a way, merely formal divisions of no great artistic importance.[২২] তাঁর মতে অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ করে অভিনেতৃবর্গকে বিশ্রাম ও পোশাক পরিবর্তনের সুবিধে দেওয়া হয়, কিংবা এর মাধ্যমে দর্শক খানিক হুইস্কি-সোডাপান ও প্রসাধনের সুযোগ পান। তিনি একথাও স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে এলিজাবেথীয় নাটকে অঙ্ক ও দৃশ্যবিন্যাস নিয়ে নাট্যকারগণ মাথা ঘামাতেন না এবং আধুনিককালে শেকস্‌পীরীয় নাটক দু'টি বিরামসহ অভিনীত হয়ে থাকে।

মারজোরী বোলটনের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। শেকসপীরীয় নাটকে অঙ্ক ও দৃশ্যবিন্যাস নিয়ে সমস্যা আছে বটে কিন্তু তার অধিকাংশই হয়েছে সেকালীন ছাপানোর পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকার দরুণ। বিশেষত শেকসপীরীয় নাটকের ক্রিয়াবিন্যাসের আরোহ-অবরোহ—যার সঙ্গে পঞ্চ অঙ্কের সমানুপাতিক সম্পর্ক সমালোচকগণ স্বীকার করেছেন—তাকে শুধুমাত্র formal division বলা চলে না। এমন কি আধুনিককালে ইবসেন, চেকভ বা ব্রেখ্‌ট যখন অঙ্ক বা দৃশ্যবিভাগ করেন

তার মধ্যে জৈব তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তখন তাতে great artistic importance নেই—এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক।

চার

সমালোচকগণ নাটকে অঙ্কবিন্যাসের জৈব তাৎপর্য খুঁজে পেলেও দৃশ্য বিভাগের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম প্রচলিত করতে সক্ষম হন নি। গ্রীক নাটকে দৃশ্যবিভাগ নেই। সংস্কৃত নাটকেও অঙ্ককে দৃশ্যে বিভক্ত করা হতো না। এলিজাবেথীয় নাটকে অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ করা হতো। কোনো কোনো ফরাসী নাটকে দেখা যায়, সেখানে মঞ্চে ব্যক্তি পরিবর্তনের সঙ্গে দৃশ্যবিভাগ কল্পিত হয়। এ পদ্ধতিকে—বোল্টনের ভাষায়—formal division বলা চলে।

অঙ্ককে একাধিক দৃশ্যে বিভক্ত করা হয় কেন? উনিশ শতকের খ্যাতনামা ফরাসী নাট্যকার Eugene Labiche তাঁর একটি সম্ভাব্য কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। নাটক রচনাকালে তিনি আত্যন্ত একটি পরিকল্পনা করে নেবার পক্ষপাতী; অতঃপর তিনি লিখেছেন—"As soon as my plan is complete, I go over it and ask concerning each scene into purpose, whether it prepares for or develops a character or a situation, and then whether it advances the action ২৩ অর্থাৎ তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে নাট্যকার দৃশ্য বিভাজন করে থাকেন। চরিত্র ও পরিস্থিতিগত পরিবর্তন এবং নাট্যক্রিয়ার বিবর্তন দেখানোর মাধ্যমেই নাটকে প্রতিটি দৃশ্যের উপযোগিতা নির্ধারিত হতে পারে। কোনো দৃশ্য যদি নাটকে এরূপ অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন বা জৈব সমগ্রতার সঙ্গে সম্পৃক্ত না হয়, তবে তাকে অক্লেশে উদ্বৃত্ত বলে ঘোষণা করা চলে।

পাঁচ

বাঙলা নাটকে—কমেডি বা ট্র্যাজেডিতে সাধারণভাবে পঞ্চাঙ্ক বিভাগ মেনে চলা হয়েছে। 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী'তে নাট্যক্রিয়া ও দ্বন্দ্ব বিষয়ে যতই দুর্বলতা থাক না কেন, অঙ্ক বা দৃশ্য সংস্থাপনায় মধুসূদন একটি গাণিতিক সুষমা স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। 'শর্মিষ্ঠায়' পাঁচ অঙ্ক, প্রতি অঙ্কে দৃশ্যবিন্যাস যথাক্রমে দুই, তিন, তিন, তিন, দুই। এ নাটকে প্রতিটি অঙ্ক ও দৃশ্য যথাযথ পারম্পর্য ও সমতা রক্ষা করে একটি সার্থক উপসংহারের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। প্রধান ত্রুটি হলো, দৃশ্যগুলো অধিকাংশই বর্ণনাকে অতিক্রম করে ক্রিয়ামণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে নি। ফলে, অঙ্ক ও দৃশ্যবিন্যাস যান্ত্রিক থেকে গেছে। নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত হতে পারে নি। অর্থাৎ এখানে পরিস্থিতির পরিবর্তনের ওপর যতটা জোর পড়েছে, চরিত্রগত

পরিবর্তন বা নাট্যক্রিয়ার বিবর্তন ততটা প্রস্ফুটিত হয় নি। 'পদ্মাবতী'তে বর্ণনার অংশ কমেছে, ক্রিয়ার অংশ আনুপাতিক বর্ধিত হয়েছে কিন্তু সেখানেও নাটকীয় অনিবার্যতা পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয়। তবে এখানে উল্লিখিত হতে পারে যে, নাট্যক্রিয়ার বিকাশরূপে প্রদর্শিত না হলেও শর্মিষ্ঠা বা পদ্মাবতীতে কাহিনীবিবৃতিরূপে অঙ্কবিন্যাস সুবিন্যস্ত। অর্থাৎ অঙ্ক বিন্যাস নাট্যক্রিয়ার পরিবর্তে কাহিনীর অনুগামী হয়েছে।

তুলনামূলকভাবে প্রহসন দু'টিতে মধুসূদন পরিণত নাট্যকৌশল দেখিয়েছেন। দু'টি প্রহসনেই দু'টি করে অঙ্ক এবং প্রতি অঙ্কে দু'টি করে দৃশ্য। নাটকীয় আরোহ-অবরোহ প্রহসনের স্বল্প পরিসরে যতটুকু প্রকাশ করা সম্ভব—দু'টি প্রহসনেই যথার্থ পরিমিতিবোধ ও নাট্যক্রিয়ার মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছে। এবং মধুসূদন প্রবর্তিত প্রহসনের আঙ্গিক পরবর্তী অধিকাংশ বাঙলা প্রহসনে অনুসৃত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ প্রহসন রচয়িতা হিসেবে স্বীকৃত অমৃতলালের প্রায় সকল প্রহসনই দু'টি অঙ্কে বিভক্ত। অবশ্য প্রতি অঙ্কে দৃশ্যসংখ্যা মধুসূদনের তুলনায় অধিক। গিরিশচন্দ্রের প্রহসনও সাধারণভাবে অনুরূপ অঙ্কবিভাগ মেনে চলেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বসাকুল্যে ছ'খানি প্রহসন লিখেছিলেন। তাদের মধ্যে 'পুনর্জন্ম'-এ কোনো অঙ্কবিভাগ নেই এবং ত্র্যহস্পর্শে তিনটি অঙ্ক আছে। বাকি চারটি প্রহসনেই দু'টি করে অঙ্ক রয়েছে। কল্কি অবতারে অঙ্কের পরিবর্তে 'অভিনয়' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের তিনটি প্রহসনে কোনো নির্দিষ্ট অঙ্কবিভাগ নেই। 'বিয়ে পাগলা বুড়োতে' দুটি অঙ্ক, সধবার একাদশীতে তিন অঙ্ক এবং জামাইবারিকে চারটি অঙ্ক আছে। প্রতি অঙ্কেই বেশ কিছু করে দৃশ্য রয়েছে। আঙ্গিকের দিক থেকে দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকারদের কাছে আদর্শ হিসেবে সম্ভবত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি।

এখানে প্রহসনের অনুরূপ অঙ্কবিন্যাসের কারণ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। বাঙলা সাহিত্যে অধিকাংশ প্রহসনই স্যাটায়ার। এ বিষয় ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। স্যাটায়ার সাধারণতঃ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ স্বভাবসম্পন্ন হয়ে থাকে এবং এই তীক্ষ্ণতা অবয়বগত বিস্তৃতিতে বৈদ্যুতি হারাতে পারে। তাই নাট্যকারগণ সচেতনভাবে প্রহসনের অঙ্কবিন্যাসে সংক্ষিপ্ত অবলম্বন করেছেন। সাধারণভাবে দেখা যায়, প্রহসনের প্রথম অঙ্কে ব্যঙ্গের বিষয় বা পাত্রকে উপযোগতা-সমেত উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অঙ্কে তার সকল উৎকেন্দ্রিকতাকে নাট্যকার নির্মমভাবে বিধ্বস্ত করে থাকেন। ফলে, নাট্যক্রিয়ার উত্থান-পতনে একটি আশ্চর্য সমতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যেখানে নাট্যকার দুই অঙ্কের প্রতিষ্ঠিত বিভাগ মেনে চলেন নি—যেমন দীনবন্ধু মিত্র সধবার একাদশী বা জামাইবারিকে, কিংবা দ্বিজেন্দ্রলাল ত্র্যহস্পর্শে—সেখানেও প্রহসনটি স্যাটায়ার অতিক্রম

করে একটি ভিন্ন মাত্রা অর্জন করেছে। এই মাত্রা কখনো চরিত্রগত (সধবার একাদশীতে নিমচাঁদ) কখনো-বা ঘটনাগত (জামাইবারিক বা ত্র্যহস্পর্শ)। এবং উভয় স্থলেই চরিত্র-বা ঘটনাগত ব্যাপ্ত ব্যঙ্গের পরিধি অতিক্রম করে কিছু সহানুভূতি-পূর্ণ মুহূর্তের সৃজন করেছে। অবশ্য এ বৈশিষ্টকে কোনো সাধারণ নিয়মের অঙ্গীভূত করা সঠিক হবে না। বাঙলী প্রহসনের দ্বি-আঙ্কক প্রবণতার একটি বাহ্য কারণও এ প্রসঙ্গে নির্দেশ করা যেতে পারে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ইংরেজী যে সকল প্রহসন বহুল প্রচলিত ছিলো তার অধিকাংশই দুই অঙ্ক সমন্বত। গত শতাব্দীর গোড়াতে প্রকাশিত The British Drama (in two volumes) নাট্য সংকলন গ্রন্থে কুড়িটি প্রহসন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[২৪] প্রহসনগুলো প্রায় সবই দুই অঙ্কের, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি আঠারো উনিশ শতকে কোলকাতার ইংরেজী থিয়েটারে অভিনীত হয়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। সম্ভবত ইংরেজী প্রহসনের প্রচলিত আঙ্গিক বাঙালী নাট্যকারদের প্রভাবিত করেছিলো। কেননা ইংরেজী ব্যতিরিক্ত বাঙালী-প্রহসনকারদের কাছে পরিচিত ম্যালয়ের সাধারণত চার কিংবা পাঁচ অঙ্কের নাটক লিখতেন। আবার সংস্কৃত প্রহসন একটি মাত্র অঙ্ক সম্বলিত হতে পারবে এমন বিধান ভারতীয় নাটশাস্ত্রে নির্দিষ্ট ছিলো। তাই এ সিদ্ধান্ত সম্ভবত অযৌক্তিক হবে না যে, ইংরেজী প্রহসনের আঙ্গিক বাংলা প্রহসনে দুই অঙ্কের সাধারণ নিয়ম প্রবর্তনে একটি তাৎক্ষণিক অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিলো।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রহসনের মধ্যে 'গোড়ায় গলদ' ও 'চিরকুমার সভাতে' পাঁচটি করে অঙ্ক আছে। 'গোড়ায় গলদে'র পরিবর্তিত রূপ 'শেষ রক্ষা'তে অঙ্কসংখ্যা চার। বৈকুণ্ঠের খাতাতে অঙ্কবিভাগ নেই, তিনটি দৃশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথ কোথাও বাঙলা প্রহসনের প্রতিষ্ঠিত অঙ্কবিভাগ মেনে চলেন নি। পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে স্যাটায়ার রবীন্দ্রপ্রহসনের অবলম্বন কখনোই ছিলো না। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় হাস্যরস স্যাটায়ারধর্মী নয়। এমন কি 'শেষরক্ষা' বা 'গোড়ায় গলদ' ও 'চিরকুমার সভা'তেও ব্যঙ্গের সামান্য ছোঁয়া লাগলেও কখনো তা মুখ্যস্থান অধিকারে সক্ষম হয় নি। জাতিবিচারে তাদের জন্য একটি পৃথক শ্রেণী নির্দিষ্ট হতে পারে। ইংরেজী মতে তাদের Comedy of manners বলা যেতে পারে না, কেন না নিকলের ভাষায় 'The Comedy of manners is essentially intellectual; it permits of the introduction and expression of practically no emotion whatsoever.[২৫] বৈকুণ্ঠের খাতা বা চিরকুমার সভার আবেদন নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র 'ইনটেলেক্টের' কাছে নয়, 'ইমোশনের' কাছেও বটে। তাছাড়া 'Comedy of manners also reflects real life, but it is real life artificialized.[২৬] শেষরক্ষা বা চিরকুমার সভা নিশ্চয়ই বাস্তবজীবনের প্রতিফলন নয়, এমন কি real life artificialized হিসেবেও তাকে গ্রহণ করা চলে না। বরং নিকল বিশ্লেষিত Comedy of intrigue-এর সঙ্গে

'শেষরক্ষা' বা 'চিরকুমার সভা'র একটি সাধারণ মিল লক্ষিত হতে পারে। নিকলের মতে In this species of comedy, as the name implies, the laughter arises solely or largely out of the disguises and the intrigues and the complications of the plot.[২৭] কিন্তু সমালোচক যখন আবার আলোচনাপ্রসঙ্গে লেখেন There can be little wit in this type of drama, practically no humour and n^t a scrap of sa ire[২৮] তখন শেষরক্ষা বা চিরকুমার সভার সঙ্গে তার নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হতে পরে না, কেন না উভয় প্রহসনেই উইট' একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। কাজেই রবীন্দ্র প্রহসন আঙ্গিক ও প্রকৃতিগত বিচারে একটি পৃথক শ্রেণী নির্দেশ করে যা হয়তো কোনো প্রচলিত সংজ্ঞায় মিলিয়ে বিচার কবা কঠিন। সম্ভবত সেজন্যেই প্রহসনের অঙ্ক ও দৃশ্যবিন্যাসে তিনি ইংরেজী বা বাঙলা প্রহসনে প্রচলিত পদ্ধতি গ্রহণ করেন 'ন।

ছয়

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, ফ্রেতাগ নির্দেশিত pyramidal structune বা অনুরূপ অন্য কোনো কাঠামো ট্রাজেডি ব্যতীত অপর নাট্যপ্রজাতিতে বিশেষ প্রয়োগ কর চলে না। কেন না ট্রাজেডির দ্বন্দ্ব ও ক্রিয়া একান্তভাবে ব্যক্তিনির্ভর এবং তার সঙ্কটের সঙ্গে আবেগের তীব্রতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যক্তিহৃদয়ের অদম্য আবেগ ও ইচ্ছাশক্তি নাট্যক্রিয়ায় সমুদ্রতরঙ্গবৎ উত্থানপতন সৃষ্টি করে, ফলে নাটকীয় আরোহ-অবরোহ একটি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। দ্বন্দ্ব ও ক্রিয়া স্তিমিত হলে উত্থানপতন তীব্র হয় না এবং আরোহ-অবরোহ পর্যাপ্ত শীর্ষবিন্দু (climax) লাভে সমর্থ হয় না। কমেডিতে যেহেতু ব্যক্তিহৃদয়ের আবেগ ও ইচ্ছাশক্তির অনিবার্যতা তুলনামূলকভাবে অনেক মৃদুশক্তিসম্পন্ন, তাই সেখানে ফ্রেতাগীয় নাট্যাবয়ব অনুসন্ধান সর্বদা চলে না। কমেডির আঙ্গিক বিশ্লেষণে ব্র্যাড্‌লে সেজন্যেই পৃথক রীতি নির্দেশ করেছেন।

রিচার্ড মোলটন তাঁর গ্রন্থে[২৯] কিছু শেকসপীরীয় প্লটের technical analysis করে দেখিয়েছেন। সেখানে লক্ষণীয় যে ট্র্যাজেডিগুলোকে তিনি অভিহিত করেছেন passion drama বলে, কিন্তু কমেডির লক্ষণ নির্ণয় করেছেন action drama হিসেবে। এই নামের তারতম্যেই উভয়ের মাত্রাগত পার্থক্য নির্দিষ্ট হয়েছে। অবশ্য তিনি কমেডিগুলোতেও ট্রাজেডির মতো turning point অনুসন্ধান করেছেন এবং সাধারণভাবে তৃতীয় অঙ্কে তাকে স্থাপিত করেছেন। কিন্তু এ সকল নাটকে turning point নিঃসন্দেহে হ্যামলেট ম্যাকবেথ বা লিয়রের মতো প্রবল অনিবার্যতা নিয়ে শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করে উপসংহৃতিতে আত্মসমর্পণ করে নি।

যুগগত ও জাতিগত কারণে বাঙলা নাট্যসাহিত্যে সার্থক ট্র্যাজেডি রচনা বিশেষ

সম্ভব হয় নি।* ট্রাজেডির অবয়ব বিশ্লেষণে এ সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হবে। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' বাঙলা নাটকে প্রথম যথার্থ ট্রাজেডি বলে স্বীকৃত। 'কৃষ্ণকুমারী'র শীর্ষবিন্দু (climax or acme) কোথায়? ড. ক্ষেত্র গুপ্ত তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে কৃষ্ণার স্বপ্নদর্শনে "climax-এর কিছু লক্ষণ" নির্দেশ করেছেন,[৩০] কেন না এখানেই—the protagonist visualises his inacceptable but unwillingly accepted defeat। কিন্তু তিনিই আবার মন্তব্য করেছেন, "ভীমসিংহের চরিত্রের দুর্বলতা প্রধান হওয়ায় এই লক্ষণ যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। তাছাড়া কৃষ্ণার হত্যার প্রস্তাবে এবং তার মৃত্যুর দৃশ্যের উত্তেজনা এর চেয়ে বেশি বই কম নয়। তাই এই দৃশ্যটিকে নিশ্চিতভাবে ক্লাইম্যাক্স দৃশ্য বলে চিহ্নিত করা চলে না।"[৩১] অবশ্য শেকসপীয়রের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিগুলোর উপসংহারেও মৃত্যুর ঘনঘটা প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার করে থাকে, কিন্তু তাই বলে সে সকল নাটকের climax আচ্ছন্ন বা দুর্বল হয়ে পড়ে নি। আসলে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কোন কেন্দ্রীয় চরিত্রের উপস্থিতি ও তাকে অবলম্বন করে নাট্যক্রিয়া ও দ্বন্দ্বের উপযুক্ত প্রকাশ ঘটেনি, ফলে tragic intensity ব্যাহত হয়েছে এবং ক্লাইম্যাক্সও সঠিক সমুন্নতি লাভে সক্ষম হয় নি।

অঙ্কবিন্যাসে বাঙালী নাট্যকারগণ মূলত মধুসূদন প্রবর্তিত পন্থাই গ্রহণ করেছিলেন। আসলে বাঙলা নাটকে পঞ্চাঙ্ক বিন্যাস এলিজাবেথীয়, বিশেষ করে শেকসপীরীয়, রীতির অনুবর্তন। কিন্তু শেকসপীরীয় রীতির বহিরঙ্গবিন্যাস আয়ত্ত করা গেলেও তার অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য স্বীকরণ করা অধিকাংশ সময়েই সম্ভব হয় নি। প্লট নাট্যক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নাট্যক্রিয়া যদি বিবৃতি, বর্ণনা ও তত্ত্বকথার আড়ম্বরমাত্রে পর্যবসিত হয় তবে তা যথার্থ নাটকীয় হয়ে উঠতে পারে না। বহিরঙ্গ ঘটনাপুঞ্জে নাট্যক্রিয়া সম্যক স্ফূর্তিলাভে সক্ষম হয় না। আবেগ ও বুদ্ধির তড়িৎমিশ্রণে নাট্যক্রিয়া অভ্যন্তরীণ তাৎপর্য অর্জন করতে পারে। শুধু তাই নয়, নাট্যকার তার উপযুক্ত প্রকাশ ঘটাতে না পারলে নাটক সার্থক হয়ে ওঠে না। কেন না নাট্যকারের অভিপ্রায় যতই মহৎ হোক না কেন, যথার্থ প্রকাশ ব্যতীত তা নিরর্থক। গুস্তাফ ফ্রেতাগের ভাষায়—An action, in itself, is not dramatic. Passionate feeling, in itself, is not dramatic. Not the presentation of a passion for itself, but of a passion which leads to action is the business of the dramatic art, not the presentation of on event for itself, but for its effect on a human soul is the dramatists mission.[৩২] বাঙালী নাট্যকারগণ —পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে—ক্রিয়াভিমুখী আবেগসৃজনে সর্বদা সাফল্য লাভ করেন নি। ফলে উত্থান-পতন তীব্র হতে পারে নি। এবং তার পরিণামে

*এ সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে।

বাঙলা নাটকে পঞ্চাঙ্কবিন্যাস নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত না হয়ে শুধুমাত্র কাহিনীর বিভক্তী করণে সাহায্য করেছে।

বিখ্যাত কয়েকটি মঞ্চসফল বাঙলা নাটক বিশ্লেষণ করলে আমাদের যুক্তি প্রমাণিত হবে। নাট্যক্রিয়ার ফ্রেতাগীর পদ্ধতি বা ক্যামবেলীয় সিদ্ধান্তের প্রধান বিষয় হলো নাটকের শীর্ষবিন্দু (climax অথবা acme or the chief crisis) সম্পর্কিত। শীর্ষবিন্দু সঠিকভাবে খুঁজে নিতে পারলেই ক্রিয়াবিন্যাসের উত্থানপতন স্পষ্ট হয় এবং পঞ্চপর্বের সমানুপাতিক পঞ্চ অঙ্কের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হতে পারা যায়। 'নীলদর্পণে' শীর্ষবিন্দু কোথায়? নাটকের সর্বাপেক্ষা উত্তেজনাকর দৃশ্য নিঃসন্দেহে তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, যেখানে রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণির ওপর অত্যাচারে উদ্যত। কিন্তু দৃশ্যটিকে নাট্যক্রিয়ার নিশ্চিত turning point বলে গ্রহণ করা যায় না। কেন না এ দৃশ্যের পর ক্রিয়া দ্রুত নির্বহণের দিকে প্রবাহিত হয় নি। রায়তদের ওপর নীলকর সাহেবের বহুতর অত্যাচারের একটি চরম রূপ অবশ্য দৃশ্যটিতে প্রকাশিত, কিন্তু তা নাটকের ট্র্যাজেডি ত্বরান্বিত করার কোনো অত্যাবশ্যক উপাদান হয়ে দেখা দেয় নি। বিশেষত ক্ষেত্রমণির ট্র্যাজেডি দেখানো নাট্যকারের লক্ষ্য ছিলো না। তাই এই দৃশ্যটিকে নাটকের শীর্ষবিন্দু বলা চলে না। আসলে 'নীলদর্পণে' "অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের দ্বন্দ্ব বহিরঙ্গ কিন্তু তীব্র। একটি নাটকীয় কাহিনী তিনি ঠিকই গড়ে তুলেছেন। তাতে জটিলতা নেই, বিস্তার আছে। অন্তর্মুখী গভীরতা নেই, প্রাণের উত্তাপ আছে।"[৩৩] এবং এই প্রাণের উত্তাপ নাট্যকারের, তা নাট্যক্রিয়ার উত্থানপতনে বিশেষ সাহায্য করে নি। ফলে নাটকটির অঙ্কবিভাগ কিছু নির্দিষ্ট বিরতির সৃষ্টি করেছে, নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে নি। এ বিভাগ কাহিনীগত, ক্রিয়াগত নয়।

সাত

গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নিয়েও এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। নাটকটির বিয়োগান্ত পরিণতির জন্য সমালোচকগণ যোগেশ চরিত্রের আচরণকেই নির্দেশ করেছেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায় "যোগেশ প্রফুল্ল নাটকের নায়ক চরিত্র তাঁহার আচরণের জন্যই কাহিনীর বিয়োগান্তক পরিণতি অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।"[৩৪] যোগেশের এ আচরণকে নাটকে মুখ্যস্থান দিলে ব্যাঙ্ক-ফেলকেই ট্র্যাজেডির কারণ বলে গ্রহণ করতে হয়। তাহলে নাটকের শীর্ষবিন্দু অনিবার্যভাবেই প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে স্থাপিত হয়ে যায়। তাই যদি হয় এবং শেষ দৃশ্যটিকে যদি নির্বহণ বা catastrophe বলে নির্দেশ করা হয় তাহলে falling action বা denouement নাটকটিতে প্রায় পাঁচটি অঙ্ক জুড়ে বিস্তৃত থাকে। এত বিলম্বিত ক্রিয়াপতন নিঃসন্দেহে নাট্যশৈলীর ত্রুটি এবং তাতে পঞ্চাঙ্কবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তাও

অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। আবার রমেশের ষড়যন্ত্রকে যদি নাটকের premise বা root action হিসেবে নেওয়া যায় তাহলে পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক—যেখানে ভজহরির প্রচেষ্টায় তার সমস্ত ষড়যন্ত্র ফাঁস হলো, সেখানেই নাটকের শীর্ষবিন্দু স্থাপিত করতে হয়। তাহলে শীর্ষবিন্দু, ক্রিয়াপতন ও নির্বহণ অত্যন্ত দ্রুততালে সংঘটিত হয়ে যায়। ফলে নাটকটিতে পঞ্চাঙ্কবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। কেন না তাহলে নাট্যক্রিয়ার ঊর্ধ্বগতি (rising action) দীর্ঘ বিস্তৃত হয়ে নাট্যাবয়বের অবাস্তবতাকে প্রকট করে তোলে। শুধু তাই নয়, নাট্যকারের মূল অভিপ্রায়ও তাতে ত্রস্ত ও কম্পিত হয়ে পড়ে। কেন না, রমেশের ষড়যন্ত্রকে মুখ্য স্থান দিলে যোগেশকেন্দ্রিক বহুদৃশ্যকে অপ্রয়োজনীয় ও উদ্বৃত্ত বলে ঘোষণা করতে হয়। এবং তাহলেও নাট্যক্রিয়ার দিক থেকে প্রফুল্লতে পঞ্চাঙ্কবিন্যাসের অনিবার্যতা প্রকাশ পায় না।

গিরিশচন্দ্রের অপর বিখ্যাত নাটক 'বিল্বমঙ্গল' নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সাধনকুমার ভট্টাচার্য 'বিল্বমঙ্গলের' কাহিনীকে পাঁচটি পর্বে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে নাটকটির "প্রথম পর্বে—মোহ, দ্বিতীয় পর্বে—মোহমুক্তি, তৃতীয় পর্বে—পুনর্মোহ ও মোহমুক্তি, চতুর্থ পর্বে—কৃষ্ণার্তি, পঞ্চম পর্বে—কৃষ্ণপ্রাপ্তি। এই পাঞ্চপার্বিক কাহিনীকে নাট্যকার পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত করিয়া নাট্যরূপ দিয়াছেন। প্রথম অঙ্কে উপস্থাপিত—মোহের রূপ, দ্বিতীয় অঙ্কে—মোহভঙ্গ, তৃতীয় অঙ্কে—মোহ ভঙ্গের পরে দীক্ষা, বণিকপত্নী দর্শনে পুনর্মোহ ও চিরমোহমুক্তি; চতুর্থ অঙ্কে—কৃষ্ণদর্শন লালসায় বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা, পথে রাখালবেশী শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যের লীলাসম্ভোগ এবং পঞ্চম অঙ্কে—দিব্যদৃষ্টি লাভের পরে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন, কৃষ্ণলীলা সম্ভোগ।"৩৫ এখানে লক্ষণীয় সমালোচক নাট্যক্রিয়ার পঞ্চপর্বিক বিন্যাসের কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি কাহিনীকে পঞ্চপর্বে ভাগ করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন—"পঞ্চপর্বিক কাহিনীকে পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত করিবার মধ্যে কোন গঠনপ্রতিভার পরিচয় নাই—যে কোন লোকের হাতেই বিল্বমঙ্গল কাহিনী এইরূপ পাঁচ অঙ্কেই বিভক্ত হইবে।" ৩৬ অর্থাৎ এ বিভক্তীকরণ অত্যন্ত গতানুগতিক ও যান্ত্রিক, এর সঙ্গে নাট্যক্রিয়ার কোনো জৈব যোগ নেই। এবং সে জন্যেই সঙ্গত আলোচনা প্রসঙ্গে সাধন ভট্টাচার্য নাটকটির ক্রিয়ার আরোহ-অবরোহ ও শীর্ষবিন্দু নিয়ে বিশেষ বিশ্লেষণ করেন নি।

বস্তুত গিরিশনাট্যশরীরের পর্ববিভাগে ফ্রেতাগীয় বা ক্যামবেলীয় পদ্ধতি প্রয়োগের পরিবর্তে সংস্কৃত পঞ্চসন্ধি প্রয়োগ অধিক উপযোগী। এবং বিগতযুগের খ্যাতনামা গিরিশ সমালোচক অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'সৎনাম' নাটকটি আলোচনা প্রসঙ্গে তাই করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে এ মন্তব্যও করেছেন—"সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ রসের দিক দিয়া পঞ্চসন্ধির বিচার করিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে নাটকের ঘটনা (Plot) এবং

উদ্দেশ্যের দিক দিয়া পঞ্চসন্ধির বিচার করিতে হইবে।" ৩৭ শুধু তাই নয়, তিনি আরো বলেছেন—"এই পঞ্চসন্ধি নাটকীয় রস বা গল্প বিকাশের পাঁচটি স্তর মাত্র।" ৩৮ এখানে লক্ষণীয়, সমালোচক প্রথমে পঞ্চসন্ধিকে রস বিকাশের স্তর বলে স্বীকার করেও প্লটের দিক থেকে তা প্রয়োগ করার অভিলাষী হয়েছেন, আবার কিছু পরেই রস ও গল্পকে তিনি অভেদ কল্পনা করে নিয়েছেন। অর্থাৎ প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন যে, কাহিনীবিন্যাসের ক্ষেত্রেই পঞ্চসন্ধি সুপ্রযুক্ত হতে পারে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, সংস্কৃত পঞ্চসন্ধি কিন্তু কখনোই পঞ্চঅঙ্কের সঙ্গে সমানুপাতিক ছিলো না। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে একমাত্র 'ডিম' ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীর রূপকে সন্ধি ও অঙ্কের সমানুপাতিক সম্পর্ক বিদ্যমান নেই। কাজেই এরূপ সিদ্ধান্ত যদি করা হয় যে, গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত পঞ্চসন্ধিকে বিশ্বস্তভাবে অনুকরণ করে তাঁর নাটকে পঞ্চাঙ্কের বিন্যাস করেছেন তবে তা সম্ভবত সঠিক হবে না। বিশেষত নানাস্থানে আলোচনা প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র বার বার শেকসপীয়রের প্রতি তাঁর আনুগত্যের কথা ঘোষণা করেছেন। তাই তাঁর নাটকে পঞ্চাঙ্কবিন্যাস শেকসপীরীয় রীতির বহিরঙ্গ অনুবর্তন থেকেই এসেছে, এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়।

আট

নাট্যাবয়ব সম্পর্কিত ধারণা দ্বিজেন্দ্রলালের অত্যন্ত প্রখর ছিলো। 'কালিদাস ও ভবভূতি' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—"নাটকের আকার মোচার মত একস্থান হইতে বাহির হইয়া পরে বিস্তৃত হইয়া একস্থানেই তাহা শেষ করিতে হইবে। প্রেম নাটকের মুখ্য বিষয় হইলে, সেই প্রেমের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন রোমিও ও জুলিয়েট। লোভ মুখ্য বিষয় হইলে লোভের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন ম্যাকবেথ।" ৩৯ অর্থাৎ নাট্যক্রিয়ার একাভিমুখিতা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এবং একথাও স্বীকার্য যে বাঙ্গালী নাট্যকারদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক passion-oriented plot নির্মাণে যত্নবান হয়েছিলেন। তাই তাঁর সৃষ্ট নাট্যক্রিয়া আপাত দৃষ্টিতে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব সমন্বিত বলে মনে হয়। কিন্তু পূর্বেই আলোচিত হয়েছে তাঁর নাটকে আবেগ (passion) ও তার থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব যতটা আরোপিত ততটা নাট্যক্রিয়ায় সাঙ্গীকৃত নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত কিছু নাটকের ক্রিয়া ও অবয়ব বিশ্লেষণ করলে সে সত্যই প্রতিভাত হবে।

দ্বিজেন্দ্রনাটক আলোচনা প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ রায় মন্তব্য করেছেন—"দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে তীব্র গতিধর্ম আছে। এই গতিধর্মের প্রকৃতির উপর নাটকের গঠনশৈলীও অনেকখানি নির্ভর করে। স্থূলত, তাঁর নাটকগুলির মধ্যে তিনটি অংশ দেখা যায়—প্রথমাংশে নাটকীয় ঘটনার উপস্থাপনা—এমন ঘটনা যার মধ্যে গতিধর্মের সম্ভাবনা আছে; দ্বিতীয়াংশে, প্রথমাংশের ঘটনাই পল্লবিত হয়ে জটিল আকার ধারণ করে;

তৃতীয়াংশে সমস্ত ঘটনা, চরিত্র ও গতিবেগ সংহত হয়ে নাটককে অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর করায়।" ৪০ সমালোচকের এ সিদ্ধান্ত ব্র্যাড্‌লে বিশ্লেষিত শেকসপীরীয় নাট্যরীতিকেই বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয়। ব্রাড্‌লে কিন্তু বলেন, শেকস্‌পীরীয় নাট্যক্রিয়ার শীর্ষবিন্দু নাটকের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। লক্ষণীয় বিষয় হলো রথীন্দ্রনাথ রায় দ্বিজেন্দ্রনাটকের গঠনশৈলী আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর মাত্র দু'টি নাটকের 'পাষাণী' ও 'সীতা'র—শীর্ষবিন্দু বা ক্লাইম্যাকস বিশ্লেষণ করেছেন এবং উভয়ক্ষেত্রেই তৃতীয়াঙ্কে অর্থাৎ নাটকের মধ্যস্থলে তার অবস্থিতি নির্দেশ করেছেন। অথচ 'পাষাণী' বা 'সীতা' নিঃসন্দেহে দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয়। নূরজাহান বা সাজাহান—রথীন্দ্রনাথ যাদের শ্রেষ্ঠ নাটক বলে অভিহিত করেছেন—এ বিশ্লেষণের বাইরে থেকে গেছে।

'নূরজাহান' নাটকের ক্লাইম্যাকস কোন্ দৃশ্যটি? নাট্যক্রিয়ার গতি অনুধাবন করলে নূরজাহান কর্তৃক জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করবার সিদ্ধান্তটিকেই শীর্ষবিন্দুর মর্যাদা দিতে হয়। দৃশ্যটির শেষে আসফ খাঁর প্রস্থানের পর যখন নূরজাহান একাকী মঞ্চে উপস্থিত থেকে ঘোষণা করে—"তবে সাম্রাজ্যখানি এবার একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে কাঁপুক"—তখনই নাট্যক্রিয়ার নিশ্চিত turning point স্থির হয়ে যায়। এবং তারপর সমগ্র নাটক জুড়ে এই ভূমিকম্পের তাণ্ডব ও তার ফলে সূচিত হয় নূরজাহানের অনিবার্য ট্র্যাজেডি। অথচ নাটকের এটি দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য। এটিকে ক্লাইম্যাক্স ধরলে পঞ্চম অঙ্ক অষ্টম দৃশ্য অর্থাৎ উপসংহৃতি পর্যন্ত একটি প্রলম্বিত denouement বা falling action কল্পনা করে নিতে হয়। শেকসপীরীয় রীতির পঞ্চাঙ্কবিন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্যটিই এর ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

'সাজাহান' নাটকে বিষয়টি আরো জটিল ও গোলমেলে। এ নাটকে ক্লাইম্যাকস কোথায়? নবকৃষ্ণ ঘোষের মতে—"দারার মৃত্যুই সাজাহান নাটকের চরম ট্র্যাজেডি—চূড়ান্ত ঘটনা।" ৪১ চূড়ান্ত ঘটনা বলতে তিনি সম্ভবত ক্লাইম্যাক্সকে বোঝাচ্ছেন না এবং দারার ট্র্যাজেডিও—নবকৃষ্ণ ঘোষ যা মনে করেছেন—নাটকে কেন্দ্রীয় ক্রিয়া নয়। বিশেষত দারার মৃত্যু নাটকে নিশ্চিত turning point হয়ে দেখা দেয় নি। নাট্যক্রিয়াকে সাজাহান কেন্দ্রিক বলে ধরে নিলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের পর থেকে চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য পর্যন্ত দীর্ঘ সময় সাজাহানকে নাটকে অনুপস্থিত রেখে নাট্যকার কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করেছেন এবং নাটকের ক্লাইম্যাকসকে কোথায় স্থাপন করেছেন? আবার ঔরঙ্গজীবের মানস পরিবর্তনকে turning point বা ক্লাইম্যাক্স ধরে নিলে তা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় এবং মূল নাট্যক্রিয়া থেকে তা বিচ্যুত হয়ে পড়ে। সম্ভবত এসকল সমস্যার জন্যই রথীন্দ্রনাথ রায় নাটকটির গঠনশৈলী সম্পর্কে আলোচনায় 'পাষাণী' বা 'সীতা'র তুলনায় কম স্থান নিয়েছেন। 'চন্দ্রগুপ্ত' সম্পর্কে

অবশ্য সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে নাটকটির "গঠনশৈলীর মধ্যে প্রভূত দুর্বলতা আছে।" ৪২

ক্ষীরোদপ্রসাদের বিখ্যাত নাটক 'আলমগীর' বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেও অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। নাটকটির কেন্দ্রীয় ক্রিয়া কোন্‌টি? রাজপুতদের দেশপ্রেম ও বীরত্ব, কিংবা দুই পুত্রকে কেন্দ্র করে রাণা রাজসিংহের ব্যক্তিগত জীবনের দ্বন্দ্ব অথবা Philanthrophist আলমগীর সম্পর্কে নাট্যকারের তত্ত্বচিন্তার প্রকাশ? নাট্যকার তাঁর মূল অভিপ্রায় সম্পর্কে স্থিতমনস্ক হতে না পারার দরুণ নাটকটিতে প্রচুর উত্তেজনাকর দৃশ্য থাকা সত্ত্বেও আরোহ-অবরোহ সুস্পষ্ট গতিরেখা মেনে চলে নি। ফলে পঞ্চাঙ্কবিন্যাসের মূল কার্যকারণ অনুপস্থিত থেকে গেছে। নাট্যকার ইচ্ছে করলে উপস্থিত চমৎকারিত্বসহ অনুরূপ আরো অঙ্ক বাড়ালেও সামগ্রিকভাবে নাট্যক্রিয়ার কোন মৌল পরিবর্তন সাধিত হতো না বলেই মনে হয়। 'নরনারায়ণে' বরং ক্ষীরোদপ্রসাদ উন্নততর নাট্যকৌশলের স্বাক্ষর রেখেছেন। যে দৃশ্যে কৃষ্ণ কর্ণকে তাঁর কৌন্তেয় পরিচয় সম্পর্কে অবহিত করে তোলেন অর্থাৎ দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যকে নাটকের নিশ্চিত turning point বা ক্লাইম্যাক্স বলে গ্রহণ করা চলে। অবশ্য তাহলে নাট্যক্রিয়াকে নাট্যকারের কথানুযায়ী "এক দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষের" জীবনকাহিনী এই নাট্যবীজের (root-action বা Premise) অনুগামী বলে গ্রহণ করতে হয়। নাটকের প্রস্তাবনাতেও ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখেছিলেন—

"দৈব কিংবা পুরুষকার
বিশ্বরাজ্য কোন্ রাজার"—

অর্থাৎ নাট্যকারের অভিপ্রায় অনুযায়ী এখানেও অদৃষ্টের বিরুদ্ধে ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড সংগ্রামের সম্ভাবনাই আভাসিত হয়। এবং সূচনা দৃশ্যের অবতারণা নাট্যকারের সে উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে তোলে। কিন্তু নাট্যক্রিয়া অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকারের দৃষ্টিকোণ (focus) বিপর্যস্ত হয়ে অন্যত্র স্থাপিত হয়েছে, কর্ণকে তিনি প্রচ্ছন্ন ভক্তরূপে প্রকট করে তুলেছেন। সূচনা দৃশ্যতেই নাট্যকারের এই দ্বিধার পরিচয় পাওয়া যায় এবং সে জন্যেই তিনি তাপসকে দিয়ে অনাবশ্যক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়েছেন যে কর্ণের সঙ্গে যাঁর বিরোধ তাঁর "রক্ষিরূপে দেহধারী ভ্রমে নারায়ণ"। জ্যোতিষ গণনার সমতুল্য এ সংলাপ নিঃসন্দেহে নাটকীয় উৎকণ্ঠাকে ব্যাহত করে। অতঃপর কর্ণের প্রচেষ্টার একটি বৃহৎ অংশ কৃষ্ণের নারায়ণত্ব নির্ণয়ে ব্যস্ত থাকে এবং চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে সিদ্ধান্ত করে 'আর তো মানব বলা চলে না তোমায় বাসুদেব।" শুধু তাই নয় পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে তাঁর অধ্যাত্ম উপলব্ধি ঘটে সমস্ত ব্যক্তিসত্তার বিলোপে—

"বাসুদেব বাসুদেব
একবার দাঁড়াও সম্মুখে নর।
সম্মুখে দাঁড়াও নারায়ণ।"

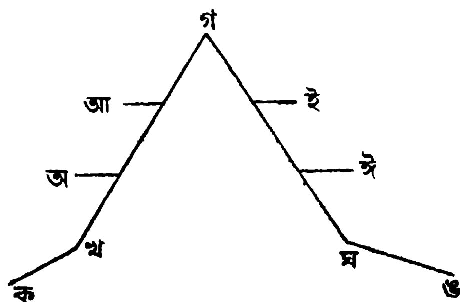
অর্থাৎ দৈবের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংগ্রাম দিয়ে শুরু হয়ে নাট্যক্রিয়া অকস্মাৎ গতিপরিবর্তন করে কৃষ্ণস্বরূপ আবিষ্কারে ব্যস্ত হয়েছে ফলে নাটকের ক্লাইম্যাক্স তার যথার্থ মর্যাদা হারাতে বাধ্য হয়েছে। পরিণামে নাট্যক্রিয়ার আরোহ-অবরোহ সঠিক রেখা অনুধাবনে সক্ষম হয় নি।

নয়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যজীবনের প্রারম্ভে পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনায় শেকসপীরীয় আঙ্গিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—'নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই।' [ভগ্নহৃদয়ের ভূমিকা]। তাছাড়া 'মালনী' নাটকের ভূমিকাতেও লিখেছিলেন—"শেকসপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখান্বিত বৈচিত্র্য ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত, প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।" উভয় উদ্ধৃত অংশে একটি নির্দিষ্ট নাট্যাবয়ব সম্পর্কিত ধারণা প্রকাশিত হয়েছে। এবং তা বিশেষ করে শেকস্‌পীয়রের অনুগামী।

'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন' শেকস্‌পীরীয় আঙ্গিকে রচিত উভয় নাটকেই একাধিক দৃশ্য সম্বলিত পাঁচটি করে অঙ্ক রয়েছে। উভয়ের মধ্যে 'রাজা ও রানী' নানা কারণেই বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। 'রাজা ও রানী' সম্ভবত বাংলা নাট্যসাহিত্যের অন্যতম passion oriented নাটক। নাট্যক্রিয়া প্রধানত বিক্রমদেবের প্রচণ্ড আবেগ ও প্রবল অভীপ্সার সঙ্গে জড়িত। এবং তার সঙ্গে সুমিত্রার ব্যক্তিত্ব ও ইচ্ছাশক্তি মিলিত হয়ে ক্রিয়াকে উপযুক্ত আরোহের মাধ্যমে শীর্ষবিন্দুর দিকে চালিত করেছে। প্রথম অঙ্কে বিক্রমের অন্ধ আসক্তি ও কর্তব্যবিমুখতা রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে এসেছে। সুমিত্রা সেই আসন্ন বিপর্যয়কে এড়াবার জন্য ব্যক্তিগত সুখ বিসর্জন দিয়ে রাজাকে কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছে এবং তাতে ব্যর্থ হয়ে নিজেই রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করছে। তাতে জটিলতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কে সেই জটিলতার বিকাশ। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে সুমিত্রা ছদ্মবেশে রাজগৃহ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিণামে বিক্রমের অন্ধ আবেগ অভিমানে ক্ষিপ্ত হয়ে আত্মহননে উদ্যত হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কে পরোক্ষে তার পরিচয় আছে। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নিঃসন্দেহে নাট্যক্রিয়ায় ক্লাইম্যাক্স কেন না এখানেই সুমিত্রার সঙ্গে বিক্রমের দেখা না করার সিদ্ধান্ত নাটককে অনিবার্য উপসংহারের দিকে প্রধাবিত করেছে। পঞ্চম অঙ্কে রেবতীর সংস্পর্শে এসে বিক্রম উপলব্ধি করেছে—"এতদিন পরে/আপনার হৃদয়ের

প্রতিমূর্তিখানা/দেখিতে পেলেম ওই রমণীর মুখে" [পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য]। তার মন প্রবল ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে কিন্তু স্থিতধী হতে পারে নি এবং কোনো প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে নিজেকে ন্যস্ত করতে পারে নি। এ মূল্যবোধ তার ফিরে এসেছে পঞ্চম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে—যখন ইলার সঙ্গে পরিচয়ে তার একনিষ্ঠ প্রেমের প্রমাণ বিক্রম পেয়েছে। সুমিত্রার 'রাজগৃহ হতে পলায়ন' বিক্রমকে নারীপ্রেমের একনিষ্ঠতার প্রতি সন্দিগ্ধ ও ক্রুদ্ধ করে তুলেছিলো। এবার তিনি জীবনের যথার্থ প্রেম সম্পর্কে অবহিত হলেন এবং উপলব্ধি করলেন সুমিত্রার উক্তির নিগূঢ় তাৎপর্য "তোমারে যে ছেড়ে যাই তোমারি সে প্রেমে" [প্রথম অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য]। তার এখন তাই "যুদ্ধ নাহি ভাল লাগে, শান্তি আরো অসহ্য দ্বিগুণ" [পঞ্চম অঙ্ক সপ্তম দৃশ্য]। তাই জীবনসমুদ্রে প্রবল ঝটিকার পর সর্বান্তঃকরণে সকল কলুষতার অপনোদন করে সুমিত্রার জন্য শান্তচিত্তে তিনি প্রতীক্ষা করেন। কিন্তু তাঁর পূর্বকৃত ত্রুটি ও ভ্রান্তি তাকে প্রত্যাশিত প্রাপ্তি এনে দেয় না এবং নাট্যক্রিয়া অনিবার্য ট্র্যাজিক পরিণতিতে উপনীত হয়। অবশ্য উপকাহিনীটির অত্যধিক প্রাধান্য নাট্যক্রিয়ার একাভিমুখীনতাকে ব্যাহত করে গঠন-শৈলীকে দুর্বল করে দিয়েছে। পুরো তৃতীয় অঙ্কটি উপকাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং তার সবগুলো দৃশ্য মূল নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত নয়। ফলে নাট্য-অবয়বের মধ্যস্থলে এরূপ অবান্তর কিছু বিষয়ের অবস্থিতি ক্রিয়ার তীব্রতাকে স্তিমিত করে দিয়েছে। যাই হোক, 'রাজা ও রানী' নাটকটির নাট্যক্রিয়ার যদি নকশা আঁকা যায়, তা হলে তা মোটামুটি নিম্নরূপ হবে :



[এক] ক থেকে খ—প্রস্তাবনা। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে তৃতীয় দৃশ্য নাট্যবীজ বপন। প্রধান চরিত্র দু'টি এখানে উপস্থিত করা হয়েছে ও তাদের নাট্যদ্বন্দ্ব সম্পর্কে দর্শককে অবহিত করে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে জনতার উপস্থিতি একদিকে যেমন কমিক রিলিফের সঞ্চার করেছে, অপর দিকে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সঙ্কটের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে।

[দুই] খ থেকে গ—নাট্যক্রিয়ার আরোহ বা rising action। সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে, রাজা ও রানীর মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা উভয়ের চিত্তগত বৈশিষ্ট্য ও রাজ্যে অরাজকতার পটভূমিতে বিলুপ্ত হয়েছে।

অ-অংশটি এ পর্বের প্রথম আবর্ত [crisis] এখানে সুমিত্রা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজগৃহ ত্যাগ করেছে। [দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

আ- অ'শটি দ্বিতীয় আবর্ত। এখানে বিক্রম সুমিত্রার কামনা অনুযায়ী স্থিতধী ও স্ব-স্থ না হয়ে বিশ্বসংহারে উদ্যত হয়েছে। তার ঘোষণা—'সৈন্যদল করহ প্রস্তুত। যুদ্ধে যাব" [দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য]। অর্থাৎ তার অন্ধ আবেগ সংহত না হয়ে আরো উদগ্র হয়ে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে।

[তিন] গ—নাট্যক্রিয়ার ক্লাইম্যাক্স বা শীর্ষবিন্দু। সুমিত্রার শুভ উদ্দেশ্য বিক্রমের অভিমানের কাছে প্রতিহত হয়ে ফিরে গিয়েছে [চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য]।

[চার] গ থেকে ঘ—নাট্যক্রিয়ার অবরোহ (falling action বা denonement)।

ই-অংশটি অবরোহের অন্তর্গত প্রথম আবর্ত [Crisis]। এখানে বিক্রম রেবতীর মুখদর্পণে আত্মপ্রতিকৃতি দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে [পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য]।

ঈ-অংশ অবরোহের দ্বিতীয় আবর্ত। এখানে ইলার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বিক্রম প্রেম ও জীবনের ওপর আস্থা ফিরে পেয়েছে [পঞ্চম অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য]।

এখানে লক্ষণীয়, অবরোহের উভয় আবর্তকেই বিক্রম মানসিক বলে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে।

[পাঁচ] ঘ থেকে ঙ—উপসংহার বা নির্বহণ। বিক্রমের পূর্বকৃত স্খলনের ফলে নাট্যক্রিয়ার ট্র্যাজিক পরিণতি অনিবার্য হয়ে উঠেছে [পঞ্চম অঙ্ক; নবম দৃশ্য]। পঞ্চম অঙ্কের নবম দৃশ্যের উপচার পূর্ববর্তী অষ্টম দৃশ্যে আয়োজিত হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতিভাত হবে যে 'রাজা ও রানী' নাটকটি ফ্রেতাগ নির্দেশিত Pyramidal structure—যা শেকসপীরীয় নাট্যক্রিয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য—অনুসরণ করেছে। নাটকটিতে আরোহ-শীর্ষবিন্দু-অবরোহ ও তার পঞ্চ-আঙ্কিক বিন্যাস এখানে শুধুমাত্র কাহিনীগত প্রতিফলন হয়ে থাকে নি। পঞ্চ-অঙ্ক ও ফ্রেতাগীয় five juncture একটি জৈব ও সমানুপাতিক সম্পর্ক স্থাপনে অভিলাষী হয়েছে।

'বিসর্জন' নাটকে কিন্তু বিন্যাসগত কৌশল 'রাজা ও রানী'র মত সুনিপুণ হতে পারে নি। জয়সিংহের আত্মদান ও রঘুপতিকে সংকীর্ণ লোকাচার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে

বৃহত্তর সত্যের মুখোমুখি করে দেওয়ার দৃশ্যটিকে [পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য] যদি নাটকের ক্লাইম্যাক্স বলে গ্রহণ করা যায়, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য নাট্যক্রিয়া গোবিন্দমানিক্যকে পরিত্যাগ করে রঘুপতির আশ্রয় গ্রহণ করে। অথচ নাট্যকারের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে গোবিন্দমানিক্যকে নাট্যক্রিয়ার কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত করা, কেন না তাঁর সিদ্ধান্ত থেকেই নাটক্রিয়ার শুরু এবং দর্শকচিত্তকে গোবিন্দমানিক্যের অভিমুখী করে তোলা সেজন্যেই নাট্যকারের প্রধান প্রচেষ্টা। অথচ গোবিন্দমানিক্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই—'আমার হৃদয়ে সংশয় কিছুই নাই' [প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য]। ফলে মুখ্য নাট্যক্রিয়া ও দ্বন্দ্ব নাটকে বিযুক্ত হতে বাধ্য হয়েছে এবং নানা টানাপোড়েনের পর পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ক্লাইম্যাক্সের সৃষ্টি করেছে। এবং সে ক্লাইম্যাক্সও মূল নাট্যক্রিয়ায় কোনো নিশ্চিত turning point নিয়ে আসে নি, কেবলমাত্র রঘুপতির চরিত্রে একটি পরিবর্তন এনেছে। অথচ রঘুপতির দ্বন্দ্বকে নাট্যকার কেন্দ্রে স্থান দেন নি। নাট্যক্রিয়া ও দ্বন্দ্বের এই সম্পর্কহীনতার জন্যই নাট্যকারকে জয়সিংহ চরিত্রের ওপর এত গুরুত্ব প্রদান করতে হয়েছে। সে গোবিন্দমানিক্য [অর্থাৎ মূল নাট্যক্রিয়ার আশ্রয়] ও রঘুপতির [অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্সের ফলে যার পরিবর্তন এসেছে] মধ্যে নিপতিত হয়ে দ্বন্দ্বযুক্ত হয়েছে ও বিপরীতমুখী দুই শক্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। ফলে তার আত্মদান শুধুমাত্র করুণ রসাশ্রিত হয়েছে, নাট্যক্রিয়াসম্পৃক্ত দ্বন্দ্বতাড়িত হয়ে ট্র্যাজিক পরিণতি লাভ করতে পারে নি। নাট্যক্রিয়া ও দ্বন্দ্বের এই অন্তর্নিহিত ত্রুটির জন্য 'বিসর্জনের' অঙ্কবিন্যাসে 'রাজা ও রানীর' মতো গ্রাফিক (Graphic) কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথ দেখাতে পারেন নি।

দশ।

'বিসর্জনে'র পর রবীন্দ্রনাথ নাটকের পঞ্চাঙ্কবিন্যাসে ব্যস্ত না থেকে অন্যতর পদ্ধতি প্রয়োগে যত্নবান হয়েছিলেন। বস্তুত প্রহসন ব্যতীত তাঁর নাট্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসলে পঞ্চাঙ্কবিন্যাস আর দেখা যায় না। পূর্বেই বলা হয়েছে, 'গোড়ায় গলদ' ও চিরকুমার সভা' ব্যতীত তাঁর প্রহসনেও পঞ্চাঙ্কবিন্যাস নেই এবং গভীর রসাশ্রিত নাটকের মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্তে' পাঁচটি ও 'পরিত্রাণে' চারটি অঙ্ক আছে। 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'পরিত্রাণ'কেও রবীন্দ্রনাট্যপ্রতিভার বৈজয়ন্তী বলে গ্রহণ করা চলে না।

'চিত্রাঙ্গদা' ও 'মালিনী'তে কোনো অঙ্ক বিভাগ নেই। প্রথম নাটকটিতে পরপর এগারোটি দৃশ্য এবং দ্বিতীয়টিতে চারটি দৃশ্য আছে। পূর্ববর্তী কিছু অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, এ সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবনা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে সুরু করেছিলো। কাজেই এখানে তা নিয়ে আর বিশদ আলোচনা করা হলো না। 'মালিনী'তে চারটি সংহত দৃশ্যের উত্তেজনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া প্রবাহিত হয়েছে এবং চতুর্থ দৃশ্যের অন্তিমে সুপ্রিয়ের মৃত্যুতে নাটকের ক্লাইম্যাক্স আত্মপ্রকাশ করেছে। সম্ভবত

নাটকটির এরূপ বহু শাখান্বিত বৈচিত্র্যের অভাব, ক্রিয়ার একাভিমুখিতা নাটকের প্রান্ত শেষ ভাগে স্থাপিত ক্লাইম্যাক্স সন্দর্শন করেই ট্রেভেলিয়ান এতে "গ্রীক নাট্যকলার প্রতিরূপ' দেখেছিলেন। নাট্যক্রিয়া ও দৃশ্যবিন্যাস এ নাটকে একটি সমানুপাতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। 'মালিনী' থেকেই রবীন্দ্রনাটক মোটামুটিভাবে অভ্যস্ত পঞ্চাঙ্কবিন্যাস পরিত্যাগ করে ভিন্ন পথগামী হয়েছে। অবশ্য এর পূর্বে প্রকৃতির 'প্রতিশোধে' (১৮৮৪) রবীন্দ্রনাথ এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তা তখনো গঠনরীতির ক্ষেত্রে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি।

'শারদোৎসব' থেকে রবীন্দ্রনাটকের সাংকেতিক পর্যায়ের শুরু। এবং এখান থেকেই তাঁর নাটকের গঠনরীতিতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত হলো। 'শারদোৎসবে' দু'টি দৃশ্য—প্রথমটি অত্যন্ত ছোট, দ্বিতীয়টি দীর্ঘ। প্রথমটিতে নাটকের বীজস্থাপনা, দ্বিতীয়টিতে তারই বিস্তৃতি এবং সমস্যার অপনোদন অন্তে প্রত্যাশিত নির্বহণ।

রবীন্দ্র সাংকেতিক নাটক সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণত: নাট্যক্রিয়ার অভাব বিষয়ে সমালোচকগণ অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। 'শারদোৎসব,' রাজা বা ডাকঘর'— অর্থাৎ যে নাটকগুলো আত্মিক দ্বন্দ্ব আশ্রয় করে আছে, তাদের—সম্পর্কে তা হয়তো প্রযোজ্য হতে পারে। এ সকল নাটকে বহিরঙ্গাশ্রয়ী নাট্যক্রিয়া প্রায় নেই এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব যা আছে তাও এত সূক্ষ্ম যে নাট্যক্রিয়ার আরোহ-অবরোহ পর্যাপ্ত সমুন্নতি লাভ করে নি। এবং সম্ভবত সেজন্যেই রবীন্দ্রনাথ বাঙলা নাটকের অভ্যস্ত পঞ্চাঙ্ক-বিন্যাস পরিত্যাগ করে নতুন নাট্যরীতি অবলম্বন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও 'রাজা' নাটকে পরপর বিশটি দৃশ্যে—যার মধ্যে বেশ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ও দ্রুতগতিসম্পন্ন— সুদর্শনার অন্তরের আকৃতি ও পরম প্রাপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিশটি দৃশ্যের মধ্যে তিনটি অন্ধকার ঘরের দৃশ্য নাট্যক্রিয়ার তিন পর্যায়ে অবস্থান করে বিশেষ বৈশিষ্ট্য-সূচক হয়েছে। দৃশ্য তিনটি যথাক্রমে প্রথম, অষ্টম ও বিংশ অর্থাৎ সমাপ্তি দৃশ্য। অষ্টম দৃশ্যে আগুন থেকে সুদর্শনাকে উদ্ধার করে রাজা অন্ধকার ঘরে নিয়ে এসেছে। সে আগুন শুধুমাত্র বাইরের প্রাসাদে আগুন নয়, সে আগুন সুদর্শনার কামনা নিয়ে জ্বলে উঠেছে। তার রূপানুরাগ তাকে স্বক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত করেছে। পরিণামে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তাকে ফিরে আসতে হয়েছে আবার সেই অন্ধকার ঘরে, তার সাধনা পূর্ণ হয়েছে। তাই রাজা তাকে তখন আহ্বান জানিয়েছে— "এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো/আলোয়" [বিংশ দৃশ্য]। এই সুগভীর আত্মিক ব্যাপ্তি ও অন্ধকার থেকে উত্তরণ রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত নাট্যাঙ্গিকের কলাকৌশলে সীমিত না রেখে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে বিস্তৃত করে দিয়েছেন। প্রথম দৃশ্যের বীজস্থাপন শেষ দৃশ্যের কলাগমে সার্থক হয়ে উঠেছে। তাই প্রথম ও শেষ দৃশ্যের অন্ধকার ঘরে স্থিতি একটি গভীর তাৎপর্য লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী পর্যায়ের সাংকেতিক নাটকে নাট্যক্রিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটি নাটকেই নাট্যক্রিয়া দ্রুত প্রবাহিত হয়ে ক্লাইম্যাক্সে গিয়ে পৌঁছোয় এবং প্রায় ক্লাইম্যাক্সের সঙ্গে সঙ্গেই নাটকের উপসংহার ঘনিয়ে আসে।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়—

ক. অচলায়তন: যোদ্ধবেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ [পঞ্চম দৃশ্য], তারপর নাটকে আর মাত্র একটি দৃশ্য আছে

খ. ডাকঘর: রাজকবিরাজের প্রবেশ [শেষ দৃশ্য]

গ. ফাল্গুনী: চন্দ্রহাস কর্তৃক গুহামধ্য থেকে 'চিরকেলে বুড়ো' তথা সর্দারকে ধরে নিয়ে আসা। [শেষ দৃশ্য]

ঘ. মুক্তধারা: অভিজিৎ কর্তৃক যন্ত্রদানব নিধন ও মুক্তধারায় বন্ধন মোচন [নাটকের প্রায় শেষ অংশে]

ঙ. রক্তকরবী: যুগযুগান্তরের জাল মোচন করে রাজার বাইরের পৃথিবীতে আবির্ভাব [নাটকের প্রায় শেষ অংশে]

চ. কালের যাত্রা: শূদ্রদের স্পর্শে মহাকালের স্থবির রথ আবার সচল হলো [নাটকের প্রায় শেষ অংশে]।

অবশ্য এ সকল নাটকের ক্লাইম্যাক্স শেক্সপীয়র বা গ্রীক নাটকের সমজাতীয় নয়, কেননা উভয় শ্রেণীর নাটকের দ্বন্দ্ব ও ক্রিয়া ভিন্ন প্রান্তবাসী। যাই হোক, নাট্যক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ও ক্লাইম্যাক্সের অবস্থিতির অভিনবত্বের জন্য রবীন্দ্র সাংকেতিক নাটকের আঙ্গিকেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রথম দিকে নাটকগুলোতে [অর্থাৎ অচলায়তন থেকে ফাল্গুনী পর্যন্ত] ক্লাইম্যাক্সকে প্রায় নির্বহণের কাছাকাছি স্থাপিত করলেও দৃশ্যবিভাগ বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ মেনে চলেছেন। অতঃপর যখন তিনি মুক্ত ধারায় এসে সমকালীন সভ্যতার সঙ্কট ও শ্রেণীদ্বন্দ্বে প্রবেশ করেছেন তখন প্রবহমান কালচেতনা তাঁর অন্বিষ্ট হয়ে উঠেছে, ফলে নাটকে দৃশ্যবিভাগের কোনো প্রয়োজনীয়তা তিনি আর অনুভব করেন নি। এমন কি অচলায়তন থেকে ফাল্গুনী পর্যন্ত যে সকল নাটকে দৃশ্য বিভাগ রয়েছে, সেখানেও নাট্যক্রিয়ার একটি দ্রুতসঞ্চরণ অলক্ষ্য থাকে না। ক্রিয়ার এই দ্রুত সঞ্চরণমানতাকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যই তিনি নাটককে দৃশ্যপট দিয়ে ভারাক্রান্ত করতে চান নি—

"চিত্রপটে প্রয়োজন নেই, আমার দরকার চিত্তপট"—ফাল্গুনী।

এগার

দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন—"নাটকের আর একটি নিয়ম আছে।...প্রত্যেক ঘটনার সার্থকতা চাই। নাটকের মধ্যে অবান্তর বিষয় আনিয়া ফেলিতে পারিবে না। সর্বদা

নাট্য—১৩

ঘটনা বা সকল বিষয়ই নাটকের মুখ্য ঘটনার অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়া চাই। নাটকে এমন একটি ঘটনা বা দৃশ্য থাকিবে না, যাহা নাটকে না থাকিলেও, নাটকের পরিণতি বর্ণিতরূপ হইত।"[৪৩] অর্থাৎ নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে জৈবযোগে সম্পৃক্ত না হলে কোনো দৃশ্য—যতই চমৎকারিত্ব পূর্ণ হোক না কেন—অবান্তর বলে গণ্য হতে পারে।

ভদ্রার্জুন বা কীর্তি বিলাসে নাট্যকারদ্বয় সংলাপের মাধ্যমে কাহিনী প্রকাশে যত্নবান হয়েছিলেন। নাট্যক্রিয়া সম্পর্কে তাঁদের ধারণাও খুব স্পষ্ট ছিলো না।

তারাচরণ শিকদার যখন লেখেন—সংস্কৃত নাটকসম্মত কয়েকজন নাট্যকারদের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই, যথা প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহাদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইওরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে"—তখন বোঝা যায় নাট্যক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর ধারণা বিশেষ স্পষ্ট ছিল না। নইলে তিনি সংস্কৃত নাটকের ক্রিয়াদি ইওরোপীয় নাটকের সমতুল্য মনে করতেন না। স্বভাবতই ক্রিয়ার পরিবর্তে কাহিনীকে প্রাধান্য দিলে, কিংবা কাহিনীকে ক্রিয়া বলে ভুল করলে নাটকে দৃশ্যযোজনা বিষয়ে সঠিক সংযমের পরিচয় নাট্যকার দিতে পারেন না।

মধুসূদনই বাঙলাসাহিত্যের প্রথম নাট্যকার যিনি দৃশ্য সংস্থাপনা বিষয়ে এই নিয়ম মেনে চলেছিলেন। এমন কি শর্মিষ্ঠা নাটকে ক্রিয়ার অভাব থাকলেও সেখানে নাট্যকার অবান্তর দৃশ্য রাখেন নি। মধুসূদন লিখেছিলেন তিনি very fond of busy and varied scenes এবং সেই অনুযায়ী কৃষ্ণকুমারীতে দৃশ্য সংস্থাপনে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। প্রহসন দুটিতেও অনুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় রয়েছে।

কিন্তু মধুসূদন পরবর্তী নাট্যকারগণ দৃশ্য সংস্থাপনায় সর্বদা এ সংযম বজায় রাখতে পারেন নি। নীলদর্পণ সম্পর্কে ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—"ইহার একটি মাত্র কাহিনী এক অখণ্ড ঐক্য রক্ষা করিয়া পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইহার প্রত্যেকটি ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত হইয়া ক্রমবিকাশ লাভ করে নাই। সেইজন্য ঘটনাগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে।"[৪৪] সমালোচক এ অভিমত নাটকে প্রতিটি দৃশ্যের উপযোগিতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের কথা উল্লেখ করা যায়। এ দৃশ্যটিতে "নীলকর সাহেবরা গোপনে গোপনে পিতার নামে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছে, তাহাদের বিশেষ যত্ন তিনি কোনরূপে কারারুদ্ধ হন"—এই খবরটি জানানো ব্যতীত অন্য তাৎপর্য নেই এবং এ সংবাদটিও কেবল মাত্র বিন্দুমাধবের একটি দীর্ঘ চিঠি ও সরলতার (পরে আদুরীর) নিষ্ক্রিয় সংলাপে ব্যক্ত হয়েছে। এটিকে অনায়াসে বর্জন করা চলতো। এরূপ আরো দৃষ্টান্ত দীনবন্ধুর নাটক থেকে দেখানো চলে।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তাঁদের রচনায় লক্ষ্য

করা যায় তাঁরা অনেক নাটকে তারকাচিহ্ন দিয়ে কিছু কিছু দৃশ্য উদ্বৃত্ত ঘোষণা করেছেন এবং নাট্যপ্রযোজনার কালে তা বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌল্লা' কিংবা ক্ষীরোদ প্রসাদের 'আলমগীর'-এর উল্লেখ করা যায়। নাট্যকার নিজেই সিরাজদ্দৌল্লা নাটকের প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ ও অষ্টম দৃশ্যকে অভিনয় সংক্ষেপার্থে বাদ দিতে বলেছেন। সপ্তম দৃশ্যটিরও নাটকীয় উপযোগিতা খুঁজে পাওয়া যায় না।[66] অথবা 'আলমগীর' নাটকটির কথা ধরা যাক। তারকাচিহ্নিত অংশ অভিনয় কালীন সময়ে নাট্যকার বাদ দিতে বলেছেন এবং প্রথম দৃশ্য থেকে দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রায় অর্ধেক তাতে বাদ পড়ে যায়। একটি নাটকের সূচনাতেই এরূপ দৃশ্য—নাট্যকার যাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন—সন্নিবেশ করা দৃশ্যসংস্থাপনা বিষয়ে নাট্যকারের দুর্বলতাই প্রমাণ করে। এরকম আরো বহু উদাহরণ দেওয়া যায়, বাহুল্যভয়ে তাতে নিবৃত্ত হতে হলো।

গিরিশচন্দ্র-ক্ষীরোদপ্রসাদ-অমৃতলাল প্রমুখ নাট্যকারদের রচনায় আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো নাটকে হঠাৎ দেখা যায়, কিছু বিচিত্র চরিত্র—জেলে-জেলেনী, ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানী ইত্যাদি—অনাবশ্যক মঞ্চে প্রবেশ করে নাচগান সম্বলিত এক একটি দৃশ্য সৃষ্টি করে। এ দৃশ্যগুলো দর্শন মনোরঞ্জনার্থ রচিত এবং এগুলো তৎকালীন কোলকাতার সং ও যাত্রা থেকে নাটকে প্রবিষ্ট হয়েছে। অধিকাংশ নাটকে এ দৃশ্যগুলো পরিত্যক্ত হতে পারে। কেননা নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে এদের কোন জৈব যোগ নেই।

অতএব এ আলোচনার উপসংহারে সিদ্ধান্ত করা চলে যে সাধারণত নিম্নলিখিত কারণ সমূহের জন্য বাঙলানাটকে অপ্রয়োজনীয় কিছু কিছু দৃশ্য সংস্থাপনা করা হয়েছে—

এক. কাহিনী সর্বদা নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্লটে পরিণত হয় নি, ফলে নাট্যকার কাহিনী বিন্যাসের প্রয়োজনে অবান্তর দৃশ্য সংযোজন করেছেন।

দুই. কখনো কোন কোন চরিত্র অনাবশ্যক প্রাধান্য পেয়েছে, ফলে তাকে কেন্দ্র করে কিছু দৃশ্য বিন্যস্ত হয়েছে।

তিন. নাট্যকারের দৃষ্টিকোণ (focus) অনেক সময় বিপর্যস্ত হয়েছে, কারণ নাট্যকার তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন নি, অথবা এক উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করে অন্যত্র উপনীত হয়েছেন।

চার. নাট্যকারের বিশেষ প্রবণতা।

এরূপ আরো কিছু কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সম্ভবত তার আর প্রয়োজন নেই। প্রায় সকল বাঙালী নাট্যকারই এদের মধ্যে এক বা একাধিক—কেউ বা সবগুলো—বৈশিষ্ট্য বর্তমান রেখেছেন।

১। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড : পৃ. ১৩২
২। তারাচরণ শিকদার : ভদ্রার্জুন পৃ. ১৷/-৷৵
৩। তদেব পৃ. ১৷৵
৪। রামগতি ন্যায়রত্ন : বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব [দি বুক কোম্পানী লিমিটেড ৪র্থ সং ১৩৪৩] পৃ. ২৩৪
৫। S. H. Butcher : Aristotle's Theory of Poetry and Fine Arts P. 44
৬। Op. Cit. P. 31
৭। Op. Cit. P. 31
৮। Gustav Freytag : The Technique of Drama [1863] P.
৯। Richard Moulton : Shakespeare as a Dramatic Artist [1929]
১০। Wilbrahan Trench : Hamlet—A New Commentary [1913]
১১। A. C. Bradley : Shakespearean Tragedy P. 39
১২। Cp' Cit, P. 30
১৩। Op. Cit, P. 30
১৪। Op. Cit. P. 39
১৫। Op. Cit. P. 39
১৬। W. Basil Worsfold : The Principles of Criticism [George Allen 1902] P. 188
১৭। S. N. Sastri : The Laws and Practice of Sanskrit Drama P. 419
১৮। সাধনকুমার ভট্টাচার্য : নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা [বিদ্যোদয় ১৯৬৩] পৃ. ১৯৮
১৯। তদেব পৃ. ১৯৯
২০। Lewis Campbell : Tragic Drama [John Murray 1904] P. 78
২১। Op. Cit. P. .9-90
২২। Marjorie Boulton : The Anatomy of Drama [Routledge & Kegan Paul 1960] P. 77
২৩। Brander Mathews : (ed) Playmaking [Hill and Wang 1957] P. 87
২৪। The British Drama : [in two volumes] Johnes and Company, 1824
২৫। Allardyce Nicoll : The Theory of Drama [George G. Harrap & Company 1937] P. 224
২৬। Cp. Cit. P. 225
২৭। Op. Cit. P. 228
২৮। Op. Cit. P. 228
২৯। Richard Moulton : Shakespeare as a Dramatic Artist P. 401-416
৩০। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত : নাট্যকার মধুসূদন পৃ. ২২০
৩১। তদেব পৃ. ২৪২
৩২। Gustav Freytag : The Technique of Drama (1863)
৩৩। দীনবন্ধু রচনাবলী : ভূমিকা পৃ. ২৭
৩৪। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস পৃ. ২৫০

৩৫। সাধনকুমার ভট্টাচার্য : নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার দ্বিতীয় খণ্ড [জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৭৬] পৃ. ১৬৫, ১৬৬

৩৬। তদেব : পৃ. ১৬৬

৩৭। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : গিরিশচন্দ্র পৃ. ৬৬৪

৩৮। তদেব : পৃ. ৬৬৪

৩৯। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) : পৃ. ৬৫১

৪০। রথীন্দ্রনাথ রায় : দ্বিজেন্দ্রলাল, কবি ও নাট্যকার পৃ. ৩৭১

৪১। নবকৃষ্ণ ঘোষ : দ্বিজেন্দ্রলাল পৃ. ১৮৪

৪২। রথীন্দ্রনাথ রায় : দ্বিজেন্দ্রলাল পৃ ৩৭৬

৪৩। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড পৃ. ৬৫১

৪৪। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস : পৃ. ৩১৩

৪৫। সাধনকুমার ভট্টাচার্য : নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার : দ্বিতীয় খণ্ড পৃ: ১৬০

নবম অধ্যায়

সংলাপ

এক

সংলাপ রচনায় বাঙালী নাট্যকারগণ দুটি ভাষারীতি গ্রহণ করেছিলেন—গদ্য ও ছন্দ। ছন্দ বলতে এখানে নির্দিষ্ট মাত্রাবিশিষ্ট পর্বভিত্তিক রচনাকে নির্দেশ করা হচ্ছে। নতুবা গদ্যেরও একটি নিজস্ব ছন্দ আছে। সাধারণভাবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করবার জন্যই উপরোক্ত বিভাগ করা হলো।

উভয় রীতির সংলাপকে আবার নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে :

ক]	গদ্য	—	১. সাধু
			২. চলিত
খ]	ছন্দ	—	১. অমিত্রাক্ষর
			২. গৈরিশ
			৩ 'আভিনয়িক পদ্য-পঙ্‌ক্তি গদ্য'

বাঙলা নাটকের সংলাপ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে একটি বৈশিষ্ট্য সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দুই কবি—মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ—সংলাপ রচনায় সেই বৈশিষ্ট্যটি মূর্ত করে তুলেছেন। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্কর্তা হয়েও নাটকে তার নামমাত্র প্রয়োগ করেছিলেন। পদ্মাবতী নাটকে সামান্য অংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন সংলাপ রচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেও পরিণত প্রতিভাকালে নাট্যরচনায় গদ্য ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে মালিনীতেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ তিনি শেষ প্রয়োগ করেছিলেন। মালিনী তাঁর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের রচনা। তারপর বড়ো নাটকে আর অমিত্রাক্ষর ছন্দ তিনি ব্যবহার করেন নি। তাঁর নাট্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল বলে স্বীকৃত সাংকেতিক নাটকে—অর্থাৎ সমালোচকগণ যার মধ্যে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও কল্পনার বিচিত্র বিকাশ দেখে মুগ্ধ হন—গদ্য সংলাপ ব্যবহার করছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাট্যজীবনের উত্তরপর্বের নৃত্যনাট্যকে ধরা হচ্ছে না। 'কালের যাত্রা'র অন্তর্গত 'রথের রশি'তে তিনি গদ্যছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে, উভয় কবি—ছন্দের ওপর যাঁদের অপ্রতিহত অধিকার ও নতুন নতুন ছন্দের

যাঁরা উদ্ভাবনকর্তা, তাঁরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ নাট্য রচনায় কেন ছন্দ বর্জন করে গদ্য সংলাপ ব্যবহার করেছেন। এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই সম্ভবত বাঙলা সংলাপের বিবর্তনের এক আশ্চর্য রহস্য নিহিত রয়েছে। অতএব, সংলাপ নিয়ে মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে এ বিষয়টি মনে রাখা বিশেষ দরকার।

দুই

প্রথম বাঙলা নাটক-এ যাবৎকাল পর্যন্ত যা আবিষ্কৃত হয়েছে—কাল্পনিক সংবদল। এটি একটি অনুবাদ নাটক, অনুবাদক একজন বিদেশী—হেরাসিন লেবেদেভ। অনুবাদকালে তিনি গোলকনাথ দাস নামক জনৈক বাঙালী পণ্ডিতের সাহায্য লাভ করেছিলেন। নাটকটি ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত হয়। সাম্প্রতিকালে এটি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়েছে।[১]

নাটকটির সংলাপ আগাগোড়া গদ্যে লিখিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলাভাষার চলিতরূপ কেমন ছিলো, আজ তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। এমন কি, প্রথম গদ্য রচনা অধিকাংশই বিদেশীর। রামরাম বসু বা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কোর্ট উইলিয়ম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় যে গদ্য রচনা করেছিলেন তার মধ্যে ভাষার চলিতরূপ আবিষ্কার করা কঠিন। বিশেষত গদ্যভাষা তখন স্রষ্ট হচ্ছে। কোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রথম গদ্য রচনা রামরাম বসু কৃত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত' ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অতএব, প্রথমযুগের গদ্যভাষা হিসেবে 'কাল্পনিক সংবদল' নাটকটির সংলাপের একটি ঐতিহাসিক স্থান আছে। বর্তমান প্রবন্ধে অবশ্য সংলাপের নাটকীয়ত্ব নিয়েই আলোচনা করা হবে।

নাটকীয় সংলাপ হিসাবে কাল্পনিক সংবদলের কয়েকটি ত্রুটি উল্লিখিত হলো :

১। ভাষায় প্রবহমানতার অভাব, গদ্যভঙ্গী অত্যন্ত আড়ষ্ট।

২। বাক্যগঠনে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা হয় নি। অন্বয়বোধ প্রায় অনুপস্থিত, ফলে গদ্য ভাষায় নিজস্ব ছন্দ প্রকাশিত হতে পারে নি।

৩। ইংরেজী বাক্‌রীতির অন্ধ অনুকরণ, বাঙলা বাক্‌রীতির সঙ্গে তার মিল নেই।

৪। বাঙলা ইডিয়মের সঙ্গে অনুবাদকের পরিচয় বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয় নি, ফলে সংলাপ প্রায় ইডিয়ম বর্জিত। অথচ কোনো ভাষার প্রাণকেন্দ্রে প্রবেশ করতে গেলে ইডিয়মের সুমিত প্রয়োগ ব্যতীত তা সম্ভব হয় না।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কবিত্বকে ধরা হয় নি, কেননা তা আরো গভীর ও জটিল ব্যাপার। এবং গদ্য সংলাপ রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টায় সে বিষয়ে অনুসন্ধান অর্থহীন।

নাটকটি একাধিকবার অভিনীত হয়েছিলো। 'দুইটি অভিনয়েই নাট্যশালা লোকে

পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল'[২] ফলে লেবেদভের অর্থ উপার্জন হয়েছিলো প্রচুর, কেননা টিকিটের দাম ছিলো অত্যন্ত বেশী। বোঝা যায়, নাটকটির সংলাপ বিশেষ সার্থক না হলেও দর্শক তাতে উৎসাহহীন হননি। কেন না তখন নাট্যাভিনয় বিষয়টির অভিনবত্বই বাঙালী দর্শককে আকৃষ্ট করেছিলো অধিক। ফলে নাটকটির সংলাপ অর্থাৎ যার মাধ্যমে নাট্যক্রিয়ায় প্রবেশ করতে হয়, তার কৃত্রিমতা বা দুর্বলতা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাতে সম্ভবত রাজী ছিলেন না।

প্রথম মৌলিক বাঙলা নাটক কীর্তিবিলাস ও ভদ্রার্জুনের সংলাপ রচনায় নাট্যকারদ্বয় গদ্য ও ছন্দ উভয়রীতি অবলম্বন করেছেন। উভয়নাটক থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো :

কীর্তিবিলাস—

১। রাজপুত্র। দেখ রজনীযোগে কুমুদিনীর সুশীতলকর সুধাকরসহ বিহার-সন্দর্শনে নলিনী নম্রমুখী হইয়া আক্ষেপনীরে ভাসিয়া থাকেন, পরে প্রভাকর উদয় হইবামাত্র অশ্রু জল সম্বরণ করিয়া নিজনায়কের নিকট মনের সমস্ত দুঃখ ব্যয় করেন। হে নাথ! তোমার প্রচণ্ড প্রখর তেজোময় কিরণদ্বারা সংসারের সমস্ত প্রাণীর দেহ দগ্ধ হইতে থাকে; কিন্তু কুমুদিনী নায়কের কোমল জ্যোতিদ্বারা সর্ব-সাধারণের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়। [দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

২। সৌদামিনী। নিজ মান অভিমানী কাহাকে না মানে।
অপমান ভয় হেতু জিজ্ঞাসেন মানে ॥
কি দেখি এমন সাধ হইল তোমার।
ইহাতে এতই সুখ ভাবিয়াছি সার ॥
মান বলে কহিব কি মম অভিলাষ।
দুঃসাধ্য অসাধ্য যাহা কে করে প্রয়াস ॥ [চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্য]

ভদ্রার্জুন—

১। অর্জুন। (সুভদ্রাকে দেখিয়া) অয়ি সত্যভামে, কাদম্বিনী অবর্তমানেও কন্দর্প দর্পহারিনী জনগণ প্রাণঘাতিনী এই সৌদামিনি আমার হৃদয়ে কেন পতিতা হইল ? কিন্তু কি আশ্চর্য, তুমি এই চপলার সঙ্গিনী হইয়াও স্থিরতর আছ।

[তৃতীয় অঙ্ক, অষ্টম দৃশ্য]

২। সুভদ্রা। কালকূট দেও সখি করি আমি পান।
নিশার সহিত প্রাণ হউক অবসান ॥
কালসম কালরাত্রি মম পক্ষে কাল।
চাহি কাল নাহি ইচ্ছা, দেখিতে সকাল ॥

জ্ঞানে নাহি পাপ ক্রিয়া করি কোন কাল।
দাদা বলদেব কেন হইলেন কাল॥ [পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য]

উদ্ধৃত সংলাপ বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

১। গদ্য ভাষায় পুরোপুরি সাধুরীতি ব্যবহার করা হয়েছে

২। ছন্দ সংলাপ উভয় নাটকেই প্রধানত পয়ার, ছন্দ রচনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব বর্তমান। নাটকের অন্যত্র ত্রিপদীও ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। একই নাটকে গদ্য ও ছন্দ উভয় রীতি অবলম্বন করা হয়েছে। 'কাল্পনিক সংবাদে' শুধুমাত্র গদ্যরীতি আছে। এ সকল বৈশিষ্ট্য থেকে গুটিকতক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলে—

১। নাট্যোপযোগী নতুন ছন্দ সংলাপ বাঙালী নাট্যকারগণ তখনও উদ্ভাবন করতে পারেন নি। পয়ারের প্রতি পঙক্তিতে নির্দিষ্ট যতিপাত সংলাপের প্রবহমানতাকে নিদারুণ ভাবে ব্যাহত করে। ত্রিপদী নাট্যসংলাপে অচল।

২। গদ্য ভাষায় তখনো চলিতরীতি অবলম্বিত হয় নি। অব্যবহিত পরবর্তী-কালে গদ্য সংলাপে সাধু ও চলিত রীতি ব্যবহৃত হয়েছে—যথা, রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক (১৮৫৪ খ্রীঃ)। সাধুরীতি নাট্যসংলাপের উপযোগী বলে মনে হয় না। অবশ্য এখানে বলা যেতে পারে, 'বাঙলা গদ্যের জনক' বলে স্বীকৃত বিদ্যাসাগর তখনো গদ্য ভাষানির্মাণে আত্মপ্রকাশ করেন নি। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের আগে তাঁর মাত্র একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল—বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭ খ্রীঃ) এবং তাতে ভাষার দুরূহতা বর্তমান ছিলো। পরবর্তী সংস্করণে বিদ্যাসাগর সে ভাষার পরিমার্জনা করেন। সে হিসেবে ভদ্রার্জুনের গদ্যভাষা সাধুরীতির হলেও নিন্দনীয় নয়, বাক্যগঠনে নাট্যকার যথেষ্ট মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। সঠিক অন্বয় ও অনতিদীর্ঘ বাক্য ব্যবহারে রচনায় প্রবহমানতাও বর্তমান। বিশেষত তারাচরণ শিকদারের নাটকে সাধুরীতি বা পয়ার ব্যবহৃত হলেও ছোট ছোট সংলাপে স্থানে স্থানে যথেষ্ট ক্রুটি প্রকাশিত হয়েছে। [যথা তৃতীয় অঙ্ক পঞ্চম সংযোগস্থলের গদ্য ভাষা এবং প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় সংযোগস্থলের ছন্দভাষা]

৩। সংলাপে একই নাটকে গদ্য ও ছন্দরীতি ব্যবহারের প্রেরণা বাঙালী নাট্যকারগণ সংস্কৃতও এলিজাবেথীয় নাটক থেকেই পেয়েছিলেন, কিন্তু গদ্যভাষায় একই সঙ্গে সাধু ও চলিত রীতি যা রামনারায়ণ থেকে দীনবন্ধু মিত্র পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন সম্ভবত সংস্কৃত থেকেই এসেছে। সংস্কৃতনাটকে বিশেষ চরিত্রের জন্য বিশেষ ধরণের সংলাপ নির্দিষ্ট আছে। আচার্য বিশ্বনাথ সাহিত্য-দর্পনে লিখেছেন—

"যাহারা নীচ নহেন এমন শিক্ষিত পুরুষগণের (অর্থাৎ শিক্ষিত উত্তম ও মধ্যম পাত্রগণের) ভাষা হইবে সংস্কৃত। এইরূপ স্ত্রীলোকের ভাষা হইবে শৌরসেনী (প্রাকৃত);

গান বা শ্লোকে এইরূপ স্ত্রীলোকের ভাষা হইবে মহারাষ্ট্রী···সন্ন্যাসিনীগণ ও উত্তম স্ত্রীলোকগণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ হইবে, কেহ কেহ বলেন রাজ্ঞী, মন্ত্রীকন্যা এবং বেশ্যার ক্ষেত্রেও সংস্কৃতভাষার ব্যবহার হইবে। নীচপাত্রগণের ভাষা নিজ নিজ দেশের উপযোগী হইবে। প্রয়োজন হইলে উত্তম প্রকৃতির স্ত্রীলোকগণের ভ'ষার ব্যতিক্রম হইতে পারিবে। বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য স্ত্রীপাত্র, সখী, বালক, বেশ্যা, ধূর্ত ও অপ্সরাগণের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ হইবে।"[৩]

এখানে স্পষ্টতই পুরুষ চরিত্রের জন্য সংস্কৃত এবং নারী ও অন্যান্য চরিত্রের জন্য প্রাকৃত ভাষা নির্দিষ্ট হয়েছে। প্রয়োজনে অবশ্য নারী ও অন্যান্য কিছু চরিত্র সংস্কৃত ব্যবহারের অধিকারী। সংস্কৃতকে সেকালের সাধুভাষা ও প্রাকৃতকে চলিতভাষা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

রামনারায়ণ নাট্য রচনায় প্রাচ্যরীতির অনুসরণ করেছিলেন। এবং পূর্ববর্তীদের তুলনায় তাঁর নাট্যবোধ উন্নত ছিলো। বাঙলা নাটকের সংলাপে তিনি সম্ভবত সর্বপ্রথম সাধুরীতি ও চলিতরীতি প্রয়োগ করেছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র পর্যন্ত এ বৈশিষ্ট্য অনুসৃত হয়েছিলো। অন্তবর্তী সময়ে এ বিষয়ে মধুসূদন একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবা বিবাহ নাটকে নায়িকা সুলোচনা যখন রসবতী বা পদ্মাবতীর সঙ্গে কথা বলে, সে চলিত ভাষাই ব্যবহার করে, কিন্তু একোক্তি বা সলিলকীর সময় সাধুরীতি ও ছন্দ উভয়ভাষাতেই কথা বলে। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পনে লক্ষ্য করি সৈরিন্ধ্রী নারীমহলে আলোচনার সময় চলিত ভাষা ব্যবহার করে। আবার নবীন মাধবের সঙ্গে কথা বলায় সময় (তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক) সাধুভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে। অর্থাৎ পরিবেশের ভিন্নতায় শিষ্টরীতি (বা সংস্কৃত) ও চলিতরীতি (বা প্রাকৃত) এ পর্যায়ে নাট্যকারদের দ্বারা অনুসৃত হয়েছে। নীলদর্পনে অভিজাত চরিত্রগণ যথারীতি সাধুভাষা ও রায়তগণ চলিত তথা প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহার করেছে।

সংলাপের এরূপ গদ্যভাষার মিশ্ররীতি মধুসূদন কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলো। এবং দীনবন্ধুর পরবর্তী প্রধান নাট্যকারগণের রচনায় এ রীতির অনুবর্তন দেখা যায় না।

মধুসূদন রচিত সংলাপের গদ্যভাষায় সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ বর্জিত হলেও চরিত্রানুযায়ী ভাষাগত তারতম্য রক্ষিত হয়েছে। প্রহসনে নির্দিষ্ট প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু নাটকের অভিজাত চরিত্রগুলো অত্যন্ত মার্জিত ভাষা ব্যবহার করেছে। উচ্চশ্রেণীর সংলাপে সর্বনাম বা ক্রিয়াপদে চলিতরীতি প্রযুক্ত হলেও তার মূলঝোঁক সাধুঘেঁষা। যথা:

১। শুক্র (সহাস্যবদনে) শ্রীনিবাসের বক্ষঃস্থলকে অলঙ্কৃত করবার নিমিত্তই

কৌস্তুভমনির স্বজন। হে বৎসে! এই রাজর্ষি যযাতি চন্দ্র বংশবতংস। যদ্যপিও তিনি ক্ষত্রকুলজাত, তত্রাচ বেদ বিদ্যাবলে তিনি আমার কন্যারত্নের অনুরূপ পাত্র।··· আমি অনতিবিলম্বেই সুবিজ্ঞতম প্রধান শিষ্য কপিলকে রাজর্ষি সান্নিধ্যে প্রেরণ করবো সুচতুর কপিল একবারে চন্দ্রবংশচূড়ামনি যযাতিকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করবেন। তদন্তর আমি তোমার প্রিয় সখীর অভিষ্টসিদ্ধি করবো, তার চিন্তা কি?

[শর্মিষ্ঠা: প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

২। রাজা।······হে প্রভো অনঙ্গ! যেমন সুরেন্দ্র আপন বজ্রদ্বারা পর্বত পক্ষচ্ছেদ করে তাকে অচল করেছেন, তুমিও কি তোমার পুষ্প শরাঘাতে আমাকে তদ্রূপ গতিহীন কত্তো চাও? [পদ্মাবতী: তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

৩। বলেন্দ্র সিংহ।···আহা! মা! আমি নিষ্ঠুর চণ্ডাল! নিরপরাধে তোমার প্রাণ নষ্ট কত্তো এসেছি। আহা! নিরুদ্বেগচিত্তে বাছা এখন নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিরামলাভ কচ্চোন; আর বোধ হয়, নানাবিধ মনোহর স্বপ্নদ্বারা পরম সুখানুভব কচ্চোন; কিন্তু নিকটে যে পিতৃব্যস্বরূপ কাল এসে উপস্থিত হয়েছ, তা ভ্রমেও জানেন না।··· [কৃষ্ণকুমারী : পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

অবশ্য উদ্ধৃত সংলাপাংশগুলোর মূলঝোঁক সাধু ঘেঁষা হলেও প্রথম দুটির তুলনায় তৃতীয়টিতে সাবলীলতা বেশী। তার কারণ, প্রথম দুটি বর্ণনা বা কথোপকথন অতিক্রম করে নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে নি, কিন্তু বলেন্দ্র সিংহের সংলাপ নাট্যক্রিয়ার অনুসঙ্গী হয়ে গতিশীল হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে পরে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

তিন

পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রথম মৌলিক বাঙলা নাটক রচনা কালেই একই নাটকে নাটকে গদ্য ও ছন্দ সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। ভদ্রার্জুন বা কীর্তিবিলাস থেকে সুরু করে মনোমোহন বসু পর্যন্ত ছন্দ সংলাপের মধ্যে প্রচলিত পয়ারের আধিপত্য লক্ষ্য করার মতো। অবশ্য স্থান বিশেষে ত্রিপদীও রয়েছে, কিন্তু পয়ার বা ত্রিপদী নাট্যসংলাপের প্রবহমানতা বজায় রাখতে পারে না, ফলে নাট্যক্রিয়া ব্যাহত হয়। মধুসূদন তাই অমিত্রাক্ষর ছন্দকে নাট্যসংলাপের পক্ষে যথার্থ উপযোগী বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু কাব্যে যেমন নিরঙ্কুশ হয়ে তিনি অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করেছিলেন, নাটকের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নি। কেননা নাট্যরচনাকালে নাট্যকারকে কতগুলো বাস্তব পরিস্থিতি স্বীকার করে কাজ করতে হয়। প্রযোজনা ও অভিনয় নাটকের একটি প্রধান ব্যাপার। মধুসূদন যখন নাটক লিখেছিলেন তখন কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো নিপুণঅভিনেতা বেশি ছিলো না এবং যাঁরা ছিলেন তাঁদের দ্বারা অমিত্রাক্ষর সংলাপ

সঠিকভাবে উচ্চারিত হবে কিনা সে বিষয়ে নাট্যকারের সন্দেহ ছিলো তাই তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন বাঙলা নাটকের সংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ অসময়োচিত হবে। অথচ মধুসূদন মনে করতেন —A true poet will always succeed best in Blank verse as a bad one in Rhyme কৃষ্ণকুমারী রচনাকালে তাই তাঁর ব্যাকুলতা কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে লেখা চিঠিতে তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে— Blank verse only in soliloquies ? What say you ? As this play will be full of acting and dialogue there won't be many openings for Blank verse ; but a little of it won't hurt any body, I think অর্থাৎ অভিনয় ও সংলাপ বিষয়ে অমিত্রাক্ষর সাদরে গৃহীত না হওয়া সত্বেও মধুসূদন অন্ততঃ একোক্তিতে তা ব্যবহার করতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিরস্ত হতে হয়েছিলো এবং তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন—"অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য; অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এদেশে এতদূর পর্যন্ত প্রচলিত হয় নাই যে, তাহা সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি।" [কৃষ্ণকুমারীর উৎসর্গ পত্র]

অথচ পদ্মাবতী নাটকের কিছু অংশে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন এবং নাট্যসংলাপ হিসেবে তা অসার্থক নয়। উদাহরণস্বরূপ কলির উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত হতে পারে—

কলি। (স্বগত) ঐ শুন —

বীরদর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে
ইন্দ্রনীল। (চিন্তা করিয়া)
এই অবসরে যদি আমি
রাণী পদ্মাবতীরে লইতে পারি হরি—
তা হলে কামনা মোর হবে ফলবতী।
প্রেয়সী বিরহশোকে ইন্দ্রনীল রায়
হারাইবে প্রাণ, ফণী মণি হারাইলে
মরে বিষাদে। এ হেতু সারথির বেশে
আসিয়াছি হেথা আমি। (পরিক্রমণ)
কি আশ্চর্য! অহো—
এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজস্বিনী।
এর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে
অক্ষম কি হইনু হে? (সহাস্যবদনে)
কেনই না হব?

অমৃত যে দেহে থাকে, শমন কি কভু
পারে তারে পরশিতে ? দেখি ভাগ্যক্রমে
পাই যদি রাণীরে এ-তোরণ সমীপে।
(চতুর্দিক অবলোকন করিয়া সপুলকে)একি ?
ওই না সে পদ্মাবতী ? আয় লো কামিনী—
এইরূপ কুরঙ্গিনী নিঃশঙ্ক অভাগা
পড়ে কিরাতে পথে ; এইরূপে সদা
বিহঙ্গী উড়িয়া আসে নিষাদের ফাঁদে।
(চিন্তা করিয়া)
কিঞ্চিৎকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া
দেখি কি করা উচিত। [চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

দীর্ঘ সংলাপটি বিশ্লেষণ করলে কিছু বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়, যথা—

১। সংলাপ সাবলীল ও ক্রিয়াভিমুখী। পয়ারে রচিত সংলাপে এগুণের নিতান্ত অভাব। তুলনীয়, ভদ্রার্জুন নাটকে সুভদ্রা ও সত্যভামার কথোপকথন (তৃতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ সংযোগস্থল) অথবা লীলাবতী নাটকে ললিত ও লীলাবতীর উক্তিপ্রত্যুক্তি (তৃতীয় অঙ্কচতুর্থ গর্ভাঙ্ক)। অবশ্য দীনবন্ধু মিত্রের পয়ারে কখনো কখনো অন্ত্যানুপ্রাস বর্জিত হয়েছে।

২। মধুসূদন এখানে কোনো কোনো পঙক্তিকে এমনভাবে ভেঙেছেন যাতে গৈরিশ ছন্দের কিছু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। সাজালে অবশ্য প্রতি পঙক্তিতেই চৌদ্দমাত্রা পাওয়া যাবে, কিন্তু সন্নিবেশ পদ্ধতির ফলে ভাঙা ছন্দের চেহারা নিয়েছে।

৩। সংলাপের কিছু অংশ—যদিও অমিত্রাক্ষর ছন্দে সাজানো—প্রায় সাধারণ গদ্যরূপ লাভ করেছে। "কিঞ্চিৎকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া দেখি কি করা উচিত—" এখানে "হইয়া" ক্রিয়াপদটিকে সামান্য পরিবর্তিত করলেই এটি কথ্যভাষারূপে গৃহীত হতে পারে। মধুসূদনের এ পরীক্ষা নিঃসন্দেহে বাঙলা নাট্য সংলাপের নূতন সম্ভাবনার প্রতি দিক নির্দেশ করে।

চার

নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ বিষয়ে সাফল্যের সীমারেখা স্পর্শ করেও এ অমিত শক্তিসম্পন্ন আয়ুধটিকে মধুসূদন পরিত্যাগ করলেন। অতঃপর দীর্ঘকাল নাটকে অমিত্রাক্ষর সংলাপ ব্যবহৃত হয়নি। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ রুদ্রচণ্ড বা প্রকৃতির প্রতিশোধের শিক্ষানবিশীর পর 'রাজা ও রাণী'তে অমিত্রাক্ষর সংলাপকে পূর্ণমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন।

অন্তবর্তী সময়ে এবং তার পরেও বহুকাল গৈরিশ ছন্দ অপ্রতিহত প্রতাপে রাজত্ব করেছে। গৈরিশ ছন্দ গিরিশচন্দ্রের উদ্ভাবন নয়।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যেই গৈরিশছন্দের কাঠামো নিহিত রয়েছে। উদ্ধৃত কলির সংলাপকে মধুসূদন যখন মাঝে মাঝে ভেঙেছেন, তার মধ্যে অন্ততঃ গৈরিশছন্দের প্রাথমিক রূপ প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া মেঘনাদবধ কাব্যটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর এটি মঞ্চস্থ হয় এবং গিরিশচন্দ্র রাম ও মেঘনাদের ভূমিকায় অভিনয় করে 'বঙ্গের গ্যারিক' অভিধা প্রাপ্ত হন। উক্ত নাট্যরূপে অমিত্রাক্ষরের কাঠামো বজায় রাখা হয়েছে। কিন্তু অসাধারণ অভিনেতা গিরিশচন্দ্র নিশ্চয়ই অভিনয়কালে তার পর্ববিন্যাসের বৈশিষ্ট্য এবং ছেদ ও যতির তারতম্য লক্ষ্য করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ সপ্তম অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে রাবণের উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

ছিল আশ', মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;—
সঁপি রাজ্যভার পুত্র, তোমায়,— করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি· বুঝিব কেমনে
তার লীলা ?— ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।

অভিনয়কালে পঙক্তিগুলোকে সম্ভবত এ ভাবে সাজাতে হয়েছিল

ছিল আশা, মেঘনাদ,
মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;—
সঁপি রাজ্যভার পুত্র, তোমায়—
করিব মহাযাত্রা।
কিন্তু বিধি—
বুঝিব কেমনে তার লীলা ?—
ভাঁড়াইলা সে সুখ আমার।

কিম্বা উচ্চারণের প্রবণতার দরুণ সাজানোতে সামান্য হের ফের হতে পারে। যাই হোক চৌদ্দ অক্ষরের·পঙক্তিকে ভাঙার মধ্য·দিয়েই গৈরিশছন্দের প্রাথমিক কাঠামো আবিষ্কৃত হয়েছিলো। এ সম্পর্কে রাজকৃষ্ণ রায় লিখেছেন—"এ দেশে কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথমে বাঙলাভাষায়·অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাহির করেন। চতুর্দ্দশ অক্ষরে মিত্রাক্ষরিক পয়ার ছন্দ বাঙালায় বহুদিন হইতে প্রচলিত, মাইকেল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সেই চতুর্দ্দশ অক্ষরেই গ্রথিত। বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে উক্ত কবির মেঘনাদ বধ কাব্যখানি নাটকাকারে সজ্জিত হইয়া, সর্বপ্রথমে অভিনীত হয়। তাহার পূর্বে বঙ্গদেশের কোনস্থলেই বাঙালা অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথাবার্ত্তায় কোন নাটক অভিনীত

হয় নাই। সেই প্রথম অভিনয়ের সময় আমরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মুখে উক্ত ছন্দের উচ্চারণ ও প্রয়োগাদি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা আজিও মনে জাগিয়া রহিয়াছে। সেই উচ্চারণ ও প্রয়োগাদিকে আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের নূতন ও সুন্দর অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করি। অভিনয়কারীদিগের অভিনয়কালে মেঘনাদবধের চতুর্দশাত্মক অমিত্রাক্ষর ছন্দ, অঙ্গভঙ্গি ও বাগ্‌ভঙ্গির অনুগত হইয়া আমাদের কানে কেমন আর একতর নূতন ছন্দের ছাঁচ-গড়িয়া দিয়াছিল। বোধ হইয়াছিল, যেন মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে আর একপ্রকার অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রসূত হইতেছে।......এখন দেখিতেছি, ফলেও তাহাই দাঁড়াইতে চলিল। শুভক্ষণে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ দেখা দিয়াছিল এবং অভিনয় ক্ষেত্রে অভিনীত হইয়াছিল, নহিলে আধুনিক ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গালায় হইত কিনা সন্দেহ।"...['হরধনুভঙ্গ' নাটকের ভূমিকা]।

এখানে উল্লেখযোগ্য, রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুভঙ্গ' বাঙলা সাহিত্যে 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ" বা গৈরিশছন্দ রচিত প্রথম নাটক। গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ'—যাতে তিনি প্রথম গৈরিশছন্দ ব্যবহার করেছিলেন কিছু পরবর্তী কালের রচনা। অবশ্য 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ গিরিশচন্দ্রই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন এবং প্রধানত তাঁর দ্বারাই বহুল প্রচারিত হয়ে ছন্দটি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো।

প্রসঙ্গত বলা যায়, সংলাপে ভাঙা অমিত্রাক্ষর প্রয়োগের ব্যাপারে যাত্রাপালা রচয়িতা ব্রজমোহন রায়ের (১৮৩১-৭৬) কৃতিত্বের কথাও অনেকে স্বীকার করে থাকেন। ব্রজমোহন রায়ের 'দানব বিজয় পালা' নাট্যকার হিসেবে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের আগেই রচিত ও অভিনীত হয়েছিল। এ সম্পর্কে ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—'যাত্রাপালা হিসাবে 'দানব বিজয়' অবয়বের দিক থেকে ছোট। বিভিন্ন অঙ্ক ও গর্ভাঙ্ক যুক্ত এই পালাটিতে গদ্য সংলাপ, সমিল পদ্য, মিত্রাক্ষর ছন্দ, গীত, ছড়া সবই ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগও অল্প-স্বল্প আছে। ...কাজেই গিরিশচন্দ্রের পূর্বে যাত্রাপালায় ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগের আংশিক দাবী ব্রজমোহন করতে পারেন।"[৬] অবশ্য ড ভট্টাচার্য গৈরিশ ছন্দ উদ্ভাবনার ব্যাপারে এ ঘটনাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভেঙে গৈরিশছন্দ করা হলো কেন? রাজকৃষ্ণ রায়ের মতে "অঙ্গভঙ্গি ও বাক্‌ভঙ্গির অনুগত" হয়েই আর একতর নূতন ছন্দের ছাঁচ গড়ে উঠেছিলো এবং ভাঙা অমিত্রাক্ষর তারই প্রকাশ। পক্ষান্তরে গৈরিশছন্দের জন্য গিরিশচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দের কাছে ঋণ স্বীকার করেন নি। তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ও জীবনীলেখক অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখেছেন—"চতুর্দশাক্ষরে আবদ্ধ থাকিয়া অনেক সময় ছন্দের সচ্ছন্দগতি ব্যাহত হয়। মেঘনাদবধ অভিনয় ও তাহার শিক্ষাদানকালে গিরিশচন্দ্র ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।......চতুর্দশ অক্ষরের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে ছন্দ আরও স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও সুমধুর হয় এবং তাহা অধিকাংশ

স্বল্পশিক্ষিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের আয়ত্তাধীন করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয় গিরিশচন্দ্রের এই ধারণা জন্মে।"[৭] গিরিশচন্দ্র নাকি কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতুম পেঁচার নকসা' গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় মুদ্রিত কয়েকছত্র থেকে গৈরিশছন্দ রচনার প্রেরণালাভ করেছিলেন। অর্থাৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দ গিরিশচন্দ্রের মতে—অবিনাশচন্দ্র প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী—অভিনয়ের বিশেষ উপযোগী নয়। নবীনচন্দ্র সেনকে লিখিত একটি পত্রে গিরিশচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতি তাঁর অনীহার আর একটি কারণ দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "ছন্দোবদ্ধ ব্যতীত আমরা ভাষা কথা কইতে পারি না। চেষ্টা করলেও ভাষা কথা কইতে গেলেই ছন্দ হবে। সেইজন্য ছন্দে কথা নাটকের উপযোগী। ... অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়বার সময় আমার যেমন ভাষা লেখা, তেমনি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে হয়। যেখানে বর্ণনা, সেখানে স্বতন্ত্র, কিন্তু যেখানে কথাবার্তা সেখানেই ছন্দ ভাঙা। ...চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়ল দেখা যায়—সকল সময়ে সরল যতি থাকে না।

বীর বাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে।—

এরূপ হামেশাই হবে। বাংলা ভাষার ক্রিয়া 'হইয়াছিল' প্রভৃতি অনেক সময়েই যতি জড়িত করবে। কিন্তু গৈরিশ ছন্দে সে আশঙ্কা নেই।"[৮] অর্থাৎ তিনমাত্রায় যতি পতন গিরিশচন্দ্রের মনঃপুত হয় নি কেন না তাতে—তাঁর মতে—সরল যতি থাকে না।

মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা কালে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তাঁর মতে, "বিরামযতি সংস্থাপনের দোষে স্থানে স্থানে শ্রুতিদুষ্ট হইয়াছে।" এবং লিখেছেন—"এ সকল স্থলে গায়ক, শিবিরে, বীরেন্দ্র, আবৃত শব্দের পর বাক্য সমাপ্ত হওয়ার পদাবলীর স্রোতোভঙ্গ হেতু শ্রবণ কঠোর হইয়াছে।" অথচ মধুসূদন কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দসাফল্যের জন্য বিপরীত বক্তব্য রেখেছেন—I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th 7th, 8th, 10th, 11th, and 12th [৯] অর্থাৎ মধুসূধন তৃতীয়, সপ্তম, একাদশ প্রভৃতি বেজোড় মাত্রাকেও অমিত্রাক্ষরের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের অভিনবত্ব ও সাফল্যের রহস্যও এখানে। হেমচন্দ্র তা সঠিক অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। হেমচন্দ্র জোড় মাত্রার পর বিরাম যতি বসাবার পক্ষপাতী। গিরিশচন্দ্রের অভিমতও হেমচন্দ্রের অনুরূপ।

আসলে সংলাপ রচনায় সংযম গিরিশচন্দ্রের কাম্য ছিল না। অমিত্রাক্ষর ছন্দের কাঠামোয় সীমাবদ্ধ থাকলে স্বভাবতই কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়। প্রতি পঙক্তিতে দুই পর্ব বিশিষ্ট চৌদ্দ মাত্রা বজায় রেখেও সংলাপকে সাবলীল ও প্রবহমান করে তোলা সহজ সাধ্য নয়। তার ওপর তিন-মাত্রায় যতিপতনে জটিলতা আরো বৃদ্ধি

পেতে পারে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তিনি লিখেছেন—"গৈরিশছন্দের সে আশঙ্কা নাই। যতি সম্পূর্ণ করিয়া সহজেই লেখা যাইবে। আর একলাভ, ভাষা নীচ হইতে বিনা চেষ্টায় উচ্চস্তরে সহজেই উঠিবে। সে সুবিধা চৌদ্দর কিছু কম। কাব্যে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই' কিন্তু নাটকে অধিকাংশ সময় তার প্রয়োজন।"১০

অতএব গিরিশচন্দ্রের মতানুযায়ী নাট্য সংলাপ হিসেবে অমিত্রাক্ষরের তুলনায় গৈরিশছন্দের উপযোগিতা প্রধানত দুটি—

১. সরল যতি অবলম্বনে সহজেই 'লেখা যাইবে'।

২. 'ভাষা নীচ হইতে বিনাচেষ্টায় উচ্চস্তরে সহজেই উঠিবে।'

এই সঙ্গে স্বল্পশিক্ষিত অভিনেতৃ সম্প্রদায় কর্তৃক সহজে পাঠ আয়ত্ত করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

উল্লিখিত দুটি বৈশিষ্ট্যর মধ্যে প্রথমে দ্বিতীয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক। সেকালে অভিনয় পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত উচ্চগ্রামের—অর্থাৎ high pitch acting। "এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে বলা"—তখনকার দিনের মোশন-মাষ্টারের একটি পরিচিত উক্তি। অবশ্য গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি বিখ্যাত অভিনেতাগণ এ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, কিন্তু সাধারণ প্রবণতা ছিলো মূলত high pitch acting-য়ের দিকে। গিরিশচন্দ্রকে তাই এমন সংলাপ রচনা করতে হয়েছে যা" নীচে হতে বিনাচেষ্টায় উচ্চস্তরে সহজেই উঠিবে।" অমিত্রাক্ষরের নির্দিষ্ট নিয়ম ও সংযমের মধ্যে তা অনায়াস-লভ্য নয়। এই কারণে গিরিশচন্দ্র গৈরিশছন্দে সংক্ষিপ্ত উক্তি-প্রত্যুক্তি বা ছোট সংলাপ বিশেষ রচনা করেন নি, কেন না তাতে গৈরিশছন্দের মূল উপযোগিতা অর্থাৎ high pitch acting ব্যাহত হতে পারে।

প্রথম উপযোগিতাটি গিরিশচন্দ্রের কাছে আরো বেশী গুরুত্ব পেয়েছিলো। গৈরিশছন্দে অমিত্রাক্ষরের মতো সংযম ও নিয়মের প্রাধান্য না থাকায় নাটক "যতি সম্পূর্ণ করিয়া সহজেই লেখা যাইবে।" এ সম্পর্কে রাজকৃষ্ণ রায়ের বক্তব্য প্রাঞ্জল। তিনি লিখেছেন, —"এই ছন্দ আভিনয়িক নাটকের পক্ষে জলবৎ তরল এবং লেখকের পক্ষেও তাহাই। লোকের অনুরোধে বা নিজের ইচ্ছায় দুই চারিদিনের মধ্যে এক একখানা বড় বড় নাটক পদ্যে লিখিত হইলে এই জলবৎ তরল ছন্দই—এই অমিত্রাক্ষর-ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দই—বিশেষরূপে উপযোগী" [হরধনুর্ভঙ্গ নাটকের ভূমিকা]। গৈরিশছন্দে রচিত প্রথম বাংলা নাটক হরধনুর্ভঙ্গ সম্পর্কে নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় অনুরূপ স্বীকারোক্তি করেছেন—" দুই তিনজন সুদক্ষ অভিনেতার অনুরোধে পাঁচ ছয়দিনের মধ্যে এই হরধনুর্ভঙ্গ নাটকখানি লিখিত হইল। তাহাদের অনুরোধে, নাটকখানি গদ্যে না হইয়া পদ্যে হইলে বড় ভালো হয়, অথচ পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে লিখিয়া দেওয়াও চাই। সুতরাং এত অল্প সময়ের মধ্যে শতাধিক পৃষ্ঠায় একখানি পুস্তক অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্মত ছন্দে

নাট্য—১৪

লিখিয়া শেষ করা যে কি পর্যন্ত দুর্ঘট, তাহা বলা বাহুল্য। এইজন্ত আমি ইহার অধিকাংশ স্থলে "ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দের" দিকেই অধিকতর মনোযোগ করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক প্রকার অনুরোধ রক্ষা করিলাম" ["হরধনুর্ভঙ্গ" নাটকের ভূমিকা]।

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে, সাধারণ রঙ্গালয় প্রবর্তনার ফলে নাট্য প্রযোজনা ও অভিনয় ব্যাপারটি অত্যন্ত বহুল হয়ে পড়ে। তখনকার শহর কোলকাতায় একসঙ্গে দুটি তিনটি মঞ্চে নিয়মিত নাট্যাভিনয় হতো। এখনকার মতো শতাধিক রজনী একাদিক্রমে চলা সেকালে কোনো নাটকের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তাই নাট্যদলগুলোকে নিত্য নতুন নাটকের জন্ম ব্যস্ত হতে হতো। অভিনয়ের এই বিপুল প্রয়োজন মেটানোর জন্ম তখন নাট্যকার বেশী ছিলেন না। দুমাস বা তারও কম সময়ে নতুন নাটক মঞ্চে উপস্থাপিত করা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। অথচ রঙ্গালয়ের মঞ্চাধ্যক্ষ ও নাট্যকার হিসেবে গিরিশচন্দ্রকে তাই করতে হয়েছে। এ সম্পর্কে অবিনাশচন্দ্র লিখেছেন—"গিরিশচন্দ্র দুই মাস অন্তর কিরূপে নূতন নাটক লিখিয়া এবং তাহার শিক্ষাদান করিয়া অভিনয় ঘোষনা করিতেন? প্রথমে আমাদেরও আশ্চর্য বোধ হইত, কিন্তু তাঁহার সংস্রবে আসিয়া এবং তাঁহার দ্রুত রচনা-শক্তির পরিচয় পাইয়া বুঝিয়া ছিলাম—ইহা তাঁহার ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতা।"[১১] অবিনাশচন্দ্র আরো জানাচ্ছেন—"ন্তাশনাল থিয়েটারে অভিনীত পৌরাণিক নাটকগুলির এক একখানি লিখিতে গিরিশচন্দ্রের এক সপ্তাহের অধিক সময় লাগিত না।"[১২] নাট্য রচনা কালে গিরিশচন্দ্র নিজে লেখনীধারণ করতেন না। প্রথম যুগে অমৃতলাল বসু বা অপর কোনো সহযোগী লিখতেন। গিরিশচন্দ্র মুখে মুখে বলে যেতেন। জীবনের শেষ পনের বছর তিনি অবিনাশচন্দ্রকে অনুলেখক হিসেবে পেয়েছিলেন। তাঁর রচনা পদ্ধতি সম্পর্কে অবিনাশচন্দ্র বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন—"ন্তাশনাল ও স্টার থিয়েটারে অভিনীত নাটকগুলি রচনাকালে গিরিশচন্দ্র কখনও বসিয়া, কখনও বেড়াইতে বেড়াইতে এত দ্রুত বলিয়া যাইতেন যে, কলমে কালি তুলিয়া লইবার অবকাশ হইত না; এ নিমিত্ত তিন চারটি পেন্সিল কাটিয়া তাঁহার সহিত লিখিতে হইত। গিরিশচন্দ্র ভাবে বিভোর হইয়া বলিয়া যাইতেন, লেখার দিকে একেবারেই লক্ষ্য থাকিত না।"[১৩] শুধু তাই নয়, বলার সময় পুনরুল্লেখের অনুরোধ হলে তিনি বিরক্ত হয়ে বলতেন,—" কি ক্ষতি করিলে জানো? যাহা বলিয়াছি তাহা তো মনেই নাই, আর যাহা বলিতে যাইতেছিলাম, তাহাও গোলমাল হইয়া গেল। যে স্থান লিখিতে না পারিবে, দুইটি তারা (star) চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া তাহার পর লিখিয়া যাইবে, পরে সেই পরিত্যক্ত অংশ পূরণ করিয়া দিব।"[১৪] তাছাড়া নাটক লিখবার সময়ে "তিনি নাট্যোক্ত পাত্র পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি অভিনয় ভঙ্গিতেই বলিয়া যাইতেন।"[১৫]

উপরোক্ত রচনা পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে গৈরিশছন্দে অধিকাংশ সময়েই অনাবশ্যক বিস্তৃতি এসেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, গিরিশচন্দ্র গৈরিশছন্দে দ্রুত উক্তি প্রত্যুক্তি ও

ছোট সংলাপ বিশেষ রচনা করেন নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে 'জনা' নাটকে গৈরিশছন্দে রচিত সর্বসাকুল্যে দুশো আটষট্টিটি সংলাপ রয়েছে, তারমধ্যে মাত্র সাতষট্টিটি সংলাপ এক থেকে তিন পঙক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ সাতষট্টিটির মধ্যে আবার অধিকাংশই সাধারণ সংবাদ প্রদান বা জয়ধ্বনি ইত্যাদিতে ব্যয়িত হয়েছে। বাকি দুশো একটি সংলাপের মধ্যে দশ থেকে বিশ পঙক্তি-বিশিষ্ট সংলাপই বেশি, তাছাড়া ত্রিশ বা তদূর্ধ পঙক্তির সংলাপের পরিমানও নিতান্ত কম নয়। 'জনা' নাটকটি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের পরিণত প্রতিভাকালে রচিত এবং সমালোচক কর্তৃক তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলে স্বীকৃত। অর্থাৎ পরিণত প্রতিভাকালে সংলাপ রচনায় সংযমের পরিবর্তে গিরিশচন্দ্র বিস্তৃতির দিকে মনোযোগী হয়েছেন অধিক। অথচ—"Verse is not merely a formalization, or an added decoration, but that it intensifies the drama[১৬]. এবং সংযম সংহতি ও পরিমিতিবোধ ব্যতীত নাটকের ছন্দ সংলাপকে intensify করা অসম্ভব। শুধু তাই নয়—সমালোচকের মতে—Poetry can make the drama uniquely precise not only for the actor to work with, but also for the audience to react it[১৭]. কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঠিক বিপরীত উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই ছন্দ সংলাপের আশ্রয় নিয়েছেন।

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্য জীবনের প্রথম পর্বে সংলাপ রচনায় অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করেছেন। বস্তুত গীতিনাট্যগুলো বাদ দিলে এই পর্বে মালিনী পর্যন্ত তাঁর প্রায় সকল নাটকই অমিত্রাক্ষরে রচিত। এই পর্বে একমাত্র "গোড়ায় গলদ" নাটকে গদ্যসংলাপ ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য 'রাজা ও রাণী' ও 'বিসর্জন'-এ মাঝে মাঝে গদ্য সংলাপ রয়েছে—প্রধানত হাল্কা পরিস্থিতি ফুটিয়ে তোলার জন্যে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রচিন্তনের কিছু প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত হলো :

১.…"মধুসূদন বাংলাসাহিত্যে আমাদের সংস্কারের প্রতিকূলে আনলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাতে রইল না মিল, তাতে লাইনের বেড়াগুলি সমান ভাগে সাজানো বটে, কিন্তু ছন্দের পদক্ষেপ চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙিয়ে। অর্থাৎ এর ভঙ্গি পদ্যের মতো, কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে।"[১৮]

২. "মুদ্রারাক্ষসের শ্লোকগুলি ঠিক কবিত্বরস পূর্ণ নয়, সেইজন্যে আমার বোধ হয়, ওগুলো অমিত্রাক্ষর ছন্দে করলে ওর গাম্ভীর্য ও কঠিনতা বেশ পরিস্ফুট হত।"[১৯]

৩. "পয়ার আটপায়ে চলে বলে তাকে যে কতরকমে চালানো যায় মেঘনাদবধ কাব্যে তার প্রমান আছে। তার অবতরণিকাটি পরখ করে দেখা যাক। এর প্রত্যেক

ভাগে কবি ইচ্ছামতো ছোটবড়ো নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েছেন, কোনো জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেননি। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীরমর্যাদা সুগম্ভীর হয়ে বাজল—'সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামনি বীরবাহু'; তার পরে তার অকাল মৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণপতাকার মতো ভাঙাছন্দে ভেঙে পড়লো 'চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে', তারপরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করলে—'কহ হে দেবি অমৃত ভাষিণী'; তারপর আসল কথাটা, যেটা সবচেয়ে বড়ো কথা, সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘ গর্জনের মতো এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে উদ্‌ঘোষিত হল—'কোন বীরবরে বরি সেনাপতি পদে পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষ কুলনিধি রাঘবারি'।[২০]

উদ্ধৃত অংশগুলোকে নাট্যসংলাপের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করলে সংলাপের 'গাম্ভীর্য ও কঠিনতা বেশ পরিস্ফুট হয়'—বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক 'মুদ্রারাক্ষসের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি প্রকাশিত। তাছাড়া অমিত্রাক্ষরকে গদ্যের মতো অর্থাৎ কথ্য ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসা সম্ভব একথা রবীন্দ্রনাথ অন্যত্রও বলেছেন। গদ্য বা কথ্য ভাষার নিকটবর্তী না হলে সংলাপ কৃত্রিম ও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে, এ কথাও তিনি মনে করতেন। সর্বোপরি অমিত্রাক্ষরের মাধ্যমে ছন্দ অর্থ ও ভাবগাম্ভীর্যের অনুগামী হতে পারে, তার বিচিত্র উত্থান-পতন একটি শরীরী তাৎপর্য লাভ করতে পারে। নাট্য সংলাপের ক্ষেত্রে এটি একটি আবশ্যকীয় উপাদান।

এ পটভূমিকা মনে রেখে 'রাজা ও রাণী' নাটকটির প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যের সংলাপ সামান্য বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। বিক্রম সুমিত্রার প্রেমমোহে আক্রান্ত হয়ে রাজকার্যে উদাসীন। সুমিত্রার কর্তব্যবুদ্ধি তাকে নানাভাবে জাগ্রত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ। তাই সে স্থির করেছে দেবদত্তের নিকট হতে রাজ্যের সকল সংবাদ নেবে, এজন্য সে দেবদত্তকে ডেকে পাঠিয়েছে। সুমিত্রার কর্তব্যবুদ্ধি ও শুভচেতনা সম্পর্কে দেবদত্তের স্পষ্ট ধারণা নেই, বিশেষতঃ রাজার অন্তঃপুরপ্রীতি তার মনে সুমিত্রার প্রতি কিছু ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। এ পরিস্থিতিতে উভয়ের সাক্ষাৎ—

১ দেবদত্ত। জয় হোক।

২. সুমিত্রা। ঠাকুর কিসের কোলাহল?

৩. দেবদত্ত। শোন কেন মাতঃ! শুনিলেই কোলাহল।
সুখে থাকো, রুদ্ধ করো কান। অন্তঃপুরে
সেথাও কি পশে কোলাহল? শান্তি নেই
সেখানেও? বল তো এখনি সৈন্য লয়ে

তাড়া করে নিয়ে যাই পথ হতে পথে
জীর্ণ চীর ক্ষুধিত তৃষিত কোলাহল।

৪ সুমিত্রা। বলো শীঘ্র কী হয়েছে।

৫ দেবদত্ত। কিছু না, কিছু না।
শুধু ক্ষুধা, হীন ক্ষুধা, দরিদ্রের ক্ষুধা।
অভদ্র, অসভ্য যত বর্বরের দল
মরিছে চীৎকার করি ক্ষুধার তাড়নে
কর্কশ ভাষায়। রাজকুঞ্জে ভয়ে মৌন
কোকিল পাপিয়া যত।

৬ সুমিত্রা। আহা কে ক্ষুধিত ?

৭ দেবদত্ত। অভাগ্যের দুরদৃষ্ট। দীন প্রজা যত
চিরদিন কেটে গেছে অর্ধাশনে যার
আজও তার অনশন হল না অভ্যাস
এমনি আশ্চর্য।

৮ সুমিত্রা। হে ঠাকুর, এ কি শুনি!
ধান্য পূর্ণ বসুন্ধরা, তবু প্রজা কাঁদে
অনাহারে ?

৯ দেবদত্ত। ধান্য তাব বসুন্ধরা যার।
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। এরা শুধু
যজ্ঞভূমে কুকুরের মতো লোল জিহ্বা
এক পাশে পড়ে থাকে, পায় ভাগ্যক্রমে
কভু যষ্টি উচ্ছিষ্ট কখনো। বেঁচে যায়
দয়া হয় যদি, নহে তো কাঁদিয়া ফেরে
পথ প্রান্তে মরিবার তরে।

উদ্ধৃত অংশে সুমিত্রার চারটি ও দেবদত্তের প্রথম স্বস্তিবচন বাদ দিলে চারটি করে সংলাপ আছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সুমিত্রার সংলাপ চারটি বিশেষ ভাবাবেগ প্রকাশ করছে। প্রথম সংলাপে উদ্বেগ, দ্বিতীয়টিতে আকুতি, তৃতীয়টিতে সমবেদনা ও চতুর্থটিতে বিস্ময়, মর্মব্যথা, আবেগ মূর্ত হয়ে উঠেছে—ফলে সংলাপের ভাষাতেও উল্লেখযোগ্য বিবর্তন সূচিত হয়েছে। প্রথম সংলাপ দুটি প্রায় গদ্য ভাষার রূপ পেয়েছে অর্থাৎ এর মাধ্যমে সুমিত্রার কর্তব্য বুদ্ধি তাকে প্রায় প্রাত্যহিকতার কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। কিন্তু দরিদ্র প্রজাদের দুর্ভাগ্য তার মানসিকতায় অভিঘাত সৃষ্টি করেছে, ফলে

ধীরে ধীরে সংলাপও পরিবর্তিত হয়েছে। তাই চতুর্থ সংলাপটিতে লক্ষ্য করা যায় অমিত্রাক্ষরের নির্দিষ্ট যতিপাতের মধ্যে আবেগকম্পন লেগেছে। অর্থাৎ সংলাপ ক্রমশঃ গদ্য ভাষা পরিত্যাগ করে কাব্য ভাষায় আশ্রয় নিয়েছে।

পক্ষান্তরে, দেবদত্তের প্রথম সংলাপের প্রথমাংশে কাটা কাটা যতিপাত ও ছোটো ছোটো বাক্যের মধ্যে তীব্র ব্যঙ্গের খোঁচা প্রকাশিত। কিন্তু পরক্ষণেই ("বল তো··· কোলাহল") তার ক্ষোভ তীব্র হয়ে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বাক্যে প্রবাহিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংলাপটিতে 'ক্ষুধা' শব্দটি চারবার এমন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে সেটা চেতনার ওপর হাতুড়ির মতো বারবার নিপতিত হয়ে পরিস্থিতির ভয়াবহতা প্রকট করে তুলেছে। তৃতীয় সংলাপটিতে 'অ'-এর অনুপ্রাসের মাধ্যমে যেন একটি দীর্ঘলালিত জড়তার ওপর আঘাত করা হয়েছে। পর পর এ তিনটি সংলাপে দেবদত্তের বাক্‌ভঙ্গি প্রায় গদ্য ভাষায় আশ্রয়ী। অবশ্য গোপন করার অভিলাষী হলেও তাঁর আবেগের মৃদু কম্পন যেমন অলক্ষ্য থাকে নি, তেমনি আপাত গদ্য ভাষার তির্যকতার মধ্যেও ছন্দপ্রবণতা উঁকি দিচ্ছে। অতঃপর চতুর্থ সংলাপটিতে তার সকল রুদ্ধ আবেগ, বেদনা, অভিযোগ ও জ্বালা সুমিত্রার সহানুভূতির স্পর্শে উদ্বেলিত হয়ে প্রচণ্ড প্রপাতের মতো ফেটে পড়েছে। ফলে সংলাপও আপাত গদ্য ভঙ্গী পরিত্যাগ করে কাব্যভাষা এবং তার অনুগামী ছন্দ বরণ করে নিয়েছে।

অবশ্য সকল কাব্যনাটকে রবীন্দ্রনাথ ভাব ও ভাষার এ পরিমিতিবোধ ও উপযোগিতা সর্বত্র বজায় রাখতে পারেন নি। কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথের হাতেই নাট্য-সংলাপের ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর চরম উৎকর্ষে উপনীত হয়েছিলো। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের শেষ পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আত্যন্তিক অনীহা দেখালেও মন্তব্য করেছিলেন—"ইহার সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবন্ধ···মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর আর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই।"[২১] অথচ এরপর রবীন্দ্রনাথ নাট্যরচনায় এ পদ্ধতি পরিহার করলেন। কাহিনীগ্রন্থের কিছু কাব্যনাট্য অবশ্য চিত্রাঙ্গদার পরে রচিত হয়েছিলো, কিন্তু তাকে পূর্ণাঙ্গ নাটক বলে গ্রহণ করা চলে না।

ছন্দ

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রবন্ধটিতে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশিত হয়েছিলো—"বাংলা পড়িবার সময় অনেক পাঠক অধিকাংশ স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করিয়া টানিয়া পড়েন। নচেৎ সমমাত্র হ্রস্বস্বরে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ কুলাইয়া উঠে না। বাংলার বক্তারা অনেকেই দীর্ঘ উচ্চারণ প্রয়োগ করিয়া বক্তৃতা বৃহৎ ও গম্ভীর করিয়া তোলেন। ভালো ইংরেজ অভিনেতার

অভিনয়ে দেখিতে পাওয়া যায় এক-একটি শব্দকে বেষ্টন করিয়া প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ কিরূপ উদ্দামগতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কিন্তু বাংলা অভিনয়ে শিথিল কোমল কথাগুলি হৃদয়স্রোতের নিকট সহজেই মাথা নত করিয়া দেয়, তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। এইজন্ত তাহাতে সর্বত্রই এক প্রকার দুর্বল সমায়ত সানুনাসিক ক্রন্দনস্বর ধ্বনিত হইতে থাকে। এইজন্ত আমাদের অভিনেতারা যেখানে শ্রোতাদের হৃদয় বিচলিত করিতে চান, সেখানে গলা চড়াইয়া অযথা পরিমাণে চিৎকার করিতে থাকেন এবং তাহাতে প্রায়ই ফললাভ করেন।"২২ অর্থাৎ বাঙলা শব্দের সাধারণ প্রকৃতি ভারহীন, ফলে সংলাপ উচ্চারণের সময় জোর আরোপ করতে হয়। এই জোর অভিনয়ে আরোপিত বলে তা কৃত্রিম হয়ে ওঠে, আবার 'শব্দের স্থায়িত্ব, গাম্ভীর্য' বাড়াতে গিয়ে অপ্রচলিত বা বড়ো বড়ো তৎসম শব্দ ব্যবহার করলে তা স্বাভাবিক হয় না। তার ওপর তাকে যদি ছন্দের নির্দিষ্ট মাত্রা ও যতিপাতের ওপর নির্ভর করতে হয়, তবে তা নাটকীয় হয়ে ওঠে বটে কিন্তু কথ্যভাষার সমীপবর্তী বিশেষ হতে পারে না।

নাট্যসংলাপ—তা অমিত্রাক্ষর বা অন্য যে কোনো ছন্দে লিখিত হোক না কেন—দুটি বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলতে বাধ্য। একদিকে উচ্চারণে কথ্যভঙ্গি এবং অন্যদিকে ভাষার অন্তর্গত ছন্দোস্পন্দ যুগপৎ বর্তমান থাকা চাই। তা hightened speech হতে পারে, কিন্তু আড়ষ্ট বা কৃত্রিম হলে চলবে না।

এখানেই ইংরেজী blank verse ও বাঙলা অমিত্রাক্ষর ছন্দের পার্থক্য। বাঙলা-ছন্দকে বিশেষজ্ঞ quantitative অর্থাৎ মাত্রাগত ও ইংরেজীছন্দকে qualitative বা গুণগত বলে অভিহিত করেছেন। অমিত্রাক্ষরে—যার ভিত্তি পয়ার—মাত্রা একান্তভাবে অক্ষর নির্ভর। প্রতি অক্ষরে একমাত্রা করে ধরা হয়। কিন্তু ইংরেজী ছন্দে "Accent অর্থাৎ উচ্চারণের সময়ে অক্ষরের আপেক্ষিক গাম্ভীর্যের উপরই ইহার ভিত্তি। ইংরেজী ছন্দের উপকরণ এক একটি foot বা গণ, এবং foot-এর পরিচয় accented ও un-accented অক্ষরের সমাবেশ রীতিতে।"২৩ ফলে ইংরেজী ছন্দের অন্তর্গত শব্দে প্রয়োজনীয় উচ্চারণ বৈচিত্র্য আরোপ করা সম্ভব। কিন্তু বাঙলার অক্ষরভিত্তিক মাত্রার সে সুযোগ কম। এ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন—"দীর্ঘ বক্তৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে। কিন্তু দ্রুত কথোপকথনে কথা ত গদ্যের মতো হইতেই হইবে। Shakespeare-এর অমিত্রাক্ষর Milton-এর অমিত্রাক্ষর হইতে পৃথক। Of man's disobedience ইত্যাদির একটা কাব্যের ঝঙ্কার আছে, কিন্তু To be or not to be that is the question—ইহা তো গদ্য বলিলেই হয়। তবে কবিতা বলিয়া ইহা চালান কেন? গদ্যে লিখিলে কি ক্ষতি হইত? কিন্তু তৎপরেই Who would bear whips and scorns of times কিংবা For in that sleep of death what dreams may come ইহা দস্তুর মত কবিতা। দেখিলাম যে Shakespeare-এ খানিক গদ্য, খানিক

পদ্য তথাপি দুইটি খাপ খাইতেছে। কারণ ইংরাজী ভাষার সেরূপ অবস্থা আসিয়াছিল। কিন্তু বাঙলাতে "তুমি যদি আস সখি, আমি সেথা যাবো" ইহার পরে "নবীন নিরদ শ্যাম নিকুঞ্জবিহারী" এরূপ রচনা অসহ্য বিসদৃশ বোধ হইবে। কিন্তু গদ্যে একত্রে উভয়েই চলে। গদ্যের এখন সে অবস্থা আসিয়াছে।"[২৪] উদ্ধৃত আলোচনায় বাঙলা ও ইংরেজী অমিত্রাক্ষর ছন্দের পার্থক্য ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ধারণা ইংরেজী ছন্দ কালক্রমে এ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, বাঙলায় তা এখনো সম্ভব হয়নি। সেজন্য তিনি লিখেছেন—"অমিত্রাক্ষরের নাটক এখন চলিতে পারে না।"[২৫] আসলে স্ব স্ব ভাষার মাত্রাগত বৈশিষ্ট্য যে উভয় ছন্দে প্রতিফলিত তা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অমিত্রাক্ষরে সকল পর্ব জোড়মাত্রার। তাই শব্দগুলো প্রায়ই জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। মধুসূদন অবশ্য তিন, সাত প্রভৃতি বেজোড়ে যতিস্থাপনা করেছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র প্রমুখের কাছে তা সরল নয় বলে পরিত্যক্ত হয়েছিলো। আর সরল যতিস্থাপনা না করলেও পর্বের জোড়মাত্রার প্রবণতা এড়ানো অমিত্রাক্ষরে কঠিন। আমরা যখন কথা বলি তখন আমাদের ব্যবহৃত সকল শব্দ নিশ্চয়ই জোড়া বেঁধে আসে না। কাজেই কথ্যভাষার সকল মাধুর্য জোড়াশব্দের কাঠামোয় (frame) ধরা পড়ে না। কাব্যে তা মানানসই হতে পারে কিন্তু নাট্যসংলাপে স্বভাবতঃই তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা এসে পড়ে। দ্বিজেন্দ্রলাল এই জোড়া শব্দের কাঠামোয় কথ্যভাষার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে অভিলাষী হয়েছিলেন—অমিত্রাক্ষরে রচিত তাঁর নাটক 'তারাবাই'তে তার স্বাক্ষর আছে। কিন্তু সমকালীন দর্শকের কাছে তা হাস্যকর মনে হয়েছিলো। কেননা তাতে অমিত্রাক্ষরের high pitch বা উচ্চগ্রামে ছিলো অনুপস্থিত, অথচ কথ্যভাষার inner rhythm-ও পরিস্ফুট হয় নি। 'তারাবাই-এর ছন্দ সম্পর্কে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"এই অভিনব ভাঙ্গাছন্দে অভিনেতৃবর্গ অভিনয় করিত। যবনিকা পড়িলে দর্শকরাও তাহার অনুকরণে নিজেদের মধ্যে কথা কহিত।
যথা—

একজন বলিল—কোথা যাইতেছ ?
দ্বিতীয় উত্তর দিল—খাইবারে জল ; তুমি যাবে ?
১ম—নহে বন্ধু।
২য়—উত্তম, আমি তবে আসি।"[২৬]

কাজেই নাট্যসংলাপে সকল রাগিনী অক্লেশে বাজানোর জন্য প্রয়োজন হলো নতুন ছন্দ। অমিত্রাক্ষরের অভিজ্ঞতার পর রবীন্দ্রনাথ—এবং দ্বিজেন্দ্রলাল—অতঃপর তারই সন্ধানী হলেন।

সাত

ইতিমধ্যে রাজকৃষ্ণ রায় নাট্যসংলাপের ছন্দ নিয়ে আরেকটি পরীক্ষা করেছিলেন :

'রাজা বিক্রমাদিত্য' নাটকে তিনি এ ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন "আভিনয়িক পদ্য পঙ্‌ক্তি গদ্য"। এ সম্পর্কে নাটকটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—"সম্প্রতি এই 'রাজা বিক্রমাদিত্য' নাটকখানি আভিনয়িক ছন্দের পরিবর্তে নূতন ধরনের গদ্যে রচিত হইল। ইহা আভিনয়িক পদ্য-পঙ্‌ক্তি গদ্য।...অভিনেতৃগণের পক্ষে পদ্য যেরূপ সহজ অভ্যাসের সামগ্রী, গদ্য সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত আমি সহজে অভ্যস্ত হইবার সুবিধার জন্য এই নূতন ধরনের গদ্য নাটক লিখিলাম। আমার বিবেচনায় প্রচলিত ধরনের গদ্যাপেক্ষা এরূপ পদ্য-পঙ্‌ক্তি ধরনের গদ্য নাটক লিখিলে অভিনয় ও অভিনেতৃবর্গের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। বিশেষতঃ বাগ্‌ধৃতি বা বাকৃপূর্তির (Prompting) পক্ষে এইরূপ গদ্যপঙ্‌ক্তি যেমন অভিনয়-ব্যাঘাত-নিবারণের সুগম উপায়, টানা গদ্য-পঙ্‌ক্তিতে তেমন হইতে পারে না।" অর্থাৎ এ ছন্দ অবলম্বনের কারণ হিসেবে অভিনয়ের মহলা ও প্রম্পটিংয়ের সুবিধের কথা উল্লেখ করেছেন। গিরিশচন্দ্রের 'কমলে কামিনী' নাটকেও এরূপ পদ্ধতিতে রচিত সংলাপ রয়েছে। উভয়নাটক থেকে কিছু নমুনা উদ্ধৃত হলো—

১. বিক্রমাদিত্য —ওঃ কি ভয়ানক অন্ধকার!
এক কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী,
তাতে আবার বৃক্ষের পর বৃক্ষ—অনন্ত বৃক্ষ।
বিশাল আকাশের ক্ষীণালোক
অরণ্যহৃদয়ে প্রবেশ কত্তে পাচ্চে না।
যতদূর দেখি—কেবল অন্ধকার।
নৈশ সমীরণ সন্‌ সন্‌ শব্দে বচ্চে,
বৃক্ষ পত্র কম্পিত হচ্চে
কিন্তু দেকতে পাচ্চি না।
আমার সহস্রমুখী আশা এইরূপ।—
আশা কেবল দুলচে
কিন্তু সফলতার দর্পণে দেখা দিচ্চে না।
[রাজা বিক্রমাদিত্য প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য]

২ লহনা।—আবার উড়বি কি লো?
ভাতার আর যেন কারো বিদেশে যায় না।
আমি যেন ছেড়ে দিয়েছি,
নইলে ভাতার
তোর তো একলার নয়,
আমার কি প্রাণ কাঁদে না?

কিন্তু আমরা সেকেলে মেয়ে,
আমাদের উড়ে পুড়ে যেতে
সাধ হয় না !

[কমলে কামিনী—প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

উদ্ধৃত সংলাপকে প্রাথমিক পরীক্ষায় মনে হবে নাট্যকার সম্ভবত বাঙলা ছন্দের অক্ষরভিত্তিক মাত্রা ও নির্দিষ্ট মাত্রাসহ পর্বকে ভেঙে একটি নতুন বোধ আনতে সক্ষম হয়েছেন, ফলে বাঙলা ছন্দ সংলাপের নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে। কিন্তু সামান্য লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটি অন্য। আসলে উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণ কথ্য ভাষাকে পদ্যের পঙ্ক্তিতে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সাজানোতে কোন জৈব তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়নি। এতে পদ্যছন্দের স্পন্দন নেই, আবার গদ্যছন্দের inner rhythm-ও অবর্তমান। যে কোন ধরণের বাক্যকে ভাঙলেই গদ্যছন্দ হয় না। তাছাড়া, ভাষাকে আবেগ-তড়িৎস্পর্শে উজ্জীবিত না করলে উপযুক্ত ছন্দ স্পন্দন অসম্ভব।

রাজকৃষ্ণ রায়ের 'আভিনয়িক পদ্য পঙ্ক্তি গদ্যকে' যদি নাট্যসংলাপের স্বতন্ত্র শ্রেণী বলে স্বীকার করতে হয় তবে তার সার্থক প্রকাশ ঘটেছিলো রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা' নাটকে। সেখানে নাট্যকার যেভাবে পঙ্ক্তি বিন্যাস করেছিলেন তাকে শুধুমাত্র গদ্যভাঙা বলা যায় না, যথা—

কবি।— গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।
আমরা মানি ছন্দ, জানি এক ঝোঁকা হলেই তাল কাটে।
মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে
চাল চলন যার একপাশে বাঁকা ;
কুম্ভকর্ণের মতো গঠন যার বেমানান,
যার ভোজন কুৎসিত
যার ভোজন অপরিমিত।
আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মানো কঠোরকে।
অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।
বাইরে ঠেলামারার উপর বিশ্বাস,
অন্তরের তালমানের উপর নয়।

কিন্তু এখানেও বাক্যের গঠন, ক্রিয়াপদের বিন্যাস এবং সর্বনাম ও বিশেষণ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য একে গদ্য কবিতার সমীপবর্তী করে তোলে ; তার নিকট আত্মীয়তা 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে, নাট্যসংলাপের ক্রিয়াপ্রাণতা ও প্রবহমানতার সঙ্গে নয়।

'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় রাজেন্দ্রলাল একবার লিখেছিলেন "যে অবস্থায় যে ব্যক্তি যে ভাষা কহিতে পারে, নাটকে তাহাই প্রয়োগ করা কর্তব্য; তদন্যথায় রঙ্গভূমিতে পয়ারে রোদন, ত্রিপদীতে রাগ, বা চৌপদীতে বীরত্ব ব্যক্ত করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।"[২৭] বাঙালী নাট্যকারগণ দীর্ঘকাল ভাব-অনুযায়ী নাট্যভাষা অন্বেষণ করেছেন এবং সে ভাষা কখনো প্রচলিত পয়ার-ত্রিপদী, কখনো অমিত্রাক্ষর-গৈরিশ এবং কখনো বা গদ্যকে আশ্রয় করেছে। এদের মধ্যে গৈরিশছন্দই দর্শক ও সমালোচকদের মুগ্ধ করেছিলো সর্বাধিক। গৈরিশছন্দে রচিত শেষ উল্লেখযোগ্য বাঙলা নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণ' (১৯২৬)। ইতিমধ্যে গদ্যভাষা প্রধানত: দ্বিজেন্দ্রলালের প্রচেষ্টায় সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটকে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। এবং রবীন্দ্র নাট্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল—সাংকেতিক নাটক—গদ্য ভাষাতেই রচিত হয়েছিলো।

বাঙলা সংলাপের এই ছন্দরীতি থেকে গদ্যভাষায় বিবর্তন দুটি কারণে সংঘটিত হয়েছিলো। প্রথমত, অমিত্রাক্ষর বা গৈরিশছন্দ—পূর্বেই আলোচিত হয়েছে—অক্ষরভিত্তিক মাত্রা ও জোড়মাত্রার পর্ববিশিষ্ট হওয়ায় তার মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে গিয়েছিলো। গদ্য সংলাপ তার থেকে মুক্তি পাবার একটি পন্থা বলে বিবেচিত হয়েছিলো। দ্বিতীয়ত, যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন বিষয়বস্তু ভিন্নতর হলো, তখন তার উপযোগী সংলাপ গদ্যেই রচিত হলো।

মধুসূদন অমিত্রাক্ষরের উদ্ভাবক হলেও নাটকে তার পূর্ণ প্রয়োগে বাধাপ্রাপ্ত হলেন। সমসাময়িক অভিনেতৃ-সম্প্রদায়ের অক্ষমতা ও সুধীবৃন্দের নিরুৎসাহ তাঁকে এ বিষয়ে নিরস্ত করেছিলো। অমিত্রাক্ষর সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুকে তিনি লিখেছেন—"The fact is, my dear fellow, that the prevalence of Blank Verse in this country, is simply a question of time. Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank Verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the Language.[২৮] সমকালীন অভিনেতাদের পক্ষে guide their voices by the pause সম্ভব হয় নি। তাছাড়া "we want the public ear to be attuned to the melody of the Blank Verse।[২৯]

অথচ নাটকে অমিত্রাক্ষর প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর ব্যাকুলতা ছিলো আন্তরিক। অমিত্রাক্ষরে রচিত তাঁর 'সুভদ্রাহরণ' নাট্যকাব্যের যেটুকু লেখা হয়েছিলো কেশব গঙ্গোপাধ্যায় তা হারিয়েই ফেলেছিলেন। পৃষ্ঠপোষকবর্গের কাছ থেকে এরূপ উৎসাহের অভাবে তিনি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হয়েছেন "আমাদিগের সুমিষ্ট মাতৃ ভাষার

রঙ্গভূমিতে গদ্য অতীব সুশ্রাব্য হয়। এমন কি, বোধ করি অন্য কোনো ভাষায় তদ্রূপ হওয়া সুকঠিন "[কৃষ্ণকুমারীর ভূমিকা]। অথচ তিনি মনে করতেন "অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য" [ঐ]।

মধুসূদন গদ্যসংলাপে দুটি রীতি অবলম্বন করেছিলেন। প্রহসনের জন্য আঞ্চলিক ভাষার একান্ত কথ্যরূপ এবং নাটকে শিষ্টরূপ। প্রহসন দুটিতে বিষয়বস্তু ও ভাষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ মেলবন্ধন রচিত হয়েছিল, পরিস্থিতি ও চরিত্রানুগ সংলাপ একটি বৈদ্যুতি এনে দিয়েছিলো। কিন্তু প্রথম নাটক দুটির গদ্য ভাষায় সংস্কৃত রীতির আধিপত্য সংলাপকে আড়ষ্ট করে দিয়েছিলো, বাঙলা ভাষার নিজস্ব কাঠামোতে তা বিকশিত হয়ে ওঠে নি। কথোপকথন যদি বর্ণনার সীমা অতিক্রম করে ক্রিয়াভিমুখী না হয় তবে সংলাপ প্রাণহীন হতে বাধ্য। পূর্বেই বলা হয়েছে, গদ্য সংলাপ সার্থক হতে পারে না যদি তার inner rhythm সঠিকভাবে অভিব্যক্ত না হয়। এই inner rhythm নির্ভর করে প্রধানত: বাক্য গঠনের বৈশিষ্ট্য, উপযুক্ত ক্রিয়াপদ প্রয়োগের মুন্সীয়ানায় সঠিক অন্বয় ও যতিপাতে, অলঙ্কারের সুমিত ব্যঞ্জনায় এবং প্রয়োজনীয় আবেগসঞ্চারণে। তাছাড়া স্তানিস্লাভস্কির মতে—There should never be any soulless or feelingless word used on the stage. Words should no more be divorced from ideas there than from action. On the stage it is the part of the word to arouse all sorts of feelings, desires, thoughts, inner images, visual, auditory, and other sensations in the actor, in those playing opposite him and through them together in the audience.[৩০]

স্তানিস্লাভস্কি আরো বলেছেন যে spoken word বা text of the play যথার্থ মূল্যবান হতে পারে তখনই যখন inner content of subtext দ্বারা সে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন—The 'subtext' is a web of innumerable varied inner movements, objects of attention, smaller and greater truths and a belief in them, adaptations, adjustments, and other similar elements[৩১]

এ পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে বলা যায়, শর্মিষ্ঠা, বা পদ্মাবতীর তুলনায় কৃষ্ণকুমারীর সংলাপে মধুসূদন কৃতিত্ব দেখালেও তা উপরোক্ত সর্ত পূরণ করতে পারেন নি। উদাহরণস্বরূপ কৃষ্ণকুমারী নাটকের একটি আবেগরুদ্ধ মুহূর্তের সংলাপ উদ্ধৃত হলো—

কৃষ্ণা। কাকা ; আপনি এমন কথা মুখেও আনবেন না। আপনি আমাকে বাল্যকালাবধি প্রাণতুল্য ভালবাসেন তা আপনি এখন আমার সকল অপরাধ মার্জনা

স্বপ্ন আমাকে বিদায় দেন। পিতঃ আপনি নরপতি; বিধাতা আপনাকে কত শত সহস্র প্রাণীর প্রতিপালন কত্তো এই রাজপদে নিযুক্ত করেছেন; তা আপনার, তাদের সুখদুঃখ বিস্মৃত হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন। আপনি নীরব হলেন কেন? আমি কি অপরাধ করেছি যে, আপনি আমার সঙ্গে কথা কবেন না? পিতঃ, আপনার এত আদরের মেয়েকে এইবার শেষ আশীর্বাদ করুন, যেন এ ভব-যন্ত্রণা হতে মুক্ত হয়ে সুরপুরীতে যেতে পারি।

[পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, নাটকে পরিস্থিতি তখন অত্যন্ত জটিল ও স্পন্দমান। দেশপ্রেম, কর্তব্য, অক্ষমতা, স্নেহ মঞ্চে উপস্থিত সকলের মধ্যেই প্রচণ্ড মানসিক অভিঘাত সৃষ্টি করেছে, আর মাত্র গুটি সাতেক সংক্ষিপ্ত সংলাপের পরেই কৃষ্ণা আত্মহত্যা করবে। তার আত্মোৎসর্গের সঙ্কল্প তখন স্থির। একটি অপাপবিদ্ধ কিশোরীকে সকলের প্রীতিভালবাসার মধ্যেও নিতান্ত অসময়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। অথচ সংলাপে তার অনুভাব সঠিকভাবে অভিব্যক্ত হয়নি। 'বাল্যকালাবধি প্রাণতুল্য ভালবাসেন'—বাক্যটি হৃদয়ের উত্তাপস্পর্শলাভে বঞ্চিত; তার পরবর্তী পঙ্‌ক্তি—পিতার রাজকর্তব্য বর্ণনা—অত্যন্ত গতানুগতিক বা formal এবং শেষ বাক্য—"পিতঃ আপনার আদরের মেয়েকে" ইত্যাদি—মনে হয় আরোপিত, কৃষ্ণায় সমগ্র ব্যক্তিসত্তা মন্থন করে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উৎসারিত নয়। এর subtext বা varied inner movements প্রবল অনিবার্যতা নিয়ে এখানে আবির্ভূত হয় নি।

পক্ষান্তরে, কৃষ্ণার সংলাপটিকে যদি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা যায়, তাহলে হয়তো ভীমসিংহ বা বলেন্দ্রের প্রতি তার উক্তিতে একটি ভিন্নমাত্রা আসে—"প্রাণতুল্য ভালবাসেন" বা প্রজাদের "সুখদুঃখ বিস্মৃত হওয়া কোন মতেই উচিত হয় না" প্রভৃতি বাক্যাংশে তির্যক ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে। কিন্তু তাহলে কৃষ্ণা চরিত্রের মূল ভিত্তি ও development-এর সঙ্গে সংলাপটি সঙ্গতিহীন হয়ে পড়ে। নাট্যতত্ত্ববিদ নিকল সংলাপকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন—ordinary speech ও patterned language। তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলা যায়, মধুসূদন—এবং দীনবন্ধু—ordinary speech ব্যবহারে অভূতপূর্ব কৃতিত্ব দেখালেও তাঁদের patterned language অনেক আড়ষ্ট ও আরোপিত। হানিফ ভক্তপ্রসাদ তোরাব আদুরীর সংলাপ যযাতি ইন্দ্রনীল এমন কি ভীমসিংহ কৃষ্ণার তুলনায় প্রাণবন্ত, যথাযথ ও inner movement-য়ের সঙ্গে জড়িত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপ সম্পর্কেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে। তিনজন নাট্যকার রচিত সংলাপ উদ্ধৃত হলো:

১. রাজা।...রজনীদেবী বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম দেখে এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন; আর চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি মনিময় আভরণ পরিত্যাগ করে, চামুণ্ডারূপে গর্জন

কচ্যেন। উঃ। কি ভয়ানক ব্যাপার। কি কালস্বরূপ অন্ধকার। হে তমঃ, তুমি কি আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছ? উঃ। মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃপুনঃ ঐ দীপ্তিমান কশাঘাত করে যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত কচ্যেন। বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব্দ। একি প্রলয়কাল। তা আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হউক না?

[কৃষ্ণ কুমারী : পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

২. সরলতা।...মাগো, তুমি কখন উঠিয়া আসিয়াছ? আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সতত তোমার সেবায় রত আছি, আমি কি এত অচৈতন্য হয়্যে পড়েছিলাম? তোমায় সুস্থ করিবার জন্যে আমি তোমার পতিকে যমরাজার বাড়ী হইতে আনিয়া দিব স্বীকার করিয়াছি, তুমি কিঞ্চিৎ স্থির রহিয়াছিলে। এই ঘোর রজনী, সৃষ্টি সংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালের ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত; আকাশমণ্ডল ঘনতর-ঘনঘটায় আচ্ছন্ন; প্রাণী মাত্রেই কালনিদ্রারূপ নিদ্রায় অভিভূত; সকলি নীরব; শব্দের মধ্যে অরণ্যাভ্যন্তরে অন্ধকারাকুল শৃগালকুলের কোলাহল এবং তস্করনিকরের অমঙ্গলকর কুক্কুরগণের ভীষণ শব্দ; এমত ভয়াবহ নিশীথ সময়ে জননী, তুমি কিরূপে একাকিনী বহির্দ্বারে গমন করিয়া মৃত পুত্রকে আনয়ণ করিলে?

[নীলদর্পণ : পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

৩. লক্ষণসিংহ। (স্বগত) হিমাচল! বিন্ধ্যাচল। তোমাদের কঠিনতম দুর্ভেদ্য পাষাণে আমার হৃদয়কে পরিণত কর; কিন্তু না,—তোমরাও তত কঠিন নও,—তোমরাও দুর্বল হৃদয়, তোমরাও বিগলিত তুষাররূপ অশ্রুবারি বর্ষণ করে ক্ষীণতার পরিচয় দেও। জগতের আরও যদি কিছু কঠিনতর সামগ্রী থাকে,—লৌহ—বজ্র—তোমরা এস,—কিন্তু না-না—পাষাণই হোক্—লৌহই হোক—বজ্রই হোক্, সকলই শতধা বিদীর্ণ হয়ে যাবে, যখনই সেই নির্দোষী সরলাবালা একবার করুণ স্বরে পিতা বলে সম্বোধন করবে। —হা! আমি কি এখন পিতা নামের যোগ্য?—আমি কি সরোজিনীর পিতা?—না —আমি তার পিতা নই—আমি তার কৃতান্ত—অতি দারুণ নিষ্ঠুর কৃতান্ত।

[সরোজিনী : প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে উপরোক্ত সংলাপ তিনটি উদ্ধৃত হলো। তিনটির মধ্যে একটি সাধারণ মিল আছে, তিনটিই নাটকের ট্র্যাজিক আবেগ-সংহতি (tragic intensity)-কে প্রকাশ করছে। ট্র্যাজিক প্রগাঢ়তা প্রকাশ করার জন্যে স্বভাবতঃই ভাষার আবেগ ও কবিত্বের প্রয়োজন হয়। এখানে তিনজন নাট্যকার পরিস্থিতি ও অনুভাবের উপযোগী ভাষাসৃজনে কিরূপ সাফল্যলাভ করেছেন দেখা যাক।

দ্বিতীয় সংলাপটি প্রাথমিক বিচারেই বাতিল হতে বাধ্য। ক্রিয়াপদ ও শব্দ ব্যবহারে আড়ষ্টতা, চরিত্রের পক্ষে বেমানান উক্তি ["আমি তোমার পতিকে যমরাজার

"ত্রী হইতে" ইত্যাদি], দীর্ঘসমাসবদ্ধপদ ও অন্বয়ের গোলমাল এবং আরোপিত অলঙ্কারের কৃত্রিম বাহুল্য সংলাপটিকে অস্বাভাবিক করে তুলছে। শেষ বাক্যটির দৈর্ঘ্যও বিরক্তিজনক। সর্বোপরি, ভাষার আবেগ ও আভ্যন্তরীণ-বেগ (inner movement) একেবারেই নেই।

প্রথম সংলাপটিতে ভাষার চলিত ভঙ্গী ও শব্দব্যবহারে শিষ্ট রীতি অক্লেশে জোড়া লাগে নি। একবার হ্রস্ব ও একবার দীর্ঘ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে বটে কিন্তু তাতে আশানুরূপ ধ্বনি গাম্ভীর্য ও উত্থান-পতন আসে নি। অলঙ্কারও চরিত্রের মানসিক অভিঘাতের আন্তর-সামগ্রীরূপে প্রকাশিত হয়নি। ফলে সংলাপটির subtext প্রায় অনুপস্থিত থেকে গেছে।

তৃতীয় সংলাপটির প্রবহমানতা তুলনামূলকভাবে বেশি। তার প্রধান কারণ 'সরোজিনী' রচনাকালে বাঙ্‌লাগদ্য অনেক স্বচ্ছন্দ হয়ে এসেছিলে', তখন গদ্য ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা দ্বারা পরিমার্জিত। কৃষ্ণকুমারীর গদ্য ভাষাকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের প্রাথমিক পর্বের নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'সরোজিনী'র সংলাপ উপযুক্ত প্রসাদগুণ ও inner movement প্রকাশিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। বাক্যগঠনে লঘুভঙ্গি, বিশেষত কাটা কাটা বাক্য ব্যবহারে আবেগের স্বচ্ছন্দ বিহার ব্যাহত হয়েছে মনে হয়। অলঙ্কারও কোন আভ্যন্তরীণ তাৎপর্য নিয়ে প্রস্ফুটিত হয়নি।

নয়

অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'সাধারণী' পত্রিকায় লিখেছেন যে গিরিশচন্দ্রের ছন্দে "মাত্রার এতই বৈষম্য আছে যে, অনেক সময় গদ্য বলিয়া বোধ হয়। গদ্যপদ্যের এইরূপ সমভাবকরণ দ্বারা ভাষা সম্পূর্ণ নাটকের উপযোগিনী হইয়াছে। ইহাতে গদ্যের নীরসতা নাই, প্রবাহ আছে। পদ্যের সমমাত্রা বৃত্তি বা একঘেয়ে ভাব নাই, অথচ মিষ্টতা আছে।" আমরা আলোচনা করে দেখেছি অক্ষয়চন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত সঠিক যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। গিরিশচন্দ্রের সংলাপে পদ্য থেকে গদ্যে সঞ্চরণ সহজ ও সাবলীল হয় না। ফলে গৈরিশছন্দ যে নাটকে তিনি ব্যবহার করেছেন সেখানেও ছোট সংলাপ বা দ্রুত উক্তি-প্রত্যুক্তি রচনায় গদ্যভাষার আশ্রয় নিয়েছেন—

অহল্যা। আপনি পালঙ্কের উপর উপবেশন করুন।

বিল্ব। না আমি তোমায় দেখব—এইখান থেকেই দেখব।

এরপরেই বিল্বমঙ্গলের স্বগতোক্তি দীর্ঘ সংলাপ রচিত হয়েছে গৈরিশছন্দে আটত্রিশ ছত্রে। তারপরেই আবার—

বিল্বমঙ্গল। (প্রকাশ্যে) তোমার অলঙ্কার থেকে দুটি কাঁটা খুলে দাও। (অহল্যার

তদ্রূপকরণ) মা তোমার স্বামীকে বলগে—আমি তোমার পাগল ছেলে। যাও মা, তোমার পতি আজ্ঞা—আমার কথা হেলন কত্তে নেই।

অহল্যা। কে এ মহাজন। (প্রস্থান) [বিল্বমঙ্গল ঠাকুর : তৃতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক]

অতঃপর আবার গৈরিশছন্দে বিল্বমঙ্গলের সংলাপ সুরু হয়েছে।

এরূপ প্রচুর উদাহরণ গিরিশচন্দ্রের নানা নাটক থেকে উদ্ধৃত করা চলে। এ নিয়মের ব্যত্যয় থাকলেও তাঁর নাট্যসংলাপের সাধারণ প্রবণতা এরূপ।

গিরিশচন্দ্রের গদ্যসংলাপে ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ দত্ত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি শব্দকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন—সাধু বা দরবারী ভাষা এবং গ্রাম্যভাষা ও স্ত্রীলোকের ভাষা। অতঃপর তাঁর সিদ্ধান্ত—"গ্রাম্যভাষায় যেরূপ জাতির মনোভাব প্রকাশ করা যায় সাধুভাষার দ্বারা তদ্রূপ পারা যায় না। জাতির অভিজ্ঞতানুযায়ী সংক্ষেপে যে সকল শব্দ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই হইল গ্রাম্যভাষা ও গ্রাম্যনারীদিগের ভাষা। গ্রাম্যভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিলে ঠিক জাতির প্রাণ-স্পর্শ করে।"৩২ সমালোচক এই সূত্র অনুযায়ী গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংলাপে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাম্যভাষা কিরূপ কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে তার দীর্ঘ উদাহরণ দিয়ে মন্তব্য করেছেন—"প্রচলিত শব্দের উপর গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত আধিপত্য ছিল। বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক শ্রেণী, প্রত্যেক বর্ণের কিরূপ ভাষা ও আচরণ তাহা তিনি অতি সংক্ষেপে ভাষা বা শব্দ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ ভাষাজ্ঞান,—ব্যক্তি ও স্থানবিশেষে শব্দবিন্যাস, জগতে অতি অল্প সংখ্যক লেখকের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু শব্দ নহে, বলিবার ভঙ্গী এবং উচ্চারণও তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। কি ইংরাজের বাংলা, কি আরমানির বাংলা কি নবাবী বাংলা, কি দুলে-বাগ্দীর বাংলা, কি গুড়হাটার মুছলমানের বাংলা, কি জেলে মালোর, কি মাঝিমাল্লার বাংলা, কি ভটচাজ্জির বাংলা, কি বকাটে ছোঁড়ার বাংলা, কি ইংরেজী শিক্ষিত নব্যবাবুর বাংলা,... বহুবিধ শ্রেণীর শব্দ, বাক্যবিন্যাস ও উচ্চারণ তিনি নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত যত শ্রেণীর নরনারী বাঙ্গালা দেশে বাস করে, তাহারা নিজ শ্রেণীর ভিতর দিয়া কিরূপ কথাবার্তা বলে, গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকে অনুরূপ ছায়াচিত্র (photo) রাখিয়া গিয়াছেন।"৩৩ প্রাথমিক বিচারে সমালোচকের সিদ্ধান্ত সঠিক বলে মনে হবে, কিন্তু তাঁর পুস্তকে উদ্ধৃত উদাহরণগুলো সম্যক অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে বাণত প্রতিশ্রেণীর জনসাধারণের ভাষায় কিছু বৃত্তিগত উল্লেখ ও mannerism তাদের স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, ভাষা বা শব্দের কোনো আভ্যন্তরীণ প্যাটার্ন (internal pattern) দ্বারা তা আভাষিত হয় নি। বিশেষত প্রতি জাতির কথ্য ভাষায় একটি আভ্যন্তরীণ ছন্দ আছে, উপযুক্ত নাট্য সংলাপে তার যথার্থ প্রতিফলন হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে বিখ্যাত নাট্যকার John M. Synge একটি উল্লেখযোগ্য

মন্তব্য করেছেন—in countries where the imagination of the people and the language they use is rich and living, it is possible for a writer to be rich and copious in his words and at the same time to give the reality which is root of all poetry, in a comprehensive and natural form.[৩৪] গিরিশচন্দ্রের গদ্যভাষায় এই poetic reality প্রায়নেই। তিনি দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা অনুকরণ করেছেন মাত্র, তার মধ্য দিয়ে কোনো নিজস্ব ছন্দ প্রবাহিত করাতে পারেন নি। ডা: আশুতোষ ভট্টাচার্য এ সম্পর্কে লিখেছেন—"প্রত্যেক জাতির ভাষার মধ্যেই একটি বিশেষ প্রাণশক্তি (Vitality) আছে। জাতির প্রবাদ-প্রবচন, বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ ইত্যাদি ব্যবহারের মধ্য দিয়াই ভাষার সেই প্রাণশক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু এই বিষয়ে রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, এমন কি অমৃতলাল বসুরও যে অধিকার ছিল গিরিশচন্দ্রের তাহা ছিল না; ইহাদের ব্যবহার তাঁহার গদ্যভাষায় যে তুলনায় অকিঞ্চিৎকর সেই তুলনায় তাঁহার ভাষা দুর্বল।"[৩৫] তাঁর নাটকের গদ্যসংলাপ উত্তর কোলকাতার কথ্য ভাষার অনুগামী, তা বিশেষভাবে আঞ্চলিক। এই আঞ্চলিক ভাষাকে সর্বস্তরের নাটকের সংলাপে প্রয়োগ করতে গিয়ে স্বভাবতই তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা এসে পড়েছে। তাই সমালোচক যখন বলেন—it is obvious that the language of the theatre—derived from the rhythms and phrases of the spoken tongue its most effective power of expression, while taking its stand on a higher and very different plane[৩৬],—তখন গিরিশচন্দ্র ব্যবহৃত কথ্যভাষার এই higher and different plane-য়ে স্বচ্ছন্দ বিহারে অক্ষমতা প্রকট হয়ে ওঠে।

দশ

১. সাজাহান। ইচ্ছা কর্চ্ছে জাহানারা, যে এই রাত্রির ঝড়বৃষ্টি অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে একবার ছুটে বেরোই। আর, এই শাদা চুল ছিঁড়ে, এই বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে এই বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিই। ইচ্ছা কর্চ্ছে যে আমার বুকখানা খুলে বজ্রের সম্মুখে পেতে দিই। ইচ্ছা কর্চ্ছে যে এখান থেকে আমার আত্মাকে টেনে ছিঁড়ে বার করে তা ঈশ্বরকে দেখাই। ঐ আবার গর্জ্জন। মেঘ! বার বার কি নিস্ফল গর্জ্জন কর্চ্ছ? তোমার আঘাতে পৃথিবীর বক্ষ খান খান করে দিতে পারো? অন্ধকার? কি অন্ধকার হয়েছো। তোমার পিছনে ঐ সূর্য নক্ষত্রগুলোকে একেবারে গিলে খেয়ে ফেলতে পারো?

[সাজাহান : পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

২. চাণক্য। না, এ সম্ভব না। এ ছলনা; প্রতারণা; ষড়যন্ত্র। তোমার ষড়যন্ত্র কাত্যায়ণ।—না এ যে সেই মুখ, সেই চক্ষু দুটি। আত্রেয়ী—মা আমার। এতদিন

সন্তানকে ভুলে ছিলি। কোথায় ছিলি পাষাণী মা!—কাত্যায়ন। শোন কুঞ্জবনে একটা সামস্তোত্র উঠছে না? দেখ ঐ নদী আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। আকাশ থেকে একটা স্নিগ্ধ সৌরভ হিল্লোল ভেসে আসছে। আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। আমায় কুটিরে নিয়ে চলো কাত্যায়ন। [চন্দ্রগুপ্ত: পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য]

৩. পৃথ্বীরাজ। হাঁ প্রতাপ! অধম ভালুককে যাদুকর নাচায়; কিন্তু কেশরী গহনে নির্জনে গরিমায় বাস করে। দীপ অনেক; কিন্তু সূর্য এক। শস্যশ্যামল উপত্যকাকে মানুষ চষে, চরণে দলিত করে; কিন্তু উত্তুঙ্গ পর্বত গর্বিত দারিদ্র্যে শির উন্নত করে থাকে। প্রতাপ। সংসারী তার ক্ষুদ্র প্রাণ, তার ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ তার ক্ষুদ্র অভাব বিলাস নিয়ে থাকে। মধ্যে মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত দেহে, রুক্ষ কেশে, অনশনে সিদ্ধ সন্ন্যাসী এসে নূতন তত্ত্ব, নীতি, ধর্ম শিখিয়ে যান। অত্যাচারীর উন্মুক্ত তরবারি তাঁদের সত্যের জ্যোতিকে বিকীর্ণ করে, নিরন্ধ্র কারাগারের অন্ধকার তাঁদের মহিমাকে উজ্জ্বল করে, অগ্নির লেলিহান জিহ্বা তাঁদের কীর্তি প্রথিত করে। তুমি সে সন্ন্যাসী, প্রতাপ, তুমি মাথা হেঁট কর্বে। [রাণা প্রতাপ সিংহ: চতুর্থ, অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্য]

৪. মানসী। অজয় দেশান্তরে গিয়েছে। অজয়। চলে যাবার আগে একবার দেখাও করে যেতে পার্তে। শুদ্ধ একখানি পত্রে শুষ্ক ক্ষুদ্র পত্রে এ কথাটা জানিয়ে "জন্মের মতো বিদায়টি" এসে নিয়ে যেতে পার্তে। অজয়। অজয়!—

নিষ্ঠুর তুমি। না। তোমার জন্য আমি শোক কর্ব না—চন্দ্রের জ্যোতি এত ক্ষীণ কেন? উদয় সাগরের বারিবক্ষ হঠাৎ এত ম্লান যে? প্রকৃতির মুখে সে হাসিটি কোথায় গেল? [মেবার পতন: চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য]

৫. সরযু। জানো? কিছু জানো না! এক বিরাট ভালোবাসার অমৃত সমুদ্র আমার সম্মুখে পড়ে রয়েছে, কিন্তু তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। জানো কি যে আমার বর্তমান যেমন অন্ধকার ভবিষ্যৎ তেমনি অন্ধকার—এই অন্ধকারে নক্ষত্র নাই, বিদ্যুৎ নাই, জোনাকিও নাই; জানো কি যে দিনে দিনে যক্ষ্মারোগীর মত আমার ভিতরে সব ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। জানো কি! না, তুমি কি জানবে! তুমি কি জানবে!

[পরপারে: তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য]

দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত পাঁচটি নাটক থেকে বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক পাঁচটি চরিত্রের সংলাপ উদ্ধৃত হলো। এদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য—

১. যুক্তাক্ষর বেশি ব্যবহার করে প্রত্যেকটি সংলাপে ওজস্বিতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে,

২. বাক্যগুলোর গঠন এমন যাতে কিছু পরে পরেই উচ্চারণে বাড়তি ঝোঁক (accent) পড়ে, ফলে high pitch acting-য়ে সুবিধে হয়,

৩. শব্দের সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রায় একই অর্থ প্রকাশক বিভিন্ন বাক্য তৈরী করা হয়েছে,

৪. অলঙ্কার প্রয়োগের অতিরিক্ত প্রবণতা দিয়ে সংলাপকে কাব্যমণ্ডিত করে তোলার চেষ্টা হয়েছে,

৫. তৎসম যুক্তাক্ষর শব্দের পাশেই একেবারে আটপৌরে ক্রিয়া ও শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে,

৬. অব্যয় ব্যবহারের প্রতি নাট্যকারের আসক্তি আছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, দ্বিজেন্দ্রলাল ছন্দসংলাপের মধ্যে কথ্যভাষার আমেজ ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি যখন আবার ছন্দ পরিত্যাগ করে গদ্যসংলাপের আশ্রয় নিলেন, তখন তার মধ্যে পদ্যছন্দ আরোপ করবার চেষ্টা করলেন। ফলে তার আবেদন আবার বিপরীত হলো।

দ্বিজেন্দ্র-নাট্যসংলাপের ত্রুটি : পরিস্থিতি, ভাব বা চরিত্র অনুযায়ী ভাষার প্যাটার্ণ পরিবর্তিত হয় না। উদ্ধৃত পাঁচটি সংলাপ পাঁচটি পৃথক নাটকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পাঁচটি চরিত্র ব্যবহার করেছে। তার মধ্যে সামাজিক নাটকও রয়েছে। অথচ প্রত্যেকের সংলাপের মধ্যে কোনো মৌল পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য নেই। এমন কি প্রত্যেকে প্রায় একই ধরণের অলঙ্কার ব্যবহার করেছে, ফলে সংলাপে কোন বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে নি। বাক্যগঠন ও শব্দব্যবহারে সমতা না থাকার দরুণ বাক্যের অন্তর্গত অন্বয় বা জোড়গুলো সম্পূর্ণ মিশে যায় নি।

দ্বিজেন্দ্র-নাট্যসংলাপ—প্রাথমিক পাঠে মনে হয়—অত্যন্ত আবেগ মণ্ডিত (Passion Oriented)। কিন্তু আবেগ নিতান্ত আরোপিত, তা চরিত্র বা সংলাপের কোনো স্বতোৎসরিত গুণ নয় বলে কৃত্রিম ও প্রাণহীন। অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্র-নাট্যসংলাপ sentiment-এর স্তর ছাড়িয়ে emotional হয়ে উঠতে পারে নি।

অবশ্য, দ্বিজেন্দ্রলালের বড়ো কৃতিত্ব এই যে তিনি সর্বপ্রথম সাধারণ নাট্যশালার জন্য এমন নাটক রচনা করেছিলেন যাতে সংলাপ গতানুগতিক পদ্যছন্দ থেকে মুক্তিলাভ করে গদ্যের প্রবহমানতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলো এবং দৈনন্দিন কথোপকথন অতিক্রম করে একটি patterned language সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলো।

এগারো

টলস্টয় শেকসপীয়রের নাট্যসংলাপ সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন যে সেগুলো অত্যন্ত কৃত্রিম, কেন না চরিত্রগুলো সর্বদাই শেকসপীরীয় ভাষায় কথা বলে। রবীন্দ্র-নাট্য সংলাপ প্রসঙ্গেও সমালোচকগণ অনেকেই অনুরূপ অভিযোগ করেছেন। আধুনিক কালের কয়েকজন খ্যাতনামা শেকসপীরীয় বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন

টলস্টয়ের অভিমত সঠিক যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ভাষা প্যাটার্নের বহিরঙ্গ ঐক্যের মধ্যে রয়েছে অজস্র বৈচিত্র্য। খ্যাতনামা রুশ সমালোচক মোরাজভ বা জর্মান নাট্যতত্ত্ববিদ ক্লিমেন প্রচুর তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে শেকসপীরীয় নাটকের প্রত্যেকটি বিখ্যাত চরিত্র তাদের সংলাপের বাক্যগঠন ও রূপকল্প ব্যবহারে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেছে।

আসলে নাট্যসংলাপে কাব্যময়তা এক শ্রেণীর সমালোচক পছন্দ করেন না। তাঁদের মতে নাটক যেহেতু দৃশ্যকাব্য অতএব শুধু কাব্যে জোর দিলে তার দৃশ্যত্ব অবগুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। বিশেষত গদ্য সংলাপে দৈনন্দিন কথোপকথনের ভাষা ব্যবহৃত না হলে তার নাট্যত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক অভিনয়ের অযোগ্য এমন ধারণা একসময়ে সুধীসমাজে প্রচলিত ছিলো। সাম্প্রতিক কালে তাদের সফল প্রযোজনার কথা ছেড়ে দিলেও প্রায় প্রতিটি নাটকই রবীন্দ্রনাথ বার বার মঞ্চস্থ করে উক্ত ধারণা অপ্রমাণ করেছিলেন। যথার্থ নাট্যসংলাপ—তা গদ্যে বা ছন্দে রচিত হোক্ না কেন—grows from the character and the conflict, and in its turn, reveal the character, and carries the action.[৩৭] সার্থক নাট্যসংলাপের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্তগুলো মেনে চললেই শুধু চলবে না। তা প্রতিটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে শব্দপ্রয়োগ, বাক্যগঠন ও অলঙ্কার মণ্ডিত হওয়া প্রয়োজন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ নাট্যকাব্যের অতীতচারী রোমান্টিকতা পরিত্যাগ করে সাংকেতিক নাটকের মাধ্যমে বর্তমান সভ্যতার শ্রেণী সংকটে প্রবেশ করেছিলেন। তাই স্বভাবতই তাঁকে ছন্দসংলাপের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে প্রাত্যহিকতাকে বরণ করে নিতে হয়েছিলো। কিন্তু তাঁর সাংকেতিক নাটক বস্তুবিশ্বের প্রতিরূপ নয়, তা বাস্তবের একটি আদর্শায়িত রূপ (idealized form)। তাই এ সকল নাটকের সংলাপ দৈনন্দিনের কথ্যভাষা নয়। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি আদর্শায়িত রূপ (idealized form) নির্মাণে যত্নবান হয়েছিলেন।

শেকসপীরীয় কাব্যভাষায়—মোরাজভ বা ক্লিমেনের মতে—প্রতিটি চরিত্রের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের এ সকল নাটকে তার অভাব মনে হতে পারে। কিন্তু এ পার্থক্য উভয়ের যুগগত ও দ্বন্দ্বোপলব্ধির স্বাতন্ত্র্য থেকে এসেছে। শেকসপীয়রের নাটকের দ্বন্দ্ব ব্যক্তিচরিত্রকে আশ্রয় করে বিকশিত। তাই প্রত্যেকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে রয়েছে শ্রেণীদ্বন্দ্ব, তাই তাঁর সাংকেতিক নাটকের সংলাপ বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্লীন প্যাটার্নকে অনুসরণ করেছে।

'শারদোৎসব' থেকে 'কালের যাত্রা' পর্যন্ত গতিরেখা অনুধাবন করলে লক্ষ্য করা যায় সেখানে মূলত group character প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। ফলে সংলাপে অকারণ দৈর্ঘ্য বিলুপ্ত হয়েছে। সদাচঞ্চল জনজীবন সংক্ষিপ্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে একটি

অভূতপূর্ব স্ফূর্তি অর্জন করেছে। অথচ প্রাত্যহিক কথোপকথনের সঙ্কীর্ণ সীমায় তা আবদ্ধ নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ কাব্যভাষা সৃষ্টি করে নিয়েছে। উদ্ধৃতি—

১. প্রথম বালক। কই ঠাকুর দেখিয়ে দাও না।

সন্ন্যাসী। ওই যে সাদা মেঘ ভেসে আসছে।

দ্বিতীয় বালক। হঁ, হাঁ ভেসে আসছে।

তৃতীয় বালক। হা, আমিও দেখেছি!

সন্ন্যাসী। ওই যে আকাশ ভরে গেল।

প্রথম বালক। কি সে?

সন্ন্যাসী। কি সে? ওই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আলোতে, আনন্দে। বাতাসে শিশিরের গন্ধ পাচ্ছ না।

দ্বিতীয় বালক। হাঁ, পাচ্ছি। [শারদোৎসব]

২. —ফিরে চল রে। এবার সর্দারের সঙ্গে লড়বো।

—বলব, আমরা চলব না—দুই পা কাঁধের উপর মুড়ে বসব। পা দুটো লক্ষ্মীছাড়া, পথে পথেই ঘুরে মরলো।

—হাত দুটোকে পিছনের দিকে বেঁধে রাখবো।

—পিছনের কোনো বালাই নেই রে, যত মুশকিল এই সামনেটাকে নিয়ে।

—শরীরে যতগুলো অঙ্গ আছে তার মধ্যে পিঠটাই সত্যি কথা বলে। সে বলে চিত হয়ে পড়, চিত হয়ে পড়।

—কাঁচা বয়সে বুকটা বুক ফুলিয়ে চলে কিন্তু পরিণামে সেই পিঠের উপরেই ভর—পড়তেই হয় চিত হয়ে।

—গোড়াতেই যদি চিতপাত দিয়ে শুরু করা যেতো তা'হলে মাঝখানে উৎপাত থাকতো না'বে।

—আমাদের গ্রামের ছায়ার নীচে দিয়ে সেই যে ইরানদী বয়ে চলেছে তার কথা মনে পড়ছে ভাই।

—সেদিন মনে হয়েছিলো, সে বলছে চল চল চল,—আজ মনে হচ্ছে ভুল শুনেছিলুম, সে বলছে ছল-ছল ছল। সংসারটা সবই ছল রে। [ফাল্গুনী : তৃতীয়, দৃশ্য]

৩. ২। চলরে আমরা গারদে ঢুকবো, সেখানে গিয়ে—

মন্ত্রী। গিয়ে কি করবি?

২। বিভূতির গলার মালা থেকে ফুল খসিয়ে দড়ি গাছটা ওর গলায় ঝুলিয়ে আসবো।

৩। গলায় কেন, হাতে। বাঁধবাঁধার সম্মানের উচ্ছিষ্ট দিয়ে পথ কাটার হাতে দড়ি পড়বে।

মন্ত্রী। যুবরাজ পথ ভেঙেছেন বলে অপরাধ, আর তোমরা ব্যবস্থা ভাঙবে, তাতে অপরাধ নেই ?

২। আহা, সে তো আলাদা কথা। আচ্ছা বেশ যদি ব্যবস্থা ভাঙি তো কী হবে ?

মন্ত্রী। পায়ের তলার মাটি পছন্দ হলো না বলে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়া হবে। সেটাও পছন্দ হবে না বলে রাখছি। একটা ব্যবস্থা আগে করে তবে অন্য ব্যবস্থাটা ভাঙতে হয়।

৩। আচ্ছা তবে গারদ থাক, রাজবাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে মহারাজের জয়ধ্বনি করে আসি গে।

১। ও ভাই, ওই দেখ। সূর্য অস্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে এলো। কিন্তু বিভূতির যন্ত্রের ওই চূড়াটা এখনো জ্বলছে। রোদ্দুরের মদ খেয়ে যেন লাল হয়ে রয়েছে।

২। আর ভৈরব মন্দিরের ত্রিশূলটাকে অস্তসূর্যের আলো আঁকড়ে রয়েছে যেন ডোববার ভয়ে। কী রকম দেখাচ্ছে। [মুক্তধারা]

উদ্ধৃত তিনটি অংশ রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ে রচিত সাংকেতিক নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে। তিনটি নাটকের অন্বিষ্ট স্বভাবতই পৃথক। কিন্তু তার মধ্য দিয়েও বৃহৎ সত্য অনুসন্ধানের আসক্তি প্রকাশিত। তাই একটি বিশেষ প্যাটার্ন সংলাপের মধ্যে অলক্ষ্য থাকে নি। প্রথম সংলাপে কৌতূহল, দ্বিতীয়টিতে সংশয় ও উদ্বেগ এবং তৃতীয়টিতে ক্রোধ ও ভয় পর্যায়ক্রম প্রকাশ পেয়েছে। সংলাপ তাই কাটা কাটা, অস্থির ও দ্রুত সঞ্চরমান। এবং ভাষার আটপৌরে ভঙ্গি অলঙ্কারের সুমিত প্রয়োগে ক্রমে গভীরতা লাভ করেছে। অথচ সে-অলঙ্কার কথনোই বক্তার শ্রেণী চরিত্র বিলোপ করে কৃত্রিম ও আকস্মিক হয়ে ওঠে নি। বিশেষত একটি লৌকিক মেজাজ সর্বদাই অন্তরালে কাজ করে চলেছে। শব্দ ব্যবহার ও বাক্যগঠনে অনিবার্যতা রয়েছে এবং সর্বোপরি, তা নাট্যক্রিয়ার অনুষঙ্গী হয়ে সঠিক আবেগ দ্যোতনা করেছে।

জনতার সংলাপ ছাড়িয়ে ব্যক্তিচরিত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে রবীন্দ্রনাট্য সংলাপের আরো বিচিত্র মাত্রা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কে কিছু সংলাপ বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে :

১. অমল। কত বাঁকা বাঁকা ঝরণা জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হতে হতে চলে যাবো—দুপুরবেলা সবাই যখন ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে, তখন আমি কোথায় কতদূরে কেবল কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব।

[ডাকঘর : প্রথম দৃশ্য]

২. অমল। বেশ লাগে তোমার ঘণ্টা—আমার শুনতে ভারি ভালো লাগে—দুপুরবেলা আমাদের বাড়ীতে যখন সকলেরই খাওয়া হয়ে যায় – পিসেমশাই কোথায় কাজ করতে বেরিয়ে যান, পিসিমা রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন, আমাদের

খুদে কুকুরটা উঠোনের ওই কোণের ছায়ায় লেজের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমোতে থাকে—তখন তোমার ওই ঘণ্টা বাজে—ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং। [ডাকঘর : দ্বিতীয় দৃশ্য]

উদ্ধৃত সংলাপ দুটি লক্ষ্য করলে প্রথমেই মনে হবে এদের কাব্যময়তা। অথচ কোনটিতে একটিও অলঙ্কার নেই। এমন কি মাত্র দুটি যুক্তাক্ষর রয়েছে। তাহলে ভাষার এমন অনিবার্য সঞ্চারণী শক্তি সম্ভব হলো কেমন করে? রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের আবেগের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছেন—সেই আবেগ প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতি আসক্তির বহিঃপ্রকাশ। ছোটো অন্বয়যুক্ত বাক্যে অমলের ক্লান্তি, শব্দদ্বৈতে তার অস্থির আকুলতা এবং ক্রিয়াপদে বিচিত্র কর্মপ্রবাহের দ্যোতনায় বহির্বিশ্বের প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগ চরিত্রটির স্থিতিশীল অসহায়তার মধ্যে তীব্র অনুভূতির সঞ্চার করেছে। ফলে সংলাপ অনিবার্যভাবেই ক্রিয়া মণ্ডিত হয়েছে।

অথবা এ সংলাপটি বিশ্লেষণ করা যাক :

অভিজিৎ। হাঁ পৌঁছচ্ছে। আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে। আমি কঠোরতার অভিমান রাখিনে।—চেয়ে দেখো, ওই পাখি দেবদারু গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে আছে; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতরে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা করবে জানি নে; কিন্তু ও যে এই সূর্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজছে, সুন্দর এই পৃথিবী। যা কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করছি।

[মুক্তধারা]

প্রথমে তিনটি ছোটো বাক্যে অভিজিতের অভিব্যক্তি আবেগের একটি সংহতরূপ প্রকাশ করছে। কিন্তু তারপরেই দীর্ঘবাক্যটি তার অন্তরের সকল ব্যথা প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করে প্রবাহিত হয়ে চরম উপলব্ধিতে পৌঁছেছে—"সুন্দর এই পৃথিবী" এবং তার পরেই অপেক্ষাকৃত ছোটো বাক্যে এসে নির্বহণের মাধুর্য লাভ করছে।

কিংবা বিশুপাগলের সংলাপ :

বিশু। সেই নীল চাঁদোয়ার নীচে, খোলা মদের আড্ডায়! রাস্তা বন্ধ। তাই তো এই কয়েদখানার চোরাইমদের ওপর এমন ভয়ঙ্কর টান। আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ; তাই বারোঘণ্টার সমস্ত হাসিগান সূর্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি একচুমুকের তরল আগুনে। যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি নিবিড় ছুটি।

[রক্তকরবী]

বিশুপাগল যক্ষপুরীর শ্রমিক, তাই তার ভাষায় শ্রমিক জীবনের অনুষঙ্গ স্পষ্ট, কিন্তু তা বাস্তবের রূঢ় প্রত্যক্ষকে অবহেলা করে তার অন্তর্লীন সত্যকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। তার সংলাপের মধ্য দিয়ে দাসত্ব-বন্ধনের সকল বেদনা রুদ্ধ আবেগে ফেটে পড়েছে। কিন্তু যেহেতু নাট্যকার এখানে ক্রোধের চাইতে দুঃখ এবং ক্ষোভকে প্রকাশ

করার অভিলাষী, তাই বাক্যগঠন ও অলঙ্কার প্রয়োগে একটি সুষম ছন্দ অনুসরণ করেছেন। অথচ হঠাৎ "রাস্তাবন্ধ"—এই ছোটো বাক্যটির আকস্মিকতা এবং 'চাঁদোয়া', 'চোরাই', চুঁইয়ে, চুমুক প্রভৃতি "চ" ব্যঞ্জনধ্বনির খোঁচায় দর্শক চেতনাকে জাগ্রত করার চেষ্টাও অলক্ষ্য থাকেনি।

অনুরূপ আরো বহু উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের বক্তব্যকে বিস্তারিত করা চলে, কিন্তু সম্ভবত তার আর প্রয়োজন নেই। যে-গদ্য ভাষার কথা মধুসূদন চিন্তা করেছিলেন, গিরিশচন্দ্র যা কখনোই অনুধাবন করতে পারেন নি; দ্বিজেন্দ্রলাল যে-প্রচেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাটকে তারই বিচিত্র বিকাশের মাধ্যমে বাঙলা নাট্যসংলাপ অনিবার্য পরিণতি লাভ করেছিলো।

নাট্যসংলাপকে সর্বদাই দুটি স্তর বজায় রেখে চলতে হয়—সাহিত্য ও মঞ্চ। সমালোচক তাকেই বলেছেন—drama as literature ও drama as theatre এবং মন্তব্য করেছেন—"In much contemporary thinking, a separation between literature and theatre is constantly assumed ; yet the drama is, or can be, both literature and theatre, not the one at the expense of the other, but each 'because' of the other.[৩৯]

মঞ্চের প্রয়োজনে সাহিত্যকে খর্ব করা আবার সাহিত্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে মঞ্চের দাবীকে উপেক্ষা দেখানো—উভয়ের মধ্যেই থাকে চরম একদেশদর্শিতা। বাঙলা নাটকের সৃষ্টিলগ্নে মধুসূদন উভয়ের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনে আগ্রহী হয়েও সীমিত সুযোগে সার্থক হতে পারেন নি, তাই নবছন্দ উদ্ভাবন করেও নাটকে তার প্রয়োগে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চের প্রয়োজনে সর্বদাই ভাষা ও ছন্দকে হতে হয়েছে অবগুণ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ এসে অবশেষে উভয়ের মধ্যে সার্থক মেলবন্ধন রচিত হয়েছে।

১। হেরাসিম লেবেদভ্ : কাল্পনিক সংবদল [সম্পা] মদনমোহন গোস্বামী [যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩]
২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস পৃ. ৬
৩। বিশ্বনাথ কবিরাজ : সাহিত্য দর্পণ [বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনূদিত পৃ. ৬৯-৭৪]
৪। ড. ক্ষেত্রগুপ্ত : কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী পৃ. ১৬১
৫। তদেব : পৃ. ১৬৭
৬। ড দেবীপদ ভট্টাচার্য : গৈরিশ ছন্দ [গিরিশ রচনাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড/সাহিত্য সংসদ ১৯৭১] পৃষ্ঠা পনের
৭। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : গিরিশচন্দ্র পৃ ২২৪
৮। তদেব : পৃ. ৬৩৩ ৬৩৪
৯। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত : কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী পৃ. ১৪৩
১০। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : তদেব পৃ. ৬৩৪

১১। তদেব : পৃ. ২৫৯

১২। তদেব : পৃ. ২৬০

১৩। তদেব : পৃ. ২৬০

১৪। তদেব : পৃ. ২৬০

১৫। তদেব : পৃ. ২৬০

১৬। T. S. Eliot : Selected Prose (Penguine 1955) P. 74

১৭। J. L. Styan : The Elements of Drama (Cambridge 1963) P. 3o

১৮। রবীন্দ্র রচনাবলী : চতুর্দশ খণ্ড (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) পৃ. ৫২৫

১৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিঠিপত্র ৫ [বিশ্বভারতী ১৩৫২] পৃ. ৯

২০। রবীন্দ্র রচনাবলী : চতুর্দশ খণ্ড [পশ্চিমবঙ্গ সরকার] পৃ. ১৬৪

২১। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী : প্রথম খণ্ড [সাহিত্য সংসদ] পৃ. ৭০৩

২২। রবীন্দ্র রচনাবলী : চতুর্দশ খণ্ড (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) পৃ. ১২৪

২৩। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় : বাঙলা ছন্দের মূলসূত্র [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৯] পৃ. ১৬১

২৪। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী : প্রথম খণ্ড [সাহিত্য সংসদ] পৃ. ৭১০

২৫। তদেব : পৃ. ৭১০

২৬। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর পৃ. ৬০

২৭। অমরেন্দ্রনাথ রায় : গিরিশ নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৬] পৃ. ৩৯

২৮। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত : কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী পৃ. ১৩৩-১৩৪

২৯। তদেব : পৃ. ১৪৯

৩০। Constantin Stanislavsky : Building a Character [Max Reinhardt 1959) P. 114

৩১। Op. Cit. : P. 113

৩২। মহেন্দ্রনাথ দত্ত : গিরিশচন্দ্র—মন ও শিল্প [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪১]. পৃ ২৬

৩৩। তদেব : পৃ. ৩৬-৩৭

৩৪। J. M. Synge : Plays (George Allen & Unwin 1949) P. 174

৩৫। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড পৃ. ২৫৯

৩৬। M. Fluchere : Shakespeare P. 155

৩৭। Lajos Egri : The Art of the Dramatic Writing P. 240

৩৮। Raymond Williams : Drama in Performance (Pelican 1972) P. 4

———